সামরিক শাসনের দশকে

আনু মুহাম্মদ

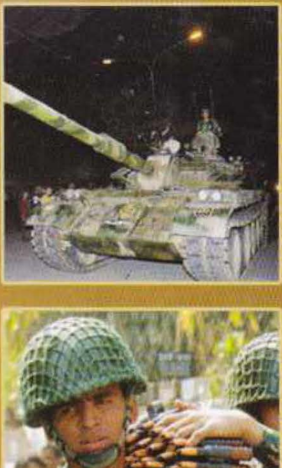

সামরিক শাসনের দশকে
আনু মুহাম্মদ

প্রকাশক
ইব্রাহিম খলিল পারভেজ
নবরাগ প্রকাশনী
বাবুল টাওয়ার
৩৫ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৫২-৪৯১৯৮৫, ৭৪৫৩০১৭

প্রচ্ছদ
সহিদুল ইসলাম রনি

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব
শিল্পী বড়ুয়া

বর্ণবিন্যাস
ফোর ব্রাদার্স কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
১০ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টার্স
১০/১ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০

SHAMORIK SHASHONER DOSHOKE by Anu Muhammad. Published By NABARAG PROKASHANI, Babul Towar, 35 Banglabazar (First Floor) Dhaka-1100, Bangladesh. Copy Right : Shilpi Barua. Computer Compose : Four Brothers Computer & Graphics. Date of Publication : August 2011, Price : Tk. 200.00 Only.

ISBN 978-984-8401-24-8

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

উ।ৎ।স।র্গ

কামরুদ্দীন আবসার
প্রিয় শিল্পী ও সংগঠক

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

সূ। চি। প। ত্র

বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী আর সাম্রাজ্যবাদের প্রেমকাহিনী/ ১৩
শিক্ষাখাতে ব্যয় এবং সামগ্রিক বাস্তবতা/ ২৭
শিক্ষা সংকট এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়/ ৪৪
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার সমস্যা ও শক্তি/ ৬১
দেশ কার হাতে/ ৭১
ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ/ ৮১
বাজেটের রাজনৈতিক অর্থনীতি/ ১০১
২০০০ সালে বাংলাদেশ/ ১১২
২০০০ সাল : আরও কয়েকটি কথা/ ১২০
বন্যার স্থায়ী সমাধান কি অসম্ভব? / ১২৩
তরুণের গন্তব্য কোথায়? / ১২৭
দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও উৎপাদিকা শক্তি বিকাশে সংকট/ ১৪২

ভূমিকা

প্রতিষ্ঠার ১১ বছরের মধ্যেই পাকিস্তান সামরিক শাসনের মধ্যে পতিত হয়েছিল। এই ১১ বছরে কোন সুস্থির গণতান্ত্রিক সংগঠিত কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে তখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নয়া গুরু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র নয়া ঔপনিবেশিক জাল বিস্তারে ব্যস্ত। জন্মের পর পরই সেই জালের অধীনস্ত হয়ে পড়ে পাকিস্তান। জিন্নাহর মৃত্যু উত্তর পাকিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সংকট, সামন্ত প্রভুদের দাপটে রাজনৈতিক টানাপড়েন, মুসলিম লীগ কর্তৃত্বের ক্ষয়, জনবিক্ষোভের প্রসার ঠেকানোর জন্য অব্যাহত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা সবকিছু মিলিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এর সমাধান করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান প্রবেশ করেছিল সামরিক শাসনের মধ্যে। কিন্তু সামরিক শাসনের আশ্রয়ে জেনারেল, আমলা, বৃহৎ ব্যবসায়ী ও সামন্ত প্রভুদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যে ক্ষমতার বলয় তৈরি হয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তৈরি হয় তা পাকিস্তানকে দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরশাসন, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, ভারসাম্যহীনতার মধ্যে নিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠবার সুযোগই ছিল না। উন্নয়ন নীতি, পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক অবস্থান সবক্ষেত্রেই পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের একটি বশ্যরাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের এই রাজনীতি, উন্নয়ন নীতি, বশ্যতা এবং সেইসঙ্গে আঞ্চলিক জাতিগত বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য বাংলাদেশের মানুষ তার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশকে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন করেন। বাংলাদেশ নামে ভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। প্রতিশ্রুতি ছিল শুধু ভিন্ন রাষ্ট্র নয়; ভিন্ন ব্যবস্থা, বৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত গণতান্ত্রিক মানবিক সমাজ নির্মাণ। কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হল বটে, কিন্তু তার ধারাবাহিকতা থেকে মুক্ত হতে পারলো না।

স্বাধীনতার পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা থেকে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে সরে আসতে থাকে। বিজয়ের পর পরই জনগণের পরাজয়ের পর্ব শুরু হয়। স্বাধীন দেশে নতুন ব্যবস্থার পরিবর্তে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখল ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে, নতুন বিত্তবান শ্রেণীর উদ্ভব হয়। প্রতিষ্ঠার সাড়ে তিন বছরের মাথায় বাংলাদেশও পতিত হয় সামরিক শাসনে। প্রথমে ১৯৭৫ ও পরে ১৯৮২। দুই রাষ্ট্রপ্রধানসহ খুন হন জানা অজানা অনেকে। ১৯৭৫ পরবর্তী সামরিক শাসন এবং বিশেষত ৮০ দশকের সামরিক শাসনকালীন সময়ে নব্য ধনিক শ্রেণীর শক্তি ও আয়তন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। বিশ্বব্যাংক আইএমএফ সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নয়া সংরক্ষণবাদী সংস্কার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই শ্রেণীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায়।

জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সামরিক জান্তার শাসন থেকে মুক্ত হয় এবং নির্বাচনভিত্তিক সরকার ব্যবস্থা শুরু হয়। কিন্তু সামরিক শাসনবিরোধী যে রাজনৈতিক আন্দোলন ৮০ দশকে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তা এই শাসনের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নীতি ও দর্শনকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান ও আঘাত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সামরিক শাসন আমলে উন্নয়নের যে নীতি ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ ও রাজনীতিতে দুর্বত্তদের যে আধিপত্য তৈরি হয়, সেই আধিপত্য বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোকেও গ্রাস করে। এই আধিপত্য নির্বাচন ভিত্তিক ব্যবস্থায় শুধু যে অব্যাহত থাকে তাই নয়, আরও জোরদার হয়। সামরিক বেসামরিক শাসনে তাই জনস্বার্থবিরোধী নীতির ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ পড়েনি, তা আরও পরিপুষ্ট হয়েছে।

সামরিক শাসনের দশকে কী ধরনের উন্নয়ন নীতি ও দর্শন ক্রমে ভিত গাড়লো, তার গতিমুখ কোনদিকে তার পূর্বাপর ব্যাখ্যাই এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোর মধ্য আছে। এখানে প্রধানত অর্থনৈতিক নীতিগুলো কেন্দ্রে রেখেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসঙ্গে এই দশকে শিক্ষা, সমাজ, তরুণ প্রজন্ম নিয়ে কয়েকটি লেখাও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত বেশ কয়টি লেখা সেই সময়ে সেমিনার প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত হয়েছিল। প্রথমটি অমুদ্রিত, অন্যগুলো দশকের বিভিন্ন সময়ে *সংস্কৃতি*, *বিচিত্রা*, *পূর্ণাশা*, *প্রভৃতিতে* প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির কয়েকমাস মাথায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৮৩ -৮৪ সালে ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত স্থাপন করে। একই দশকে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিকশিত হয়। এছাড়া নারী ও

পেশাজীবী আন্দোলনও বিস্তৃত হয় ৮০ দশকে। এসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতির বিপ্লবীকরণের নতুন সম্ভাবনাও তখন জোরালো হয়ে উঠে। কিন্তু বাম রাজনীতির ভেতরের নানা দুর্বলতা এই সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিতে পারেনি। ৮০ দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তার, ধনিক শ্রেণীর নতুন উদ্ভব ও যাত্রার কাছে তার পরাজয়ের নানা দিক বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ছাত্র আন্দোলন, বিপ্লবী রাজনীতি, আন্দোলনের সংস্থা, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান, এনজিও সংস্কৃতির বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে আমার তৎকালীন অনেকগুলো লেখা *রাষ্ট্র ও রাজনীতি: বাংলাদেশের দুই দশক* (সন্দেশ, ২০০০) শিরোনামে আরেকটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থ এবং বর্তমান গ্রন্থ পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

আনু মুহাম্মদ
অর্থনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : anujuniv@gmail.com

বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী আর সাম্রাজ্যবাদের প্রেমকাহিনী

প্রকৃতির সব অণু-পরমাণু থেকে, মাটি গাছপালা লতাপাতা, সব জীবজন্তু মানুষের ভেতরের আত্মা থেকে এই ক্রন্দন-এক তীব্র আবেগ, একটিই কামনা, একটিই বোধ, পরমাত্মার জন্যে, 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি।'

রাধা যখন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এ জাতীয় প্রেমবাণী উচ্চারণ করেন কিংবা তাদের 'অবৈধ' প্রেমলীলা যখন সামাজিক নিয়মকানুন, শৃঙ্খলাকে পদদলিত করতে উদ্যত হয় তখন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা বলেন, রাধা হচ্ছেন প্রকৃতির প্রতীক আর কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা। কাজেই তাদের যে প্রেমলীলা অবৈধ মনে হচ্ছে তা আসলে পার্থিব মানবিক কিছু নয়, অতিমানবিক। তাদের মিলন আসলে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। কাজেই তার অবৈধ হওয়ার সুযোগ নেই।

পরমাত্মার ছোঁয়া পাবার জন্যে মানুষ, প্রকৃতির অণু-পরমাণু এরকম তীব্র আবেগে অস্থির হচ্ছে কি না কিংবা যে প্রেমলীলাকে ঐশ্বরিক বলা হচ্ছে তা আদতে কী– এই আলোচনা আমাদের বিষয়বস্তু নয়।

আমরা খুবই পার্থিব, খুবই স্পষ্ট এক প্রেমলীলার কথা এখানে স্মরণ করছি, যে প্রেমলীলাকে বৈধ অপার্থিব মহাশক্তিধর অবিনশ্বর অবিভাজ্য বলে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে বিস্তর কাগজ খরচ হচ্ছে প্রতিদিন।

বেদ, মহাভারত, রামায়ণের যুগের কিংবা মধ্যযুগের আরবের কোনো কাহিনী এটা নয়, এটা হচ্ছে খুবই বর্তমানকালের। এই প্রেমলীলায় কৃষ্ণের ভূমিকায় রয়েছে আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতির প্রতিটি অণু-পরমাণুতে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেই সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজি আর রাধার ভূমিকায় রয়েছে এদেশের সমাজ অর্থনীতি রাষ্ট্র এবং সে সুবাদে তার সাথে সম্পর্কিত বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী।

রাধা যেমন নিজের ঘরসংসার ছেড়ে কৃষ্ণের জন্যে পাগল হয়েছিল, তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তার শারীরিক মানসিক সমস্ত অস্তিত্ব কৃষ্ণের জন্যে অসহনীয় আবেগে অস্থির থাকত, রাধার অস্তিত্ব যে রকম সর্বতোভাবে কৃষ্ণের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল, ঠিক সে রকম আমাদের শাসক শ্রেণীর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন

জীবন-জীবিকা সুখশান্তি সর্বোপরি সামগ্রিক অস্তিত্ব এখন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সমর্থন ব্যতীত অচল-অনড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যাকুল আবেগে তাই রাধার মতো অস্থির আমাদের দেশের কর্ণধাররা, সাম্রাজ্যবাদ তাদের কৃষ্ণ।

দুই

ঢাকায় বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর এক আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন এক মার্কিন বিশেষজ্ঞ। তিনি তার উপস্থিতি এবং বক্তব্য দ্বারা সকলকে কৃতার্থ করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মার্কিন অবদান তুলে ধরেছিলেন খুবই নিপুণভাবে। বেরসিক একজন তরুণ হঠাৎই মন্তব্য করে উঠলেন, 'আমাদের অর্থনীতির দশা এরকম হওয়ার জন্যে তোমরা অনেকাংশে দায়ী, সব ব্যাপারেই তোমরা এখানে হস্তক্ষেপ করো... ইত্যাদি। মার্কিন বিশেষজ্ঞ একথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, বিব্রত হননি। মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'কে বলেছে এটা তোমাদের অর্থনীতি, উন্নয়ন বাজেটের অধিকাংশ আমরা দিই; আমাদের দ্বারাই যে অর্থনীতি চালিত হয় তাতে আমরা হস্তক্ষেপ করি, এ কথার তো কোন অর্থ নেই।' যথার্থই বলেছিলেন মার্কিন পন্ডিত। তার প্রশিকা (প্রশিক্ষণ শিক্ষণ কাজ) যথার্থই সফল।

প্রবীণ বয়সে মাও সেতুং তরুণদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলে, 'এ পৃথিবী একইসাথে তোমাদের এবং আমাদের, কিন্তু সবশেষে তোমাদেরই।' বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীও সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে নিশ্চিন্তে বলতে পারেন এবং নিশ্চয়ই বলেও থাকেন, 'এ দেশ তোমাদের এবং আমাদের, কিন্তু সবশেষে তোমাদেরই।'

তিন

অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশ যখন ব্রিটিশ রাজ্যের পদানত হয় তখনই ইউরোপে পুঁজিবাদের জোরদার যাত্রা শুরু হয়েছে। মার্কসের দৃষ্টিতে তা ছিল এক বৈপ্লবিক ঘটনা। পূর্বতন সকল সমাজব্যবস্থার তুলনায় সবচেয়ে গতিশীল এবং শক্তিশালী বলেই এর আওতা খুব দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে, স্থাবিরতা পশ্চাৎপদতা জড়তা কাটানোর জন্যে পুঁজিবাদে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি, প্রাথমিক পর্যায়ে সেই দেশেই পুঁজিবাদ সংগঠিতভাবে বিকশিত হয়েছে যখন তা আরও অন্যান্য শর্তের সাথে নিম্নোক্ত শর্তও পূরণ করেছে : ১. সে দেশ কারও উপনিবেশ ছিল না। ২. সে দেশের অধীনে উপনিবেশ ছিল।

এ দু'টি শর্ত থাকা প্রয়োজন এ কারণে যে, পুঁজিবাদের উত্থানের প্রাথমিক পর্যায়টি হচ্ছে পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের যুগ। প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ন দেশের অভ্যন্তরে

থেকেই যথেষ্টভাবেই মেটানো সম্ভব হয় না, সেজন্যেই প্রয়োজন হয় উপনিবেশ, যেখান থেকে পুঁজির একটা নিশ্চিত সরবরাহ থাকবে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন কখনো সীমিত বাজারের মধ্যে বিকশিত হতে পারে না, তার জন্যে চাই ক্রমবিস্তারমান বাজার; সেজন্যেই উপনিবেশ থাকা চাই।

বাংলা এবং ভারতবর্ষ সেজন্যে ব্রিটেন তথা ইউরোপের উপনিবেশ হিসেবে ব্রিটেনের পুঁজিবাদের বিকাশে যথেষ্টই সাহায্য করেছিল। সম্পদ পাচার এখন থেকে কত বিপুল পরিমাণে হয়েছে এবং তা কিভাবে দ্রুত আদিম সঞ্চয়নে সহায়তা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তর দলিল এখন সুলভ।

দুই বছর ভারতবর্ষ উপনিবেশ থাকাকালেই ইউরোপের পুঁজিবাদ বিকশিত হয়ে সেখানে একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কাল শুরু হয়। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের এ উদ্ভবের পর (বিংশ শতকের শুরুতে) ক্রমশ বিভিন্ন দেশকে উপনিবেশ হিসেবে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখা ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য এবং অপ্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়, যার ফলে একচেটিয়া ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রত্যক্ষ দখলদার অবস্থা থেকে সরে আসে।

প্রাক-ধনতান্ত্রিক কালের সাম্রাজ্যবাদের সাথে একচেটিয়া ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক তফাৎ এখানেই স্পষ্ট। প্রাক-ধনতান্ত্রিক কালে উৎপাদন ব্যবস্থা, শোষণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক অর্থাৎ রাজনৈতিক সামাজিক কর্তৃত্বের ওপরে অনেকখানি নির্ভর করত। সেখানে শারীরিক উপস্থিতি, শারীরিক বলপ্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্যেও যেমন প্রযোজ্য ছিল, উপনিবেশ রক্ষার জন্যেও প্রয়োজনীয় ছিল।

পুঁজিবাদে মানুষ এই অবস্থা থেকে 'মুক্তি' লাভ করে। সাম্য-মৈত্রী আর স্বাধীনতার আবাহনে পুঁজিবাদের আগমন ঘটে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষক শোষিতকে শারীরিকভাবে বলপ্রয়োগ করবার দরকার মনে করে না, জোরজবরদস্তির সেখানে দরকার নেই। শ্রমিক সেখানে শারীরিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, সে যেখানে খুশি সেখানে কাজ করতে পারে। বলাবাহুল্য এ স্বাধীনতা অর্থনৈতিক শর্ত দ্বারা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। শ্রমিকের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতেই হয়, এই বাধ্যবাধকতাই তাকে মজুরি দাসে পরিণত করে। পুঁজি এখানে শ্রমিক এবং মালিকের সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং পুঁজির ক্রিয়াতেই উদ্বৃত্ত মূল্য আহরিত হয়।

একটি নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে যখন পুঁজিবাদের আওতায় ব্যক্তির ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে, পুঁজি সেখানে চালিকাশক্তিতে উন্নীত হয়, প্রাক-পুঁজিবাদের মতো বলপ্রয়োগ জোরজবরদস্তির প্রয়োজন সেখানে কমে আসে। তেমনি আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতেও একচেটিয়া ধনতন্ত্রের আওতায় শারীরিক বাধ্যবাধকতা দ্বারা কোনো দেশকে উপনিবেশ হিসেবে ধরে রাখা অপ্রয়োজনীয় হয়ে

পড়ে। লগ্নি পুঁজিই এখানে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের অশরীরী প্রবল শক্তি হিসেবে কাজ করতে থাকে।

১৯৪৭ কিংবা ১৯৭১ এই অশরীরী প্রবল শক্তির বন্ধন থেকে বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করতে পারেনি। বাংলাদেশের শাসক-শোষক শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে এই শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এদেশে ধনতন্ত্রের এক বিকৃত প্রতিচ্ছবির বিকাশ ঘটিয়েছে।

চার

সাম্রাজ্যবাদের সাথে এ দেশের শাসকশ্রেণীর যে শ্রেণীগত সংযুক্তি তার উৎস বহু পেছনে। ভারত ব্রিটিশ রাজ্যের প্রধানত হওয়ার আগে ভারত, বিশেষত বাংলার সমাজ-উৎপাদন ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ স্থবির অনড় অচল ছিল এ ধারণাই এখন অচল। মার্কসের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েই অনেকে এরকম কথা বলতেন। কিন্তু মার্কসের পরবর্তী অনুসন্ধান এবং সর্বোপরি তৎকালীন বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই সত্য ধরা পড়ে যে, সে সময়ে সমাজ অর্থনীতি অচল অনড় ছিল না, খুবই ধীরগতিতে হলেও তার মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন হচ্ছিল এবং এর সূত্র ধরেই সেখানে পুঁজিবাদের সম্ভাবনাও দেখা যায়। এর সপক্ষে বিস্তর যুক্তি আছে।

তবে পরিবর্তনের ধাক্কা ইউরোপে যেমনভাবে সামন্তবাদকে সজোরে আঘাত করেছিল, বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে ভারতবর্ষে তা সেভাবে সংঘটিত হয়নি। অনড় অচল ভারতীয় দর্শনের একাধিপত্য, বর্ণপ্রথার প্রবল প্রতাপ এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি পরিবর্তনবিমুখ করে তুলেছিল। সে কারণে পুঁজিবাদের যা কিছু সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল তার শক্তি সেভাবে সংগঠিত হতে পারে নি, যেভাবে তা সংগঠিত হয়ে জাপানে ঔপনিবেশিক শক্তিকে প্রতিহত করেছিল। নেহেরুর ভাষায়, 'একটি উন্নততর শক্তি একটি ছোট রাষ্ট্রকে সহজেই দখল করে নিতে পারে, কিন্তু ভারতের মতো বিশাল, উন্নত এবং সভ্য একটি রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রু দখল করে নিতে পারে না, যতদিন পর্যন্ত তা নিজেই অবক্ষয়ের শিকার হয়। সম্ভবত এই অবক্ষয় ভারতের বর্ণপ্রথার ফলে সৃষ্ট সমাজকাঠামোর অপরিবর্তনীয় জড়তার অপরিহার্য ফসল। একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে এখানকার মানুষের জীবন বাঁধা পড়ে গিয়েছিল, প্রতিটি ব্যক্তির কর্মজীবন ছিল নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী—অন্যদের সম্পর্কে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। নিম্ন শ্রেণী ছিল শিক্ষা ও সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, তাদেরকে সবসময় উচ্চবর্ণের লোকজনদের অধীনস্ত থাকবার শিক্ষা দেয়া হতো।... সারাদেশজুড়ে বণিকশ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠলেও তাদের কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। ক্ষমতা দখল করে সামন্ত বন্ধন থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করবার জন্যে ইউরোপের মতো কোনো

শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণীও এখানে গড়ে ওঠেনি।... এসব কারণে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ভারত অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তাদের পতন তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।'

যে বণিকশ্রেণী ভারতবর্ষে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, অভিন্ন শ্রেণীই পুঁজিবাদের শুরুতে এ ব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল ইউরোপে, জাপানে এরাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যুক্তরাজ্যের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে তাদের একটি বড় অংশ ইংরেজ শাসকদের স্বাগতম জানিয়েছিল। পুঁজিবাদের সাথে ভারত এবং বিশেষত বাংলার বিত্তবানদের সম্পর্ক এভাবেই শুরু হয়। প্রতিরোধ করবার চাইতে, স্বাধীন বিকাশের চাইতে অধীনস্ত স্বাচ্ছন্দ্যই তাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিল। সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং অধিপতি দর্শন তাদের এ আকাঙ্ক্ষাকেই উৎসাহিত করেছিল। 'প্রমিথিউস' জাতীয় কোনো চরিত্র এ অঞ্চলের পুরাণে নেই। ভাগ্য, শক্তির সামনে অবনত থাকাই যে দর্শনের শিক্ষা তার প্রাধান্য ছিল অটুট।

এরপর মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু তার ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সাথে অনুগত সম্পর্ক। দালালি আর কাপুরুষ ভূমিকা দিয়ে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গড়ে ওঠে (মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া), দ্বান্দ্বিক নিয়মেই যারা স্রোতের বিরুদ্ধে একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের সার্থক ও উত্তরসূরী পরবর্তীকালে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

আগেই বলেছি, এই অঞ্চলকে শারীরিকভাবে পদানত রাখবার কালেই ইউরোপীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করে। কাজেই ব্রিটিশ রাজ্যের শারীরিক অনুপস্থিতিতে একচেটিয়া পুঁজিই এ অঞ্চলের. শাসকশ্রেণীকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করে। এই অঞ্চলে পুঁজিবাদের বিকৃত প্রতিচ্ছবি নির্মাণে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা হয় মুখ্য। রাধা কৃষ্ণের গাঁথার আরেক চিত্র তৈরি হয়।

পাঁচ

আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বাভাবিক ক্রিয়া, উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতেও পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতায় অবক্ষয়ের চেহারা কেন্দ্র পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় এসব দেশে অনেক বেশি প্রকট।

বাংলাদেশের শাসক-শোষকশ্রেণীর মৌলিক চরিত্র বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের বিকাশ এবং পুঁজিবাদের চিরায়ত বিপ্লবী ভূমিকা পরস্পর বিরোধী।

পুঁজিবাদের বিপ্লবী ভূমিকার মধ্যে আমরা দেখি : উৎপাদনকে বৃহদায়তন পর্যায়ে নিয়ে আসা, ২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, ৩. শিক্ষার বিস্তার, ৪. বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনার প্রসার, ৫. বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদন ইত্যাদি।

ইউরোপ আমেরিকায় পুঁজিবাদের শুরুতে তখনকার উত্থিত শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের সাথে এসব সংগতিপূর্ণ ছিল। তাদের নিজেদের অধিক মুনাফা অর্জন, পুঁজির স্ফীতি লাভ ইত্যাদির জন্যে দরকার ছিল এসব শর্তপূরণ; কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর শাসক-শোষক শ্রেণীগুলোর জন্য এগুলো অনিবার্য নয়। এসব অঞ্চলে আন্তর্জাতিক পুঁজির জন্যেও এখন তাই ভূমিকা লুণ্ঠনকারীর।

গ্রামীণ বুর্জোয়ার, কিংবা বিত্তবানের জন্যে জমিতে অধিক পুঁজি বিনিয়োগ, তার উন্নয়ন, উৎপাদন উপকরণের উন্নয়ন ইত্যাদি যতটা লাভজনক তার চাইতে অনেক বেশি লাভজনক হচ্ছে ধান, চাল কিংবা নলকূপের ব্যবসা, সুদে লগ্নি করা।

শহরের বিত্তবানদের জন্যে শিল্প প্রতিষ্ঠা যতটা লাভজনক তার চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক আমদানি ব্যবসা, দখল-লুণ্ঠন, পাচার বহুজাতিক কোম্পানির স্থানীয় এজেন্সি গ্রহণ, কিংবা একটা সাহায্য সংস্থা খুলে বসা, কিংবা কনসালটেন্সি ফার্ম করা। তাই গ্রাম এবং শহরের সকল বিত্তবান-বুর্জোয়াদের নিজেদের স্বার্থেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষা করা, তাদের বাজারের বিস্তার ঘটানো প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এখানে ভেতর থেকে যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা, শ্রমবিভাজনের উন্নয়নের সুযোগ সীমাবদ্ধ সেজন্যে চিন্তা-চেতনাতেও কোন বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটতে পারে না।

পুঁজিবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন, এই ব্যবস্থা তার প্রবল শক্তি দিয়ে 'সকল প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নিজের মতো করে তৈরি করে নেয়।' নিজের মতো করে মানে সবসময় নিজের প্রতিবিম্ব নয়; ইউরোপ, আমেরিকার ধনতন্ত্র বাংলাদেশে কোনোভাবেই সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। নিজের মতো করে মানে, এখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের উৎপাদন ও পুনরুত্থান এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির স্ফীতি লাভের উপযোগী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। সে কাজটি যথাযথভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি, পুঁজিবাদ বিকাশের জন্যে আরো অনেক শর্তের সাথে যে দু'টি শর্ত পূরণ করা দরকার বাংলাদেশ তার বিপরীত প্রান্তেই অবস্থান করছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের শৃঙ্খলে এবং তার অধীনে উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়ায় এখানেও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু তা এসব দেশে স্বাধীন কোনো পুঁজিবাদী উন্নয়ন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেনি। এখানকার পুঁজি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে স্বাভাবিক নিয়মেই মিশে গেছে।

ছয়

শাসকশ্রেণী বলতে ঠিক কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে, কারা রাধার ভূমিকা পালন করছে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে বলা দরকার। সাধারণভাবে শাসকশ্রেণী বলতে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন গোষ্ঠীকেই বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সেই জনগোষ্ঠী যারা বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা অক্ষত ও অব্যাহত রাখবার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন যারা তারা শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি, তাদের মুখপাত্র। এ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা, শোষণ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখবার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্রযন্ত্র, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী, বিচারব্যবস্থা এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। অন্যদের ভূমিকা হচ্ছে সহযোগী। ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাবহির্ভূত শাসকশ্রেণীর মধ্যে মাঝে মাঝে যে ঝগড়া-বিবাদ-সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়, তা 'ভাই ভাইয়ের ঝগড়ার' মতো অবৈরী। এখানে শাসিত ও শোষিতদের কোন ব্যাপার নেই।

১৯৭১-এর পরই বাঙালি শোষকশ্রেণী সুনির্দিষ্ট ও সুসংহতভাবে শাসকশ্রেণীর ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয় এবং সে হিসেবে তার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির। এই সম্পর্ক স্থাপন, এই যোগাযোগ, এই প্রেমবন্ধন কোনো দেন-দরবার বৈঠক শলা-পরামর্শের মাধ্যমে সাধিত হয় না। পরস্পরের আবেগে যেমন রাধা কৃষ্ণকে যুক্ত করে তেমনই সাম্রাজ্যবাদ আর দেশীয় শাসকশ্রেণী পরস্পরের প্রয়োজনে, অস্তিত্বের খাতিরে, পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করে এবং একে অন্যের সাথে সংযুক্ত হয়।

গ্রামের যে প্রভাবশালী ধনী কৃষক কাম ব্যবসায়ী উত্তরোত্তর স্ফীতিলাভ করছে তার সাথে গুলশানবাসী আমলার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তারা নিজের স্বার্থে বজায় রাখবার জন্যে যে কাজ করে তাই অন্যের স্বার্থ রক্ষা করে। শ্রেণী ঐক্য ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগ ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। বাংলাদেশের শাসকদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ অভিন্ন যোগসূত্রে গাঁথা হয়ে যায় কোন ব্যক্তির উদ্যোগে নয়, পুঁজির ক্রিয়ায় শোষণ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সূত্রে এবং পারস্পরিক অস্তিত্বের তাগিদ থেকে।

সে কারণে যখন ইউরোপ-আমেরিকায় যুদ্ধ অর্থনীতির উদ্ভব হয়েছে, যুদ্ধাস্ত্রের শিল্পই অন্যতম প্রধান শিল্পে পরিণত হয়েছে তখন তা ভোগ করবার মধ্যে দিয়ে প্রান্তস্থ দেশগুলোর শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে। একদিকে দুই দেশের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ হচ্ছে অন্যদিকে বরকন্দাজ বাহিনী বিকশিত হয়ে এসব দেশের শাসন-শোষণ ব্যবস্থাকে পাহারা দিচ্ছে। অবরুদ্ধ করছে নিজেদের দেশ। বাংলাদেশের সামরিক শাসন ও বরকন্দাজ বাহিনী তার সাক্ষাৎ উদাহরণ।

সাত

বাংলাদেশের বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন শরিক অংশের ভূমিকা কী? আমদানি-রপ্তানি, বিদেশি পুঁজির আগমন, বিদেশি সাহায্যের ব্যবহার, বিভিন্ন নতুন নতুন প্রকল্প নির্ধারণ ও তাতে দেশি ও বিদেশি পণ্যসম্ভার নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে আমলাদের ভূমিকাই মুখ্য। এখানে আমদানি ও রপ্তানির যত বৃদ্ধি ঘটবে, বিভিন্ন নতুন নতুন প্রকল্প ঘিরে বিদেশি বিশেষজ্ঞ-গবেষক আমদানি প্রয়োজন যত বৃদ্ধি পাবে, বিদেশি সাহায্য যত বেশি আসবে, একজন কমিশন এজেন্টরূপী আমলার ততই লাভ। পুরস্কার সবসময় অর্থে হয় না, বস্তুতেও হয়। তিনি বিদেশে কোন সেমিনারে দাওয়াত পেতে পারেন, তার ছেলে বা মেয়ের পশ্চিমের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। এমনকি বড় কোনো 'উপকার' করে দিতে পারলে 'উন্নত' কোনো পুঁজিবাদী দেশে বাড়ি-গাড়িও হয়ে যেতে পারে। জাতীয় উন্নয়ন বলে হৈ চৈ তে তিনিও লম্ফঝম্ফ করতে পারেন কিন্তু তাতে তার কাজের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। আর আমলা যদি 'সৎ' হন, তবে নিষ্কাম সেবার মধ্যে দিয়েই তাকে অগ্রসর হতে হবে। প্রক্রিয়ার তাতে কোনো হেরফের হবে না।

গবেষক-কনসালটেন্ট হিসেবে যারা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন তাদের প্রতিভা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা অবান্তর। তাঁরা প্রতিভাবান। কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে এমন কোনো গবেষণায় যুক্ত হওয়া সম্ভব নয় যা অনেক সত্য উদ্ঘাটন করবে। অন্যদিকে গবেষণা বর্তমানে ঠিকাদারির মতোই লাভজনক একটি ব্যবসা হিসেবে স্বীকৃত। এতে ঘুষ দেয়া-নেয়ার ব্যাপারও আছে। আর তা ছাড়া বড় বড় গবেষণার বেশিরভাগের অর্থ যোগানদার আন্তর্জাতিক পুঁজির সহযোগী সংস্থাসমূহ। কেননা আসলেই তাদের অনেক নতুন নতুন বিষয়ে জানা ও বোঝা দরকার। দেশীয় শাসক শ্রেণীর জন্যে এসব গবেষণার কোন দরকার নেই, কেননা তাদের ভিন্ন কোনো গতিপথ নেই, উদ্ভাবনের কোন দরকার নেই। দেশীয় বিভিন্ন সংস্থা থেকে যেসব গবেষণা হয়, সেগুলোও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'ভায়া' গবেষণা। কাজেই সীমিত বেতনে অর্ধাহারে ভোগার মতো অবস্থায় না থেকে গবেষকদের অধিকাংশ এভাবেই গবেষণার মাধ্যমে নিজেদের অভাব মেটাতে থাকেন এবং নিজেদের অতীত প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান এভাবে কাজে লাগিয়ে তারা শাসকশ্রেণীর সক্রিয় সদস্যে পরিণত হন। অন্যদিকে খুব সস্তা দামে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা বিক্রি করেন এবং এ ধরনের গবেষণার প্রক্রিয়া চালু রাখার সক্রিয় সমর্থকে পরিণত হন।

বহুজাতিক কোম্পানি বা ব্যাংকে যারা চাকরি করেন তারা তুলনামূলকভাবে দেশীয় সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকুরেদের থেকে বেশি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। এছাড়া মধ্যবিত্তের কাম্য যে ঠাঁট তা বজায় রাখাও সেখানে সম্ভব হয়। সামনে সম্ভাবনা থাকে উচ্চতর সুযোগ-সুবিধা পাবার,

কাজেই সেখানে এরাও হয়ে ওঠেন এক সক্রিয় সমর্থক গোষ্ঠী যারা নিজেদের অস্তিত্বের সাথে বহুজাতিক কোম্পানির অস্তিত্বকে একাকার করে দেখেন। যে কারণে বাংলাদেশে কার্যরত বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি ও সিগারেট কোম্পানির নানা ভূমিকা উদ্ঘাটন করে লেখায় সেখানে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদের অনেক ভর্ৎসনা শুনেছি।

গত দশকের শুরু থেকে এদেশে সহজে অর্থাগম এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার আর একটি এভিন্যু উন্মুক্ত হয়েছে। এটি হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা এনজিও। আন্তর্জাতিকভাবে কার্যরত অক্সফাম, কেয়ার, ক্যারিটাস সহ বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার অনুদানে দেশীয় বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরিচালনায় এসব সংস্থা কাজ করছে। ৭২-এর পর থেকে এযাবতকালে দেশে প্রায় দেড়শরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জন্ম হয়েছে। এগুলো একটি ভেঙে দু'টো বা তিনটি হলেও সাহায্য সংস্থাগুলো কোনরকম দ্বিধা করছে না দু'টো-তিনটিকেই একইভাবে তহবিল যোগান দিয়ে যেতে। ইদানীংকালে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোর সরাসরি অর্থানুকুল্যে মুসলিম সাহায্য সংস্থারও জন্ম হয়েছে। এসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় বর্তমানে ১০/১২ হাজারের মতো কর্মচারী যুক্ত রয়েছেন। এসব সংস্থার কোন কোনটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কথাবার্তাতেও সোচ্চার। বাংলাদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত অনেকের পুস্তক প্রকাশনা, গবেষণা, বিদেশ সফর ইত্যাদির দায়িত্বও তারা গ্রহণ করছে।

এসব সংস্থা দেশে একটি প্রভাবশালী চক্র তৈরি করেছে। এই চক্র এবং তার মাধ্যমে সৃষ্ট নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর ভূত-ভবিষ্যৎ নিশ্চিত জীবন জীবিকার সাথে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর অস্তিত্ব নির্ভরশীল এবং এই সংস্থাগুলোর অস্তিত্ব আবার সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। সে কারণে 'সাম্রাজ্যবাদী মানবতা' যত বিকশিত হবে তত এসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মচারীরা স্ফীত হবেন এবং সেই সাথে কেউ কেউ কৃষক মুক্তির নামে গণউন্নয়নের নামে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নামে সামাজিক প্রতিষ্ঠাও অর্জন করবেন। কাজেই এদের মুখেও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' জপমালা নিঃশব্দে অবিরাম চলতে থাকা স্বাভাবিক।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বণিক পুঁজির যে দাপট, পণ্য সঞ্চালনের মধ্যে দিয়েই যার বৃদ্ধি, তার সাক্ষাৎ মানব প্রতিনিধি হচ্ছে ব্যবসায়ী এবং তথাকথিত শিল্পপতিরা। আমদানি-রপ্তানি, ইন্ডেন্টিং, বহুজাতিক সংস্থার সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস ইত্যাদি ক্ষেত্রে এদের যে বিপুল প্রসার দেশে বহুসংখ্যক কোটিপতি সৃষ্টি করেছে তাদের এই সৌভাগ্যও সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা পরিপুষ্ট। সংঘবদ্ধভাবেই এরা এখন নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্যে রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিচালিত করে। তাদের চাওয়ার সাথে আইএমএফ বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ (সঠিকভাবে

বললে চাপ) খাপে খাপে মিলে যায়, যেগুলো পূরণের জন্যে প্রয়োজনে বাকরুদ্ধ করা হয় জনগণকে। কাঁচামাল কিংবা সস্তা শ্রমশক্তির মাধ্যমে তৈরি অর্ডার দেয়া পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ এবং বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের পণ্যের বাজার এদেশে নিশ্চিতভাবে বজায় রাখার মধ্যে তাদের এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ একীভূত। আর আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে অবিচ্ছিন্ন দেশীয় বণিক পুঁজির বিকাশই জাতীয় উন্নয়ন হিসেবে পরিগণিত। এই উন্নয়নের বাধা অপসারণের জন্যে যে ধরনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন সেগুলো গ্রহণে রাষ্ট্রের কোন কার্পণ্য নেই।

'অনুন্নত' দেশের বিভিন্ন খাতের মধ্যে যে খাতটির প্রতি সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ মমতা, মনোযোগ এবং আগ্রহ সেটি হচ্ছে সামরিক খাত। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যক্ষ তদারকিতে, তাদের উপদেষ্টা-প্রশিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং গোপন প্রকাশ্য বিপুল পরিমাণ অনুদানে এসব দেশে যে সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে তার জীবন-যাপন, সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ মান-সবই দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের মান থেকে অনেক বেশি বিকশিত ও সুসংবদ্ধ। যে কারণে এসব দেশের প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন সংকটের সম্মুখীন হয়, অচলাবস্থা নৈরাজ্য যখন প্রকট হয়ে ওঠে এবং যখন এসবের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হতে থাকে, তখন এই শাসনব্যবস্থা রক্ষা ও অব্যাহত রাখবার জন্যে সশস্ত্রবাহিনী, ল্যাটিন আমেরিকার এক রাজনীতিকের ভাষায়, 'রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার বদলে নিজের দেশকেই অবরুদ্ধ করে।'

সামগ্রিক শোষণ ব্যবস্থায়, বড় তরফের অংশীদার হিসেবে, সামরিক বাহিনীর আবির্ভাবে নৈতিক, সামরিক, বৈষয়িক সহায়তা দানে আন্তর্জাতিক 'মানবতাবাদী' সকল সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা প্রখর মনোযোগী সমর্থন দেয়। এখানে স্বার্থের ঐক্য আরো অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ।

এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সচল রাখা এবং তার উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে চালু রাখবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র থেকে আসা তথাকথিত 'বিদেশি সাহায্যের' ভূমিকাই প্রধান। ঋণ নিয়ে আমদানি হয়, আমদানি হলে শুল্ক পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে সরকার চলে, প্রকল্প দাঁড় করানো হয় ঋণ পাবার লক্ষ্যে, উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হলে ঋণের টাকায় বিশেষজ্ঞ আসে, যন্ত্রপাতি আসে, নষ্ট হলে ঋণের টাকাতেই কারিগর আসে। ঋণের টাকায় আমদানির কমিশনে লক্ষ-কোটি টাকা লাভ করে কিছু ব্যক্তি। একইভাবে আসে খাদ্য, যা আবার বিপুল পরিমাণ ভর্তুকিতে সরবরাহ করা হয় সুবিধাভোগী কয়েকটি গোষ্ঠীর কাছে। এ ঋণের টাকাতেই তথ্য-চলচ্চিত্র-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘরের বাইরের শাসক-শোষকদের অভিন্ন প্রয়োজনের নির্মাণ ও প্রদর্শন বিকশিত হতে থাকে। তাই এই 'বিদেশি সাহায্যের' গতিপ্রবাহে কিছুটা শৈথিল্য সৃষ্টি হলে উদ্বেগের কালো মেঘ দেখা দেয় শাসক-শোষকদের মধ্যে। আতঙ্ক নিজেদের জন্যে, আতঙ্ক এই প্রিয় ব্যবস্থার জন্যে।

কৃষ্ণের লাম্পট্য আর ছলাকলায় অস্থির রাধা গান ধরেছিল 'বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা।' তা হলে বুঝবে আমার কত জ্বালা এরকমই ছিল তার বক্তব্য। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর শাসক শ্রেণীও সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে অহরহ এরকম কথা বলে থাকে, আন্তর্জাতিক ফোরামে মাঝেমধ্যে মৃদুকণ্ঠ শোনা যায়, বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আইএমএফ-এর বেশি চাপ সৃষ্টিতে অনুযোগ প্রকাশ করে বিদেশি পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেন। রাষ্ট্রপ্রধানরাও বিভিন্ন সময়ে অনুযোগের সুরে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু রাধা যেমন এতসবের পরেও সমর্পিত হয় কৃষ্ণের কাছে, বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীও একইভাবে সমর্পিত হয় সাম্রাজ্যবাদের কাছে। কেননা, সাম্রাজ্যবাদই তার রক্ষক, প্রতিপালক। প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের শেষ ভরসা।

আট

সাম্রাজ্যবাদ মানে একটি দু'টি দেশ নয়। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের এমন চেহারা যেখানে পুঁজির কেন্দ্রীভবন-ঘনীভবন ঘটেছে। তার আন্তর্জাতিকীকরণ পরিপক্বতা অর্জন করেছে। এই পুঁজির শৃঙ্খল বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামো সৃষ্টি করেছে। এই ব্যবস্থার কেন্দ্র অবস্থান করছে একচেটিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে। কিন্তু পুঁজির সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বের সর্বত্র। এখানে এমন নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকলে সাম্রাজ্যবাদী আর বাংলাদেশের সকলে তার দ্বারা শোষিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু সেখানেও শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব আছে, সংগ্রাম আছে। বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী তার নিজেদের দেশের বুর্জোয়া শাসক-শোষক শ্রেণীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজির শোষণের শিকার। তাদের শোষণের বিনিময়ে এদেশে শাসক-শোষকদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে প্রায় আন্তর্জাতিক মানের (পরিমাণগত দিক থেকে) বিত্তশালী। যাদের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির সক্রিয়তা বজায় রাখবার জন্যে নির্ধারিত। নির্ধারিত এই দায়িত্ব ওপর থেকে চাপানো নয়, নিজেদের চাহিদার সাথে বাইরের চাহিদার সম্মিলনেই এটা ঘটেছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্তির অর্থ এদেশীয় শাসক-শোষকশ্রেণীর বিনাশসাধন এবং দেশীয় শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির অর্থ হচ্ছে-সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলগুলো সমূলে উৎপাটন। রাধা কৃষ্ণকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। দু'পক্ষের প্রতিটি অঙ্গ দু'পক্ষের জন্যে শুধু কাঁদে না, তা অবিচ্ছেদ্য।

নয়

শাসনব্যবস্থা এবং শাসকশ্রেণীর সাথে সাম্রাজ্যবাদের এই যে ঐক্যসূত্র, এই যে ঐক্য সে সম্পর্কে শাসকশ্রেণীর সকল পর্যায়ে সকলে যে সচেতন তা নয়, কিন্তু সচেতন বা অসচেতন যেভাবেই হোক তার ক্রিয়াটাই আসল।

যে কোন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা মূল্যবোধ সবই তার জীবন ও জীবিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যেভাবে জীবিকা অর্জিত হয়, সেভাবেই জীবন যাপিত হয় এবং তার মাধ্যমেই এক এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনুৎপাদক শাসকশ্রেণীর জীবিকার ধরনে কোনো শৃঙ্খলা নেই—তাদের শোষণ প্রক্রিয়াও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়নি। যেমনটি পেয়েছে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বুর্জোয়ারা। সে কারণে এখানে শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কোটিপতি, অকোটিপতি সকলের জীবিকার অর্জনের, তার রক্ষণের, এর মাধ্যমে নিশ্চিত ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। উপার্জন হচ্ছে বিভিন্ন চোরাগুপ্তা পথে, ব্যয়ের ধরনেরও ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সে কারণে অস্থিরতা আছে, প্রতিযোগিতার নগ্ন বীভৎসতা আছে এবং নিজেদের স্বার্থ পূরণের কাজ করবার মধ্য দিয়ে সব শৃঙ্খলকে রক্ষা করা তাকে শক্তিশালী করা, এখানে বিদ্যমান ব্যবস্থায় আরও লুটপাটের পথ সৃষ্টি করবার জন্যে আছে সোল্লাস অস্থিরতা।

এই সব কিছু মিলিয়ে এদেশে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির বিকাশ ঘটেছে, সেইসাথে বিস্তৃতি ঘটেছে সুবিধাবাদিতার। সুবিধাবাদিতাই এ দেশের প্রায় ভেঙ্গে পড়া শাসনব্যবস্থা এবং এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সাম্রাজ্যবাদের নিশ্চিত ভিত্তি স্থাপন করেছে। সুবিধাবাদিতা বিস্তৃত হয়েছে প্রগতিশীলদের মধ্যেও। 'প্রগতিশীল ধান্ধাবাজির' ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সেজন্যে দেখি, শাসকশ্রেণী থেকে বিযুক্ত হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে বামপন্থিরা সাহায্য সংস্থার কাজ করছেন, একে আবার তাত্ত্বিক ভিত্তি দেবারও চেষ্টা হচ্ছে। দেখি, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী রেডিওতে জনসংখ্যা সমস্যাকেই প্রধান সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করে কথিকা পাঠ করেন, দেখি পাঠচক্র ও প্রকাশনা গড়ার নামে 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবীরা সাহায্য সংস্থার অর্থ নিয়ে কোমর বাঁধেন, দেখি বাইরে যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলা হচ্ছে ভেতরে তাদের থেকেই বিপুল চাঁদা তুলতে, দেখি ভেতর থেকে শেষ করে দেবার তত্ত্ব দিয়ে প্রগতিশীলরা সাম্রাজ্যবাদী গবেষণা ও সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করতে থাকেন।

'হঠাৎ পড়িল মনে/ আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নাই'– হঠাৎ হঠাৎ এরকম বোধ আমাদের দেশেরও অনেকের মধ্যে আছে। সময় বদলেছে, কাল বদলেছে; তাই জনগণের কথা একটু বেশি মাত্রায় না বললে শাসকশ্রেণীরও সামাজিক স্বীকৃতি, সামাজিক ভিত্তি পোক্ত হয় না। কিন্তু এতে মূলগত আচরণের কোন হেরফের হয় না।

অ্যাপিয়ারেন্স এবং রিয়ালিটির এই পরস্পরবিরোধী চেহারা যারা দক্ষভাবে বজায় রাখতে পারেন তারা টিকে যান অনেকদিন। মানুষের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাকেও বশীভূত করে রাখতে পারেন।

দশ

ক'দিন আগে এখানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল। ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাবার এক সপ্তাহ পরও জানা যায় নি, ঠিক কত লোক নিহত হয়েছেন। ১০, ১৫, ২০ হাজার, সংখ্যা শুধু বাড়ছেই। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের এহেন থাবা অপরিচিত বা অপ্রত্যাশিত নয়। বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস একটা না একটা আছেই। একে আল্লাহর গজব, কপাল ইত্যাদি বললে শাসকশ্রেণীর দায়-দায়িত্ব অনেক কমে যায়। কিন্তু এই গজব এবং 'খারাপ কপাল'-এরও শ্রেণীচরিত্র আছে, কেননা এগুলো সকল শ্রেণীর লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। খড়ের ঘর উড়িয়ে নিতে ৩০ মাইলের ঝড়ই যথেষ্ট, সেখানে ১০০ মাইল বেগে ঝড় উপরন্তু জলোচ্ছ্বাস তাকে নিঃস্ব করবে, স্বজনহারা করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তার ঘরে রেডিও-টিভি থাকে না যে আগে থেকে সাবধান হওয়ার সুযোগ থাকবে। গত বেশ কিছুদিন ধরে রেডিও-টিভিতে আক্রান্ত নিহত-আহত স্বজনহারা মানুষদের নিয়ে খুব আহাজারি হচ্ছে। কিন্তু যে শাসকশ্রেণী এ আহাজারি করছে তারা কখনই এসব অঞ্চলের মানুষদের নিরাপত্তা বিধানের স্থায়ী ব্যবস্থা করেনি, একটু আগে গিয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেনি, মজবুত দৃঢ় নিরাপদ আশ্রয় গড়ে দেয়নি। অথচ এসব অঞ্চলের এসব মানুষ যে কোন মুহূর্তে ভেসে যেতে পারেন, এটা কারও অজানা নয়। শাসকশ্রেণীর বর্তমান আহাজারি শুধু লোক দেখানোর কারণেই নয়, প্রচুর রিলিফ অর্থের চাহিদা সৃষ্টি করে তার 'সদ্ব্যবহারে' তাদের সক্রিয়তার দৃষ্টান্ত প্রচুর।

একদিকে যখনই বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস বা লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই 'শপিং লিস্ট' তৈরি হতে থাকে অনেক ঘরে। সেইসাথে মায়াকান্নার প্রতিযোগিতা।

এগারো

আগেই বলেছি, আগের সব ব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদ গুণগতভাবে পৃথক অনেক ক্ষেত্রেই। যার অন্যতম একটি হচ্ছে, এতে ব্যক্তি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়, পুঁজিই এখানে চালনা করে, নির্ধারণ করে সবকিছু।

সেকারণে বাংলাদেশের একজন দালাল বুর্জোয়ার চিন্তা-চেতনা তৈরির জন্যে, তার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্যে তাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হয় না। বাংলাদেশের ভেতরে নিজের কাঙ্ক্ষিত জীবনব্যবস্থাকে অক্ষত রাখবার প্রক্রিয়াতেই সে দালাল বুর্জোয়াতে পরিণত হয়। অনেকে এমনকি প্রগতিশীল চেহারা নিয়ে থাকলেও কোনো না কোনোভাবে দেশীয় শোষণ-শাসনব্যবস্থা এবং বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সেবা করতে থাকে। দেশীয় পুঁজি, জাতীয় পুঁজি বলে এখানে ভিন্ন কিছু পাওয়া কঠিন। এখানে সব পুঁজি একাকার। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক, ফুটপাতের ব্যবসায়ী পর্যন্ত এই পুঁজির গতি। এর গতি আরও মসৃণ করবার জন্যে যতরকম উদ্যোগ আর ব্যবস্থা।

শোষকদের অস্তিত্ব ততদিনই থাকতে পারে যতদিন শোষিতরা আছে। কিন্তু শক্তির ভারসাম্য অনড়-অচল কিছু নয়। তার মধ্যে পরিবর্তন হতে থাকে। তা ছাড়া বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী যে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে সংগঠিত তা চিরকালের জন্যে অখণ্ড, দৃঢ় অবস্থানে থাকতে পারে না। সমাজবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই তার মধ্যে ভাঙন আসে, শাসকশ্রেণীর মধ্যে থেকেই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শাসিত শোষিতদের স্বার্থের সাথে নিজেদের স্বার্থকে সংযুক্ত করবার প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানচর্চার যে ধারাগুলো বিদ্যমান ব্যবস্থা, শ্রেণী-আধিপত্য বজায় রাখবার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে থাকে, স্বয়ংক্রিয় একটি ক্যাটালিস্ট হিসেবে বুর্জোয়া চিন্তা-চেতনার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করতে থাকে, তারই অধিকতর অগ্রসর বিকাশে এই শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি হয় বিপরীত প্রক্রিয়া এবং বিকাশ ঘটে পাল্টা চেতনার নতুন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর। বৃদ্ধি ঘটতে থাকে সচেতন সংগঠিত একটি শক্তির, যার কাজ অচলকে ধ্বংস করা, নতুন সচল সৃষ্টি করা। এভাবে প্রতিক্রিয়ার গর্ভেই প্রগতির জন্ম হয়।

আরেকদিক থেকে বলা যায় সেকারণে কংস রাজারও মৃত্যু থাকে। কংস রাজা অমর হওয়ার জন্যে রাজ্যের সকল শিশু-পুত্র সন্তানকে হত্যা করেছিল। কিন্তু তারপরও জেনেছিল, 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' শেষ রক্ষা হয় নি তার, গোকুলে ঠিকই তার হন্তা বেড়ে উঠেছিল। যে ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বসবাস করছি তার গোকুলে কংস হন্তা শিশুর বয়স আমরা জানি না; কিন্তু জানি, নিশ্চিত জানি, সে বেড়ে উঠছে। সেই শক্তির সময় যখন পরিপক্ব হবে তখন প্রবল শক্তিধর পৃষ্ঠপোষক প্রবল প্রেম দিয়েও এদেশের শাসক-শোষকশ্রেণীর মরণ ঠেকাতে ব্যর্থ হবে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে এদের নৃশংস প্রেমলীলার সমাপ্তি সেখানেই।

ডিসেম্বর, ১৯৮৫

শিক্ষাখাতে ব্যয় এবং সামগ্রিক বাস্তবতা

একটি সমাজের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে নতুন কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থিত করা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটি বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কতটা গুরুত্বের সাথে গৃহীত হচ্ছে, এর বিকাশের সাথে বর্তমান শাসকশ্রেণীর সম্পর্ক কী, খাতওয়ারি অগ্রাধিকারে শিক্ষার অবস্থান কোথায়, এর সাথে সম্পর্কিত শিক্ষকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার গতি, প্রবণতা ইত্যাদির প্রধান দিকগুলো সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা খুবই প্রয়োজন এবং প্রাসঙ্গিক। আর সেটাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমরা এই আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি সত্য মনে রাখছি :

ক. শ্রেণীভিত্তিক একটি সমাজে শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষা খাতের গুরুত্ব, মর্যাদা সবই নির্ধারিত হয় সে সমাজের শাসকশ্রেণীর প্রয়োজন, প্রবণতা এবং অন্তর্নিহিত চরিত্র দ্বারা।

খ. সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, বাংলাদেশ একটি 'অনুন্নত' রাষ্ট্র, যেখানে পুঁজিবাদই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য রয়েছে।

গ. বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে তার অস্তিত্ব, বিকাশ, স্ফীতি, প্রবণতা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত।

ঘ. বিদ্যমান শাসন-শোষণমূলক ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ দমন-পীড়ন ছাড়া চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ায়, শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনেই, সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। সামরিক বুর্জোয়ারাই এখন বিদ্যমান শাসন-শোষণমূলক ব্যবস্থার মুখ্য প্রতিনিধি এবং শাসন-শোষণের বড় তরফের অংশীদার। বেসামরিক বুর্জোয়ারা এখানে ছোট তরফের অংশীদার হিসেবে মৌলিক ঐক্যের অধীনে মাঝে মাঝে সাময়িক বিরোধাত্মক সম্পর্কের দ্বারা সামরিক বুর্জোয়াদের সাথে সম্পর্কিত ও ঐক্যবদ্ধ এবং

ঙ. সবর্জনীন শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষাগবেষণার গুণগত বিকাশ শুধু সমাজতন্ত্রের উপাদান নয়। এর উদ্বোধন পুঁজিবাদের সাথেই ঘটে। পুঁজিবাদ তার দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদা পূরণের জন্যেই শিক্ষার বিস্তার ও বিকাশের তাগিদ বাস্তবায়ন

করে। বর্তমান শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে পুঁজিবাদী উন্নয়নের ইতিহাসে এ ধারাটি প্রায় একই রকম।

ঘোষণা ও বাস্তবতা

১৯৭২-এ স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের 'রাষ্ট্রীয় নীতির মৌলিক দিকসমূহ' অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

ক. সকল শিশুর জন্যে অভিন্ন, গণমুখী ও সর্বজনীন ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

খ. সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সম্পর্কিত করা এবং এসব প্রয়োজন মেটানোর জন্যে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও উদ্বুদ্ধ নাগরিক তৈরি করা।

গ. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

সংবিধানের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুঁজিবাদী উন্নয়নের দর্শনের সাথে সংগতিপূর্ণ হলেও আমরা লক্ষ্য করি যে, লুটেরা পুঁজির বিকাশ উপরোক্ত লক্ষ্য ও ঘোষণাকে রক্তহীন করে তুলেছে।

সর্বজনীন শিক্ষার এই উদ্দেশ্য স্বাধীনতার আগেও ব্যক্ত করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষাসংস্কার কমিশনের রিপোর্টে পরবর্তী ১৫ বছরের মধ্যে শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করবার কথা বলা হয়। ১৯৫৭ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাকে পুঁজি হিসেবে গণ্য করে বলা হয় যে, এ থেকে দক্ষ জনশক্তি উৎপাদিত হবে। রিপোর্টে পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন করার জন্যে এবং পরবর্তী ১৫ বছরের মধ্যে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন করবার সুপারিশ করা হয়। ১৯৬৬ সালে 'শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও কল্যাণ কমিশনের' রিপোর্টে পূর্বোক্ত কমিশনের রিপোর্টের উপরোক্ত সুপারিশ অনুমোদন করা হয়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। কমিশন প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করবার সুপারিশ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী বয়সী জনসংখ্যা হচ্ছে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ। সর্বশেষ সরকারি হিসাব অনুযায়ী এর মধ্যে স্কুলে ভর্তি হয়েছে ৯৫ লক্ষ ৫১ হাজার বা শতকরা ৫৩.০৫ ভাগ।[১] এই শতকরা ৫৩ জন স্কুলের ছাত্র হিসেবে তাদের পাঠ শেষ করতে সক্ষম নয়, কেননা আরেক হিসেবে দেখা যায় যে, ৫ থেকে ৯ বছরের বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে স্কুলপাঠ শেষ করতে পারে

১ Bangladesh Education in Statistics, B.B.S, Sept. 1985, P-4

মাত্র শতকরা ২২.৫ ভাগ।[২] অন্য এক হিসেবে দেখা যায় যে, প্রথম শ্রেণীতে যারা ভর্তি হয় তাদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাবার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, পঞ্চম শ্রেণীতে পৌছার আগে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয় শতকরা ১০ ভাগের কিছু বেশি।[৩]

উচ্চশিক্ষা তো দূরের কথা, প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই জনগণ-এর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এই বিচ্ছিন্নতার মূল উৎস অর্থনৈতিক। বাংলাদেশে সরকারি হিসাব অনুযায়ী শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, বেকারত্ব শতকরা ৩৫ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ, কর্মরতদের অধিকাংশ আধা বেকার। শতকরা ৫০ ভাগ ভূমিহীন, কার্যকর ভূমিহীন প্রায় ৭৫ ভাগ। এ রকম একটি বাস্তবতায় সর্বজনীন শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের মূল দায়িত্ব যে সরকারকেই নিতে হয়, তা বলাই বাহুল্য। এ ব্যাপারে সরকারি ভূমিকা সম্পর্কে আমরা একটু পরেই আসছি।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশের জীবনযাত্রার মান প্রধানত ভূমি মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কিত। সে কারণে দেখা যায় ভূমি মালিকানার সঙ্গে স্কুলে যাবার হারও উঠানামা করে।

ছক-১

ভূমি মালিকানার সাথে স্কুল পাঠের সম্পর্ক

ভূমি মালিকানা	স্কুলে যাচ্ছে (%)	স্কুল ত্যাগ করছে (%)	কখনই যায়নি (%)
১ একরের নিচে	১৫.৬৯	১.১৫	৩৩.১৬
১ থেকে ২ একর	২০.৫২	১.৩৯	২৮.০৯
২ থেকে ৩ একর	২৩.০৬	১.১৫	২৫.৭১
৩ থেকে ৪ একর	২৬.৪৭	০.৮৫	২২.৭০
৪ থেকে ৫ একর	২৬.৮৮	১.৫১	২২.৩৬
৪ থেকে ৭.৫ একর	২৭.০৭	০.৪৩	২২.৭৫
৭.৫ থেকে ১০ একর	২৮.০৪	–	২১.৯৬
১০ থেকে ১৫ একর	৩৯.৪৪	১.৮২	৯.০৯
১৫ একরের বেশি	৪১.৩৫	–	৮.৬৫

সূত্র : জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ১৯৭৯।

---

২ ঐ, পৃ : ১৬৮

৩ S.A. Quadir and K.S. Ahmed, 'Role of Education Projections in Educational Planning in Bangladesh', Dhaka, 1980.

ছক-২

পেশার সাথে স্কুল পাঠের সম্পর্ক

পেশা	স্কুলে যাচ্ছে	স্কুল ত্যাগ করছে	কখনই যায় না
দিনমজুর	১৩.৭৯	২.৯৭	৮৩.২৪
পেশাজীবী	২৪.৯৪	১.৪৫	৭৪.৩৪
কৃষিজীবী	৪২.৯৯	২.০৬	৫৪.৯৫
ব্যবসা	৪২.৪০	১.৯৩	৫৪.৬৬
চাকুরে	৪১.৪৫	২.২৯	৫৬.২৬

সূত্র : ঐ

এরকম একটি অবস্থায় সরকার শিক্ষাখাতকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে? এর বিকাশের জন্যে কী প্রচেষ্টা নিচ্ছে পরবর্তী আলোচনা থেকে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

শিক্ষাখাতে ব্যয় ও তুলনামূলক অবস্থান

স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয়ের একটি চিত্র আমরা নিচের ছক থেকে পাই। এখানে একই সাথে প্রতিরক্ষা খাতের তুলনামূলক অবস্থান দেখানো হলো।

ছক-৩

রাজস্ব ব্যয়ে শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার অবস্থান

বছর	মোট রাজস্ব ব্যয়	শিক্ষা খাতে ব্যয় (কোটি টাকা)	শতকরা হার	প্রতিরক্ষা (কোটি টাকা)	শতকরা হার
১৯৭২-৭৩	২১৩.১১	৪৫.০৬	২১.১৪	২০.১৬	৯.৪৬
১৯৭৩-৭৪	৩৪৬.২০	৬৪.৮২	১৮.৭২	৪১.৯৬	১২.১২
১৯৭৪-৭৫	৫৬৫.৫৩	৮২.২১	১৪.৫৩	৭০.৮৫	১২.৫৩
১৯৭৫-৭৬	৬৩৬.০৩	৮৩.৪৫	১৩.১২	১১০.৯৩	১৭.৪৪
১৯৭৬-৭৭	৭৬৯.৩১	৯৮.২১	১২.৭৬	১৫১.৩৯	১৯.৬৮
১৯৭৭-৭৮	৯৪০.৬৫	১২৬.৪৯	১৩.৪৪	১৪৪.১৭	১৫.৩৩
১৯৭৮-৭৯	১০৮৭.৫৮	১৬৬.৫০	১৫.৩০	১৪৮.৮৭	১৩.৬৫
১৯৭৯-৮০	১৩৪১.৯৪	১৭২.৮২	১২.৮৭	২৪২.৬৭	১৮.০৮
১৯৮০-৮১	১৪৮১.৫৬	২০৬.৫৪	১৩.৯৪	২৭৪.১৯	১৮.৫০

বছর	মোট রাজস্ব ব্যয়	শিক্ষা খাতে ব্যয় (কোটি টাকা)	শতকরা হার	প্রতিরক্ষা (কোটি টাকা)	শতকরা হার
১৯৮১-৮২	১৮৪৯.৬৮	২৩১.৬৪	১২.৫২	৩৪৭.৫৬	১৮.৭৯
১৯৮২-৮৩	২১৪৬.৭০	২৯৪.২৯	১৩.৭০	৪১৮.৩৬	১৯.৪৯
১৯৮৩-৮৪	২৫০৩.০০	৩৬৫.১৭	১৪.৫৮	৪২৭.০৮	১৭.০৬
১৯৮৪-৮৫	২৯৩০.০০	৪৯২.৭২	১৬.৮১	৪৯২.৭৪	১৬.৮২
১৯৮৫-৮৬	৩৩১৩.০০	৪৮৭.৪৪	১৪.৭১	৪৬৫.০৮	১৪.০৩

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৮৫-৮৬ থেকে তৈরি।

উপরের ছক থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতার পর পর রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাখাতের অবস্থান ছিল প্রতিরক্ষার দ্বিগুণেরও বেশি, যথাক্রমে শতকরা ২১.১৪ ও ৯.৪৬ ভাগ। এরপর দেখা যায়, শিক্ষাখাতের ব্যয় আনুপাতিক হারে ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে, প্রতিরক্ষা খাতে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯৮৩-৮৪-৮৫-র ছাত্র গণআন্দোলনের ফলে প্রকাশ্য রাজস্ব ব্যয় প্রতিরক্ষা খাতে কিছু কমানো হয়, কিন্তু ভর্তুকি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা একইভাবে বাড়ানো হয়।

জিডিপির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যয়ের অনুপাত পরীক্ষা করলে আমরা নিম্নোক্ত চিত্র পাই।

ছক-৪

জিডিপিতে শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার অবস্থান।

বছর	জিডিপি, চলতি বাজার মূল্যে (কোটি টাকা)	শিক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয়	জিডিপির শতকরা হার	প্রতিরক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয়	শতকরা হার
১৯৭২-৭৩	৪৯৬১	৪৫.০৬	০.৯	২০.১৬	০.৪
১৯৭৯-৮০	১৯৭৯৮.৫	১৭২.৮২	০.৮৭	২৪২.৬৭	১.২২
১৯৮২-৮৩	২৮৮৪২.৩	২৯৪.২৯	১.০২	৪১৮.৩৬	১.৪৫
১৯৮৫-৮৬	৩৯৭৭৪.৬	৪৮৭.৪৪	১.২২	৪৬৫.০৮	১.১৭

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৮৪-৮৫ থেকে তৈরি।

রাজস্ব ব্যয়ের উন্নয়ন ব্যয় যোগ করলে এই অনুপাত সামান্য বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তা কোনোভাবেই শতকরা দেড় ভাগের বেশি যাবে না। অথচ শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী এমনকি অনেক প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী দেশেও শিক্ষাখাতে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ থেকে ৮ ভাগ ব্যয় হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কোনো বছর উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৫ ভাগ অতিক্রম করে নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন বছরে এই ব্যয়ের বন্টন নিচের ছক থেকে পাওয়া যায় :

ছক-৫

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষার অবস্থান

বছর	বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট	শিক্ষা (আনুমানিক)*	অনুপাত %
১৯৮০-৮১	২৭০০.০০	১০৭.০৫	৩.৯৬
১৯৮১-৮২	৩০১৫.০০	১২১.০০	৪.০১
১৯৮২-৮৩	৩৩০০.০০	১২৪.৭০	৩.৭৭
১৯৮৩-৮৪	৩৪৮৩.৮৬	১৩৫.২৫	৩.৮৮
১৯৮৪-৮৫	৩৫০৮.৪২	১২৭.৩১	৩.৬২
১৯৮৫-৮৬	৩৮২৫.৭২	১৫৮.৮৬	৪.১৫

* এখানে শিক্ষার সাথে ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি একসাথে হিসাব করা হয়েছিল। কয়েক বছরের হিসাবে শিক্ষা ছাড়া অন্যগুলোর অনুপাত শতকরা ১০ ভাগের কাছাকাছি হওয়ায় মোট বরাদ্দ থেকে শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিয়ে আনুমানিক শিক্ষা বরাদ্দ হিসাব করা হয়েছে।

সূত্র। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৮৫ থেকে তৈরি।

অন্যদিকে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে শিক্ষাখাতের বরাদ্দের পরিমাণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি এর অনুপাত ক্রমশই কমছে।

ছক-৬ : বিভিন্ন পরিকল্পনায় শিক্ষার অবস্থান।

পরিকল্পনা	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	শিক্ষা (কোটি টাকায়)	%
১. প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা যৌথভাবে	৫৪৩৩.০০	২৫৮.৮৬	৪.৭৬
২. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৬০৬০.০০	৫০৯.৫১(ধর্মসহ)	৩.১৭
৩. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮৬০০.০০	১১৮০.০০	৩.০৫

উৎস : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল, ১৯৮৫ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৮৫ থেকে তৈরি।

শিক্ষাখাতে ব্যয় তুলনামূলকভাবে ক্রমহ্রাসমান এবং অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এই অপ্রতুল ব্যয় বরাদ্দও পুরোপুরিভাবে ব্যয় হয় না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় যৌথভাবে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪৫৪.০১ কোটি টাকা, কিন্তু বাস্তবে এই খাতে ব্যয় হয়েছে ২৫৮.৮৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ ব্যয় বরাদ্দ টাকার অংকে প্রায় অর্ধেকে (৫৭.০১%) নেমে এসেছে–প্রকৃত মূল্যে এই বরাদ্দ আরও কমেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এখানে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৭০৭ কোটি টাকা, কিন্তু টাকার অঙ্কে প্রকৃত ব্যয় দাঁড়ায় ৫০৯.৫১ কোটি টাকা বা শতকরা ৭২ ভাগ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ১৩৩টি নতুন প্রকল্প সমাপ্ত করবার কথা ছিল, কিন্তু এর মধ্যে শুধু ৮৮টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। এই সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর অধিকাংশই আবার প্রথম ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্প। মোট ৮৮টির মধ্যে ৫২টি আগের পরিকল্পনাকাল থেকে এসেছে এবং মাত্র ৩৬টি এই পরিকল্পনাকালে গৃহীত প্রকল্প। মোট বরাদ্দের মধ্যে মোট ১২০ কোটি টাকা পুরনো অসমাপ্ত প্রকল্পের জন্যে খরচ করা হয়।

শিক্ষাখাতে প্রকৃত ব্যয়বরাদ্দ হ্রাসের সময়কালে জনগণের প্রকৃত আয়ও কমে গেছে। এই সময়ে পারিবারিকভাবে শিক্ষার ব্যয়ভার বেড়েছে, কিন্তু এই ব্যয়ভার নির্বাহ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধি এই সংকটকে আরো তীব্র করেছে। এই ব্যয় বৃদ্ধির একটি চিত্র নিচে পাওয়া যাবে।

ছক-৭

শিক্ষা উপকরণের দাম বৃদ্ধির হার

দ্রব্য	একক	১৯৭২	১৯৭৭	১৯৮৪	বৃদ্ধির হার
১.কাগজ-ফুলস্কেপ	রিম	১১.০০	৪৮.০০	১১০.০০	৯০০
২. পেনসিল	প্রতিটি	০.২৫	১.৩৭	২.০০	৭০০
৩. কালি	প্রতি বোতল	০.৩৭	২.৫০	৩.৫০	৮৪৫
৪.ড্রয়িং পেনসিল	ডজন	১৮.০০	৪৫.০০	৭২.০০	৩০০
৫. জ্যামিতি বক্স	একটি	৭.৫০	২০.০০	২৮.০০	২৭৩.৩৩
৬. বায়োলজি বক্স	প্রতি বক্স	২৫.০০	১৭০.০০	৩০০.০০	১১০০
৭. বাল্যশিক্ষা	একটি	০.২৫	০.৭৫	৪.০০	১৫০০
৮. ইংরেজি প্রাথমিক বই	একটি	০.৭৫	২.২৫	৫.০০	৫৬৬.৬৬

৯. ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্য বই-অংক	একটি	১২.০০	১৮.০০	৪৫.০০	২৭৫
ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্য বই-বোটানি	একটি	২.০০	৪৫.০০	৬৫.০০	২২৫
ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্য বই অর্থনীতি	একটি	১৫.০০	২৫.০০	৪৫.০০	২০০
১০. ডিগ্রি বই	একটি	৭.০০	১৫.০০	১৫.০০	২৫৭.১৪
ডিগ্রি বই	একটি	২০.০০	৩৫.০০	৪৮.০০	১৪০

সূত্র : BBS, Bangladesh Education in Statistics, Sept. 1985 থেকে তৈরি।

ছক-৮

শিক্ষা ব্যয় : চলতি ও স্থির মূল্যে

চলতি বাজার মূল্যে শিক্ষা ব্যয় (কোটি)	১৯৭৩-'৭৪	১৯৭৬-'৭৭	১৯৮২-'৮৩
শহর	১৩.১৬	২১.৭০	৪২.২১
গ্রাম	৮৫.১৫	১৩৮.৪৮	২৬৯.২৩
মোট	৯৮.০৭	১৬১.৭৫	৩১৪.৫০

স্থির মূল্যে শিক্ষা ব্যয় (কোটি)	১৯৭৩-'৭৪	১৯৭৬-'৭৭	১৯৮২-'৮৩
শহর	১৩.১৬	১৪.০৮	১৬.১০
গ্রাম	৮৫.১৫	৮৯.৮৪	১০২.৮৯
মোট	৯৮.০৭	১০৪.৯৪	১২০.১৯

জিডিপির শতকরা হারে মোট ব্যয়	১.৪৩	১.৬২	১.২০
মাথাপিছু ব্যয় চলতি মূল্যে (টাকায়)	১২.৮	১৯.৮	৩৩.৬

সূত্র : ঐ, পৃ : ১৩৮

মাথাপিছু ব্যয় চলতি মূল্যে দেখানোতে কিছুটা বর্ধিত অঙ্ক দেখা যাচ্ছে। দামস্তর বৃদ্ধি বিবেচনা করলে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয় কমে গেছে।

এরকম অবস্থায় চলতি শিক্ষাক্ষেত্রের সীমিত পরিকল্পনা কোন কোন দিকে 'সফল' হচ্ছে এবং কোন কোন দিকে ব্যর্থ হচ্ছে, তার চিত্র নিচের ছক থেকে পাওয়া যাবে।

ছক-৯

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে লক্ষ্যমাত্রা, সাফল্য

শিক্ষার পর্যায়	১৯৭৩-এর চিত্র	১৯৮০-এর চিত্র	১৯৮৫ টার্গেট	সাফল্য
১. প্রাথমিক শিক্ষা (লাখ ছাত্র)	৬০.০০	৮২.৮৬	১২৯.৯০	৮৯.২০
২. মাধ্যমিক শিক্ষা (লাখ ছাত্র)	১৭.০০	২০.০০	২৫.০০	২৪.৮৩
৩. কলেজ শিক্ষা (লাখ ছাত্র)	৩.২৮	৩.৯৬	৪.৮১	৪.২৮
৪. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	২৩,৭২৬	৩০,০০০	৩৪,০০০	৩৮,৩০০
ক. সাধারণ	১৯,২৮৭	২৫,৬৮০	২৯,০০০	৩১,৮৮৬
১. বিজ্ঞান	৬,২৭৭	৭,২৯৪	৯,৩৯০	৮,৪৯৫
২. কলা ও সমাজবিজ্ঞান	১৩,০১০	১৮,৩৮৬	১৬,৬১০	২৩,৩৯১
খ. প্রফেশনাল	৪,৪৩৯	৪,৩২০	৫,০০০	৬,৪১৪
১. প্রকৌশলী	১,৯৪৪	১,৯০০	২,২০০	৩,০৮১
২. কৃষি	২,৪৯৫	২,৪২০	২,৮০০	৩,৩৩৩
৫. কারিগরি শিক্ষা	১৫,৭১০	২০,৩৩৩	৩০,৮৩০	২০,৩৫৯
ক. প্রকৌশলী	১,১১০	২,০৮০	৩,৩৩০	৩,১২০
খ. কারিগরি	১০,৯০০	১১,৮৩৩	১৭,৫০০	১২,৭৪৯
গ. বৃত্তিমূলক	৩,৭০০	৬,৪২০	১০,০০০	৪,৪৯০
৬. বাণিজ্যিক শিক্ষা	২,৫৫০	২,৭২০	১০,০০০	৩,৩০০

সূত্র : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল, ১৯৮৫

উপরের ছক অনুযায়ী শিক্ষার যে স্তরগুলোতে খুব রক্ষণশীল টার্গেটও পূরণ হয়নি সেগুলো হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কলেজ শিক্ষা, বিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং বাণিজ্যিক শিক্ষা। এগুলোর মধ্যে আবার টার্গেট থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষায়। যেসব পর্যায়ে শিক্ষা টার্গেট থেকেও বেশি হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কলা, সমাজবিজ্ঞান ও প্রফেশনাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা।

শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অপ্রতুলতা এবং এ খাতের বিকাশের জন্যে ন্যূনতম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের অনুপস্থিতি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাখাতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মানগত বৈষম্য, বিকাশের ধারায় সংগতিহীনতা, ব্যয় বরাদ্দে অযৌক্তিক প্রবাহ বৃদ্ধি এ নৈরাজ্যকে গভীরতর করছে মাত্র।

নিচের ছকগুলোতে বিভিন্ন খাতের শিক্ষায় অগ্রগতি ও অগ্রাধিকার স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ছক-১০

প্রাথমিক স্কুল (গ্রাম ও শহর)

১৯৭৮-৭৯			১৯৮০-৮১			১৯৮৩		
গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
৪০০০১	২৪৩৪	৪২৪৪৩	৩৯৯৭৬	২৪৭১	৪২৪৪৭	৪০২৫০	২৭৮৯	৪৩০৩৯

ছক-১১

প্রাথমিক স্কুল সংখ্যার বৃদ্ধির হার

বৃদ্ধির হার (১৯৭২-১৯৮৩)

গ্রাম (শতকরা)	শহর (শতকরা)	মোট (শতকরা)
০.৬০	১৪.৫৮	১.৪০

ছক-১২

মাদ্রাসা সংখ্যা বৃদ্ধির হার

১৯৭৮-৭৯	১৯৮৩-৮৪	বৃদ্ধির হার (শতকরা)
২৩৮৬	২৮৬৪	২০.০৩

ছক-১৩

মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধির হার

১৯৭৮	১৯৮০	১৯৮৪	বৃদ্ধির হার-১৯৭৮-'৮৪
৭৯৮১	৮০২০	৮৫৫১	৭.১৪

ছক-১৪ : কলেজ সংখ্যা বৃদ্ধির হার

১৯৭৮	১৯৮০	১৯৮৪	বৃদ্ধির হার
৬০০	৫৯৬	৬৫৭	৯.৫

সূত্র : ছক ১০ থেকে ১৪, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৮৫ থেকে গৃহীত।

ছক-১৫

বিভিন্ন উপখাতে ব্যয়, ১৯৮৫

	ছাত্র	শিক্ষক	মোট ব্যয় (কোটি) টাকা	শিক্ষক ছাত্র অনুপাত	ছাত্রদের বার্ষিক মাথাপিছু সরকারি ব্যয় (টাকা)
প্রাথমিক স্কুল	৯৫,৫১,০০০	১,৮৩,৬৫৮	২৯০.১৮	১:৫২	২২০.০০
মাদ্রাসা	৮,৫৪,৬৫৩	৩৬,৫৪৯	৩৫.৪১	১:২৩	৪১৬.৫৮
মাধ্যমিক স্কুল	২৬,০৮,০০০	৯,৫২,৭৫	১০৬.৮৪	১:২৭	১৪১০.০০
সাধারণ কলেজ	৪,১৬,৭৭৭	১,২৬,২৩	৪৫.০১	১:৩৩	১০৯৭.০০
কারিগরি	১৯,৭৮৯	১,০৭১	১১.০৯	১:১১	১০,০৮১.৮
বিশ্ববিদ্যালয়	৪০,৫৯১	২,৬২৬	৪৩.৬৩	১:১৫	১০,৯০৭.০০
ক্যাডেট	২,৫২৫	২১০	৫.০৮	১.১২	২০,১১৮.৮

উপরের ছক হতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রদের মাথাপিছু ব্যয় সর্বনিম্ন এবং ক্যাডেট কলেজে মাথাপিছু ব্যয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথাপিছু ব্যয়ও ক্যাডেট থেকে নিচে। শিক্ষা উপকরণসহ শিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও ক্যাডেট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর অবস্থানে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় খাতে বর্তমানে যতটুকু অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা ব্যবহারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয়ের পথে, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যে দেখা যায়, হল নির্মাণের পরিবর্তে শর্ত অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে সুইমিংপুল নির্মাণ করতে হয়, যা বিভিন্ন কারণে অকেজো হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহেও বাধা সৃষ্টি করে।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের শিক্ষার প্রশ্ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ গ্রামে বাস করে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণোপযোগী শিশুদেরও শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ গ্রামে বাস করে। সেহেতু গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সামগ্রিক শিক্ষার প্রধান ভিত্তি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সামগ্রিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাখাতে এই ব্যয় বরাদ্দ বর্তমান স্কুলগুলোর ন্যূনতম মান বজায় রাখার জন্যেও যথেষ্ট নয়। এই কথা সচেতন সকলেই স্বীকার করবেন যে, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা প্রদান

বা গ্রহণের কোনো উপযোগী পরিবেশ নেই। চেয়ার-বেঞ্চ, টুল, ব্ল্যাকবোর্ড নেই, ঘরের চাল নেই, অনেক স্কুলে বেড়া নেই, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মাঠে বসেই ক্লাস নিতে হয়। এখানে শিক্ষার যে ভিত্তি গড়ে ওঠে তার দুর্বলতা যে সমগ্র শিক্ষাকে প্রভাবিত করবে তাতে আর সন্দেহ নেই। এদিক থেকে শহরের প্রাথমিক স্কুলগুলোর অবস্থা সন্তোষজনক না হলেও তুলনামূলকভাবে উন্নত। তাছাড়া শহরে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রামের চাইতে ২৪.৩ গুণ বেশি।

এর পাশাপাশি অত্যন্ত আধুনিক এবং ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। সেখানে শিক্ষার মান উঁচু। কিন্তু তার ব্যয় এই শিক্ষাকে খুব মুষ্টিমেয়ের মধ্যে ধরে রাখে, ভবিষ্যৎ শাসকগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তাকে যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করে।

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারের যে ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটি মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের আনুকূল্যে ও আগ্রহে সংগঠিত হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক করবার কথা এই ভূমিকা যুক্তিযুক্ত করবার জন্যে বাক্যালঙ্কার মাত্র। বাস্তবতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে, চরম দরিদ্র বা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্যে ভাঙাচোরা কিংবা মাঠের স্কুলের শিক্ষা গ্রহণও সম্ভব হয় না। দারিদ্র্য সীমার নিচে বাসরত শতকরা ৮৫ ভাগ পরিবারের মাসিক গড়পড়তা আয় ৩০০ টাকার নিচে।[৫] গ্রামে একজন শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা খরচ (বছর) হিসেবে করলে আমরা দেখি :

(তাকে ন্যূনতম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে)

খাদ্যের জন্যে দিনপ্রতি ৫ টাকা, বছরে ৫ × ৩৬৫ = ১৮২৫.০০ টাকা।

বছরের কাপড় সস্তা দু'টি লুঙ্গি বা প্যান্ট, দু'টি শার্ট, দু'টি গেঞ্জি, একজোড়া স্যান্ডেল = ৪০ + ৬০ + ২০ + ১০ = ১৩০.০০ টাকা।

খাতা, বই, পেনসিল = ১০০.০০ টাকা

বছরে মাথাপিছু খরচ দাঁড়ায় (১৮২৫ + ১৩০ + ১০০) = ২০৫৫.০০ টাকা।

এর সাথে আর একটি দিক বিবেচনা করতে হয় সেটি হচ্ছে, এই বয়সী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই কৃষকের বাড়িতে বছর চুক্তিতে কাজ করে। যেখানে তারা খাবার পায় এবং বছরে বর্তমানে গড়পড়তা ১০০ টাকা অর্থাৎ এখানে যে আয় করে তা বছরে খাওয়াসহ প্রায় ২০০০ টাকা। ছেলে বা মেয়ে যদি পড়াশুনা করে তবে এই আয় সে করবে না, বরঞ্চ তার পেছনে খরচ করতে হবে ২০৫৫ টাকা। অর্থাৎ

৫ গ্রামাঞ্চলে ১ জন দিনমজুর সর্বোচ্চ মজুরি পাচ্ছে সরকারি ন্যূনতম মজুরি সাড়ে ৩ সের চাল বা ২৬ টাকা। গড়পড়তা ৪ মাস বেকার থাকলে কর্মক্ষম মজুর সর্বোচ্চ শ্রম দিয়েও বছরে আয় করে ৩০×২০×৮=৪৮০০ টাকা। মাসিক গড়পড়তা আয় ৪০০ টাকা। শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে গড়পড়তা মজুরি হচ্ছে ৫৬০ টাকা। এরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচ্ছল অংশ!

মোট খরচ দাঁড়ায় ৪০৫৫ টাকা। অর্থাৎ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী একটি পরিবারের বার্ষিক যা আয় হয় তার পুরোটা কখনো কখনো তার বেশি একজন সন্তানের লেখাপড়ার জন্যে ব্যয় করতে হবে। এরকম অবস্থায় সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করতে গেলে স্কুল নির্মাণ আর অবৈতনিক শিক্ষার মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা ব্যয় যথেষ্ট নয়। গ্রামাঞ্চলের জনগণের আয় বৃদ্ধির জন্যে সরকারি ব্যয়ও শিক্ষা খাতে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। মজুরিতে শিক্ষা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। এর পূর্ব পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষার কথা অর্থহীন বাগাড়ম্বর হয়েই থাকে।[৬]

শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়হ্রাস : অন্তর্নিহিত উৎস

শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের নমুনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, কিছু বিশেষ অংশ যেমন—ক্যাডেট কলেজ মাদ্রাসা ছাড়া শিক্ষার সামগ্রিক বিকাশে বর্তমান শাসক শ্রেণীর কোন আগ্রহ নেই। এর কিছু বাস্তব কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে : কর্মসংস্থানের সমস্যা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে : এর বিকাশের সাথে শাসক শ্রেণীর স্বার্থের যোগহীনতা।

১০ বছর আগের একটি হিসাব বিবেচনা করতে পারি। এতে দেখানো হয়েছে শিক্ষিত জনশক্তির কত অংশ বিদ্যমান ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত বা অপ্রয়োজনীয়।

ছক-১৬

উদ্বৃত্ত শিক্ষিত জনশক্তি

ডিগ্রিপ্রাপ্তদের ধরন	কর্মসন্ধানীদের সংখ্যা	প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	উদ্বৃত্ত	কর্মসন্ধানীর মধ্যে উদ্বৃত্ত (শতকরা হার)
জেনারেলিস্ট	৯,৬০,৩৩০	৩,০৪,৬০৮	৬,৫৫,৭২২	৬৮
বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রিপ্রাপ্ত				
মানবিক	৬,৪৪১	৩,৯১৯	২,৫২২	৩৯
সমাজবিজ্ঞান	৭,৭০৩	৩,১৫৫	৪,৫৩৮	৫৯
অর্থনীতি	৬,৩৬০	৪,৪৫৯	১,৯০১	৩০

---

৬ শিক্ষা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে একজন শ্রমিক ক্ষেতমজুরের বাঁচার মতো মজুরি হওয়া উচিত প্রায় ২৫০০ টাকা। বর্তমান আয় ক্ষেত মজুরের ক্ষেত্রে এর ৬ ভাগের ১ ভাগ, শ্রমিকের ক্ষেত্রে ৪ ভাগের ১ ভাগ। দেখুন : মাহবুবুর রহমান : 'বাঁচার মতো মজুরি কী?' বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, ঢাকা, ১৯৮৫।

ডিগ্রিপ্রাপ্তদের ধরন	কর্মসন্ধানীদের সংখ্যা	প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	উদ্বৃত্ত	কর্মসন্ধানীর মধ্যে উদ্বৃত্ত (শতকরা হার)
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	৬,৪৯২	৬,০৯৬	৩৯৬	৬
অন্যান্য ডিগ্রিধারী	৬,২৭৫	৩,৮০১	১,৪৭৪	৩৯

সূত্র : পরিকল্পনা কমিশন, Employment Market for the Educated in Bangladesh, Dhaka, 1974.

উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠীর এই হার কমেনি বরং বেড়েছে। ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত সামগ্রিক কর্মসংস্থান হার শতকরা ৩৩ ভাগে স্থির হয়ে আছে। ১৯৭৪-এ বেকারত্বের হার ছিল শতকরা ৪৪ ভাগ, ১৯৭৮ সালে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৮ ভাগ।[৭]

অর্থাৎ শিক্ষিত ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা খুবই কম হারে বাড়ছে, কিন্তু তারপরও তাদের কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ বর্তমান অর্থনীতিতে নেই। বর্তমান শাসকশ্রেণীর কাছে বর্তমানের চাইতে অধিকতর সংখ্যক দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন নেই। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা তাদের জন্যে স্বস্তিকর। উদ্বৃত্ত জনশক্তির চাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার যে পথ ৭০ দশকের প্রথম থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক মনোযোগ এখন সেদিকেই। এটি হচ্ছে বিদেশে কর্মসংস্থান। ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪-এ বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে যথাক্রমে ৩০,০৭০; ৫৫,৭৮৭; ৬২,৮০৫; ৫৯,৩১৬ এবং ৫৬,৭৫৪ জনের।[৮] তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রতি বছর ৬০,০০০ জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের টার্গেট ধরা হয়েছে। এপথও যে ক্রমশ সংকটাকীর্ণ হচ্ছে তা সকলেই জানেন।

জনসংখ্যার হার অনুযায়ী এবং উন্নয়নশীল একটি দেশ হিসেবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, কারিগরি দক্ষ ব্যক্তিদের চাহিদা বাস্তব অনেক বেশি থাকলেও বর্তমান অর্থনীতিতে তাদের কর্মসংস্থানের কোন নিশ্চয়তা নেই। সে কারণে

৭ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮৫।
৮ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

ডিগ্রিপ্রাপ্তদের মধ্যে আছে অনিশ্চয়তা এবং এই শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারের মধ্যে আছে অনাগ্রহ।

এক হিসাবে দেখা যায়, সরকার কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিলেও যে কারিগরি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চালু আছে সেগুলোর ক্ষমতার অনেকখানি অব্যবহৃত থাকছে। এর কারণ কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের উচ্চহারে শিক্ষা ব্যয়।

ছক-১৭

অব্যবহৃত ক্ষমতার চিত্র

প্রতিষ্ঠানের নাম	আসনের তুলনায় ভর্তিকৃতদের শতকরা হার
ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	৫৬.১৪
টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	৬৪,৩৮
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	৬৮.৩৮
বাংলাদেশ গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস ইন্সটিটিউট	৬৫.০০
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৬৭.২৬

সূত্র : NERHRD : Techincal Education in Bangladesh : Capacity and Utilization, Dhaka, March, 1979.

পুঁজিবাদী উন্নয়নের গতির সাথে এই অবস্থা সংগতিপূর্ণ নয়। আমরা ইউরোপে এই উন্নয়নের শুরুতে দেখি, সেসব দেশে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক উচ্ছেদ, পুঁজির পুঞ্জীভবন এবং ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল, দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের জন্যে এক পর্যায়ে সর্বজনীন শিক্ষা ও শিক্ষার গুণগত বিকাশ ত্বরান্বিত করা হয়েছিল।

শিক্ষকদের প্রকৃত আয়

বাংলাদেশে আপেক্ষিক দারিদ্র্যে ব্যাপক জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সংকটের সাথে সাথে শিক্ষকরাও ক্রয়ক্ষমতা হারিয়েছেন এবং হারাচ্ছেন। নিচের ছকে তার চিত্র পাওয়া যাবে।

ছক-১৮

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রকৃত আয়

১৯৭০-৭১-৭২ এর মূল বেতন	১৯৮৫-র জীবনযাত্রার ব্যয় অনুযায়ী কত হওয়া উচিত (৭০-৭১ ১০০ ধরে)	নতুন বেতন স্কেল অনুযায়ী	১৯৭১-৭২ এর তুলনায় বর্তমান প্রকৃত আয় (%)
১. অধ্যাপক/ ১২০০	১২০০ × ৯.৩৯ = ১১,২৬৮	৬০০০.০০	৫০.২৪
২. সহযোগী অধ্যাপক/৮৭৫	৮৭৫ × ৯.৩৯ = ৮,২১৬.২৫	৪২০০.০০০	৫১.১১
৩. সহকারী অধ্যাপক/৬০০	৬০০ × ৯.৩৯ = ৫,৬৩৪	২৮০০.০০	৪৯.৬৯
৪. প্রভাষক/৪৫০	৪৫০ × ৯.৩৯ = ৪,২২৫.৫০	১৬৫০.০০	৩৯.০৪

শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষকেরা ১৫ বছরে তাদের প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা হারিয়েছেন শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ। নিম্নতর পর্যায়গুলোতে বিশেষ করে বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের জীবন মানবেতর। শিক্ষক সমাজের অধিকাংশ এখন বস্তুতপক্ষে মানসিক শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রধান স্থপতির অর্থনৈতিক অবস্থানের এই বিপর্যয় বর্তমান নিয়মে সামাজিক বিকাশের অসম্ভাব্যতাকেই পরিষ্কার করে তোলে। দেখা যায়, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মেধাবী ব্যক্তিরা বিদেশে পাড়ি জমান, ক্রমহ্রাসমান আয়কে ঠেকা দেবার জন্যে নিজের যোগ্যতার তুলনায় নিম্নপর্যায়ের কনসালট্যান্সিতে ব্যস্ত থাকেন, অনেকে শিক্ষকতা ছেড়ে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন, শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিকূল পরিবেশ পরবর্তী জেনারেশনকে শিক্ষা বিমুখ করে তোলে।

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান তাই বিপর্যস্ত। শিক্ষার বিপর্যয় থেকেই এ অবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। সন্দেহ নেই শিক্ষকতা একজন শিক্ষকের জন্য একইসাথে (১) জীবিকা এবং (২) স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের অবলম্বন। কিন্তু এই দু'ক্ষেত্রেই শিক্ষক সমাজ বর্তমানে পরাজিত, আহত। শিক্ষকরা তাদের জীবিকার জন্যে নিজেদের পেশাকে দৃঢ় অবলম্বন হিসেবে দেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাভাবে নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতানুযায়ী অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্য করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে যাদের তারা শিক্ষা দেবেন, তারাও সমাজের

গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে শিক্ষাকে গুরুত্বহীন ভাবছে। শিক্ষা যে নিশ্চিত জীবনের কোন অবলম্বন নয়, সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। সেজন্য এ ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই।

কাজেই অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে শিক্ষক সমাজের বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থার নিরসন, বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে শিক্ষার মুক্তিলাভের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। শিক্ষার কোন অংশকে আলাদাভাবে মুক্ত করা আর সম্ভব নয়, সমগ্র শিক্ষা অন্তর্নিহিত সূত্রে গ্রথিত।

উপসংহার

আমরা বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখি যে, দেশে যদি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হয়, তাহলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধিই এর জন্যে যথেষ্ট হবে না। প্রতিটি গ্রামে শুধু ভালো স্কুলভবন নির্মাণই এই সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসরত শতকরা ৮০টি পরিবার অপুষ্ট। দুর্বল শিশুরাও পারিবারিক আয়ের যোগানদার। শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে এসব পরিবারকে দু'দফা ব্যয় বহন করতে হয়, যা তাদের জন্যে অসম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের অপরিহার্য পূর্বশর্ত তাই ব্যাপক জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এমন পর্যায়ে বৃদ্ধি করা, যাতে তারা জীবন বাঁচিয়ে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পারে। অন্যান্য পর্যায়েও যথার্থ শিক্ষার প্রসারের জন্যে অভিভাবকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এই কাজ করতে গেলে ভূমি সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, শিল্পায়ন প্রয়োজন হয়। এগুলো সম্ভব হওয়া মানে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথ প্রশস্ত হওয়া। সেটি হলে কার্যকর শিক্ষা ও গবেষণার পথও প্রশস্ত হয়। স্থায়ী, স্থিতিশীল কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে শিক্ষকরা তখন নিজেদের মেধা অধিকতর কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় লুটেরা শাসক শ্রেণী এই পথে যাবে, শ্রেণীগতভাবে তাদের যে শক্তি আছে, এটা ভাবা অযৌক্তিক। একই কারণে এই অবস্থার নিরসনের জন্যে ছাত্র-শিক্ষকদের স্বার্থ শ্রমজীবী জনগণের সাথে একীভূত হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ। ২৭ জুলাই, ১৯৮৬।

শিক্ষা সংকট এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো যেভাবে তৈরি, তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সমাধান সম্ভব নয়। শিক্ষার স্বরূপ দেখার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করলে বোঝা যায়, সে শিক্ষা ব্যবস্থা যেন এক বিষচক্র–পরস্পরবিরোধী, বৈষম্যমূলক, দুর্নীতি ও অসংগতিতে পরিপূর্ণ। এই পরিবেশে তৈরি শিক্ষার্থীর মানসিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকশিত কিংবা পুনর্গঠিত হওয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসের ভালো ব্যবস্থা নেই, বই নেই, থাকার জায়গা নেই, ভালো খাওয়ার সুযোগ নেই। বর্তমান নিবন্ধে দেশের শিক্ষাসংকটের প্রকৃত রূপ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

গত কিছুদিনে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপর্যুপরি অনেকগুলো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে। শুধু গত কিছুদিন নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন-না-কোন কারণে অচলাবস্থা সৃষ্টি এখন প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অচলাবস্থা নৈরাজ্য বা সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো যেভাবে তৈরি হচ্ছে তাতে শিক্ষা বা শিক্ষার্থীদের পক্ষে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এসবের স্থায়ী সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মিলিতভাবে কোথাও কোথাও সেটাও পারছেন না।

প্রকৃতপক্ষে আকস্মিক উত্তেজনাকর কোন ঘটনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো কতটা কার্যকরভাবে সচল থাকতে পারছে, সেটাও প্রশ্ন। শিক্ষা এখনও জনগণের খুব ক্ষুদ্র অংশের সুযোগ মাত্র। এর পরও শিক্ষার যেখানে বিস্তার ঘটবার কথা সেখানে তা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে।

নৈরাজ্যিক ও লুটেরা সমাজ অর্থনীতিতে শিক্ষার কোন চাহিদা নেই। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সামনে তা শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে লুটেরা কার্যক্রমে অংশীদার হওয়ার জন্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত। অভিভাবকেরা অধিকতর ব্যয়ের ভারে ক্লান্ত কিংবা ন্যুব্জ। শিক্ষা শেষে ডিগ্রি নিয়েও চাকরির অভাব বা তার ওপর নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি তরুণ নিজের শিক্ষা জীবনের কার্যকারিতার ব্যাপারে

প্রশ্নমুখর। শিক্ষাঙ্গণে মুষ্টিমেয়র প্রতাপশালীদের দাপটের সামনে অসহায় ছাত্র-শিক্ষকেরা নীরব ক্ষোভে নিয়তির আশ্রয়প্রার্থী।

শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে?

বয়স্ক লোকজনেরা তাদের স্বভাবসুলভ নস্টালজিক ভঙ্গিতে আরো অনেক বিষয়ের সাথে এটাও বলে থাকেন যে, 'শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে।' সেই সাথে এও বলেন যে, 'আমরা সেকালে যা পড়েছি, আজকাল তার এক-শতাংশও পড়ানো হয় না।' আমরা প্রবীণদের বয়সের কথা বিবেচনা করে এই কথাগুলো সিরিয়াসলি নাও নিতে পারি। কিন্তু এই কথাগুলো সাধারণভাবে অন্যদের দ্বারাও এখন গৃহীত হচ্ছে। 'শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে', এটা এখন এক সাধারণ বক্তব্য। কিন্তু সাধারণ বক্তব্য হলেও এটি পুরো সত্য নয়।

বিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী বর্তমানে যত বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে, বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সাথে তৃতীয় বিশ্বের একজন ছাত্র হয়েও সে যতটুকু তাল মেলাতে চেষ্টা করে, সে যতটা মেধা ও শ্রম প্রয়োগ করে, সেটা ২০ বছর আগে কল্পনাতীত ছিল। সমাজবিজ্ঞান কিংবা মানবিক শাখার বিষয়গুলোতেও বর্তমানকালে যে অগ্রগতি হয়েছে তার সাথে এ বিষয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যূনতম একটা সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। জ্ঞানের সকল শাখাই ৪০/৫০ বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি বিকশিত এবং বিস্তৃত হয়েছে। ২০/৩০ বছর আগের তরুণও যে পর্যায়ে ছিলেন আজকের তরুণ তার চেয়ে অগ্রসর পর্যায়ে অবস্থান করতে বাধ্য। এমনকি ২০ বছর আগে স্কুলে আমাদের প্রজন্ম যে শিক্ষা লাভ করেছে আজকের প্রজন্ম তার চাইতে অনেক বিস্তৃত জ্ঞানচর্চার সুযোগের মুখোমুখি।

মুখোমুখি তবে সকলে এর অংশীদার নয়, এ কথা ঠিক। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সিংহভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রে অধিকাংশের কাছে শিক্ষার বিকশিত রূপ অপরিচিত কিংবা অগম্য। এই অপরিচিত বা অগম্য থাকার পেছনে কী কারণ? সাধারণভাবে বলা হয়, আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করতে চায় না, তাদের মন অন্যত্র। এটাই কি কারণ?

বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষা : স্বরূপ

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে বিষয়টি দেখতে হবে। প্রথমত, স্কুল পর্যায়। এখানেও সকল ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে অভিন্ন কথা বলা চলবে না। প্রথমে মোটাদাগে দু'টি ভাগ করা যায়। একটি ভাগে পড়বে সেসব ছাত্র-ছাত্রী, যাদের অভিভাবকরা সন্তানের শিক্ষার খরচ স্বচ্ছন্দে কিংবা কিছুটা কষ্ট করে হলেও দিতে সক্ষম; অন্য

ভাগে পড়বে সেসব ছাত্র-ছাত্রী যাদের অভিভাবকেরা সবসময়ই তার সন্তানকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করার কথা ভাবছেন। স্কুল পর্যায়ে বিশেষত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয়োক্তরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এই দুইভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা আবার তিন ধরনের স্কুলে অধ্যয়ন করে। এক ভাগে আছে কিন্ডারগার্টেন, রেসিডেন্সিয়াল ও ক্যাডেট কলেজ, দ্বিতীয় ভাগে আছে সরকারি স্কুলসমূহ, তৃতীয় ভাগে আছে বেসরকারি সাধারণ স্কুলসমূহ।

প্রথম ভাগের স্কুলগুলোতে ভিন্ন বা অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি, শিক্ষা বহির্ভূত প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের ব্যবস্থা, বই সাময়িকী পত্র-পত্রিকা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপারে সহজলভ্যতা, উচ্চ বেতন নিশ্চিত করবার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বেশি শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাদান ইত্যাদি সম্ভব হয়। কিন্ডারগার্টেন ও রেসিডেন্সিয়াল স্কুলগুলো বেসরকারি এবং সেখানে উচ্চ বেতনের মাধ্যমে এসব সুবিধা ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ বেতনের মাধ্যমেই এখানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকে। অন্যদিকে, সপ্তম শ্রেণী থেকে ক্যাডেট কলেজে এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা সরকারি ব্যয়েই নির্বাহ করা হয়। ক্যাডেট কলেজ মূলত সামরিক খাতেরই অংশ। এখানে বেতন খুব উচ্চ নয়, তবে সামরিক খাতের অংশ হিসেবে সরকারি বিপুল ব্যয়ে এখানে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিকল্পিতভাবে ভিন্ন মেজাজে গড়ে তোলা হয়।

আর এক ধরনের শিক্ষা বাংলাদেশে এখন বেশ অগ্রাধিকার পাচ্ছে, সেটি হলো ধর্মীয় শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এর দৃষ্টান্ত। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৭২ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ১.৪৩, ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ৭.১৪, পাশাপাশি ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৮৩-৮৪ সময়কালে মাদ্রাসা সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২০.০৩।

মাদ্রাসার এই সংখ্যা বৃদ্ধি এই খাতের প্রতি সরকারি অগ্রাধিকারের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তার নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা দ্রুত গঠন ও অন্যান্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অধিকতর ব্যয়বহুল এই প্রতিষ্ঠানও সরকারি নীতি অনুযায়ীই হয়েছে। তবে এ খাতের বিকাশের পেছনে নীতিনির্ধারকদের ধর্মের প্রতি আনুগত্য আদৌ কোন কারণ কি না তাতে সন্দেহ প্রকাশ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। কেননা ধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে এই খাতের বিকাশ ও বিস্তার ঘটলে নীতিনির্ধারকদের সন্তানদের এসব প্রতিষ্ঠানে পড়তে দেখা যেত। কিন্তু তাদের সন্তানদের দেশি-বিদেশি কিন্ডারগার্টেন, রেসিডেন্সিয়াল, মডেল স্কুল, ক্যাডেট কলেজ অথবা বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে দেখা যায়। সরকারি হিসাব থেকে আমরা দেখি, একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর মাথাপিছু ব্যয় হচ্ছে ২২০ টাকা, মাধ্যমিক স্কুলে এই

ব্যয় হচ্ছে ৪০০ টাকা, কলেজে মাথাপিছু ব্যয় হচ্ছে ১০০০ টাকা, আর ক্যাডেট কলেজে মাথাপিছু ব্যয় হচ্ছে ২০,০০০ টাকা।

সরকারি খাতেই ব্যয়ের এই বিরাট বৈষম্য থেকে বোঝা যায়, ক্যাডেট কলেজ বাদে সরকারি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কী অবস্থা। সরকারি স্কুল বা কলেজগুলোতে (একেবারে হাতেগোনা কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে) শিক্ষার ব্যবস্থা যে নিছক রুটিনে পরিণত হয়েছে, সেটা বোধকরি সবাই স্বীকার করবেন। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নীতকরণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, উদ্যোগ কিংবা আর্থিক আনুকূল্য নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারি কম অগ্রাধিকারের কারণে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য থাকে।

বাংলাদেশে অধিকাংশ স্কুল বা কলেজ বেসরকারি। বেসরকারি পর্যায়ে ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানসমূহ বাদ দিয়ে আমরা যেসব বেসরকারি স্কুল বা কলেজ দেখি সেগুলোর সিংহভাগকে আদৌ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা কষ্টকর। এসব প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের টাকা এবং সরকারি কিছু অনুদানের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি, তবে সাধারণভাবে তা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উঁচু রাখা সম্ভব নয়। উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান কিছু ব্যক্তির মুনাফা অর্জনের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার কারণে শিক্ষা প্রদানের চাইতে বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নিশ্চিতকরণই এখানে লক্ষ্য থাকে।

বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার জন্যে এসব প্রতিষ্ঠানের কারণে উন্নত শিক্ষা পদ্ধতিকে আকর্ষণবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা বস্তুগত কারণেই সম্ভব নয়। বিপরীত দিকে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের নিশ্চয়তা প্রদানের ভিত্তিতে বহু প্রতিষ্ঠান বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করে। নকল বা প্রশ্নপত্র ফাঁস অথবা নোটভিত্তিক পড়াশুনাই হয় এসব প্রতিষ্ঠানের খ্যাতির ভিত্তি। সে 'খ্যাতি' সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং গৃহীত হওয়ার কারণে আমরা দেখি বহু অভিভাবকই নিজের সন্তানকে এসব প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার আগে আগে দু'বছরের বেতন দিয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। ছাত্র-ছাত্রী নিজের অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ অনুমোদন নিয়ে, শিক্ষকদের সহযোগিতায় নগদ অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয় ডিগ্রি। ডিগ্রি কেনা ছাড়া উপায়ও থাকে না। কেননা এর আগে যেসব স্কুল সে অতিক্রম করে এসেছে এবং যে শিক্ষা সে অর্জন করেছে, তাতে তার পক্ষে এর অন্যথা করার উপায় নেই। এর অন্যথা করার প্রয়োজনীয়তাও সে অনুভব করে না।

যে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া শিক্ষাকে দখল করেছে, সে প্রক্রিয়ায় নিজের ভবিষ্যৎ জীবিকা নিশ্চিত করার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন নেই। তবে ডিগ্রির হয়তো প্রয়োজন আছে। ডিগ্রি কিনে নেয়ার জন্যে তাই একদিকে যেমন চাহিদা আছে, তেমনি অন্যদিকে এর যোগান দেয়ার জন্যে গড়ে উঠেছে ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এসব প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষকতা করেন তাদের সকলে এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন, সেটা বলা যাবে না। তবে কর্মসংস্থানের সামগ্রিক সংকটের মুখে খুব কম ব্যক্তিই এই অবস্থার প্রতিবাদে এসব প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন।

এ যেন এক বিষচক্র। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম যে ব্যবস্থাদি দরকার, তা নেই। একই ঘরে একই সাথে একাধিক শ্রেণীর ক্লাস হচ্ছে, অথবা গাছতলায় ক্লাস হচ্ছে। যারা যথার্থই শিক্ষাদানের ক্ষমতা রাখেন তেমন মেধাবী ও আগ্রহী ব্যক্তিরা ক্রমহ্রাসমান প্রকৃত বেতনের কারণে শিক্ষকতা পেশায় আসতে আগ্রহী নন। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা অন্য পেশায় যেতে পারেন নি, কিংবা কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউশনি অথবা অন্যভাবে উচ্চ আয় নিশ্চিত করতে পেরেছেন, তারাই এ শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নিয়েছেন।

এটি হচ্ছে একদিক। অন্যদিকে, উন্নত শিক্ষা ক্রয় করার ব্যবস্থা ইতোমধ্যে এই সমাজে হয়েছে, কিন্তু তা ক্রয় করার সামর্থ্য শতকরা ৫ জনের বাইরে কারও নেই বলে বাকি সকলকে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই যেতে হয়। এই যাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে মেধার উন্মোচন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার সামনে দৃষ্টান্ত থাকে। দৃষ্টান্ত থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, দৃষ্টান্ত থাকে সমাজে। তাকেই অনুসরণ করে সে ডিগ্রি অর্জন করে। এর মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ নিজের বা অভিভাবকের প্রচেষ্টায় সততার সাথে বেড়ে ওঠে। কিন্তু তাদের এ কষ্টসাধ্য বেড়ে ওঠার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব। প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এর প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা যে শিক্ষার মান নিজেরা অর্জন করে, তা মোটেই কম নয়।

অন্যদিকে, এই প্রতিকূল প্রক্রিয়ার অংশীদার হয়ে অন্য একজন যখন ডিগ্রি অর্জন করে তখন তার চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে নানা অসংগতি সৃষ্টি হয়। তার দায়-দায়িত্ব কে নেবে? তার মধ্যে কি শিক্ষার প্রতি, শিক্ষকের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ থাকা সম্ভব?

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

এই পরস্পরবিরোধী, বৈষম্যমূলক, দুর্নীতি ও অসংগতিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার পটভূমির মধ্যে বেড়ে ওঠা ছাত্র-ছাত্রীদের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। একটি বড় অংশ স্রেফ অর্থনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার আশা ছেড়ে দেয়। একটি অংশ প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত যারা ভর্তি হতে পারে, তাদের ভর্তি হওয়াটাও অনেক ক্ষেত্রে সুযোগের ওপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক কিংবা অন্য কোন কারণে যারা ভর্তি হতে পারে না, তারা ভর্তিকৃত সকল ছাত্র-ছাত্রী থেকে মেধায় নিম্নমানের, সেটা বলা যাবে না।

পেছনে ফেলে আসা শিক্ষা, শিক্ষক এবং সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় একজন তরুণের মানসিক গড়ন যেভাবে পড়ে ওঠে, সেটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশে বিকশিত হয় কিংবা পুনর্গঠিত হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ১টি বিশ্ববিদ্যালয়ই কেবল তার সকল প্রস্তুতি নিয়েই কাজ শুরু করেছে। ওআইসির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে খুব দ্রুত এর ব্যয়বহুল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন—হল সমস্যা, ক্লাসরুম সমস্যা, নিম্নমানের খাওয়ার সমস্যা, লাইব্রেরির সমস্যা ইত্যাদির মুখোমুখি এটি হচ্ছে না। অন্যান্য সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব সমস্যা প্রকটভাবে রয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বার বার উপরোক্ত সমস্যাগুলো দ্বারাই বিঘ্নিত হয়।

যেসব ঘটনা কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেগুলো অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর মধ্যে এক ধরনের কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব সমস্যাসমূহের সাথে সম্পর্কিত, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক মতবিরোধের সাথে সম্পর্কিত, তৃতীয় কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত এবং চতুর্থ কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে বিভিন্ন রকম অবৈধ সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত।

প্রথমোক্ত সমস্যাগুলো সরাসরি শিক্ষাসমস্যা সৃষ্টির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রী সাধারণভাবে পড়াশুনায় আগ্রহী হলেও, তাদেরকে পড়াশুনার ব্যাপারে অনাগ্রাহী করে তোলার জন্যে এসব সমস্যাগুলো যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সাধারণ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

হলের একটি রুমে ৪ জনের থাকার কথা, সেখানে সে অনুযায়ী স্থান এবং আসবাবপত্র আছে। কিন্তু ৪ জনের একটি রুমে যদি ১৬ জন থাকে তা হলে সেখানে বসবাসরত ছাত্রের পক্ষে পড়াশুনা লাটে ওঠানো ছাড়া কী করার থাকে? আর এই সিট সংকটকে কেন্দ্র করেই সংঘাত-সংঘর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেয়।

বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনেক বেশি। তার ওপরে ক্লাসরুমের অভাব, শিক্ষকের অভাব, ক্যাম্পাসের স্থান সংকীর্ণতা ইত্যাদি কারণে প্রচুর ভিড় হৈ চৈর মধ্যে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটি ক্লাসরুমে যদি ২৫০/৩০০ ছাত্র-ছাত্রী বসে এবং তার পাশে যদি ব্যস্ত করিডোর থাকে, সেখানে মাইক ছাড়া একজন শিক্ষকের পক্ষে অসহায় হওয়া ছাড়া উপায় কী? ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেই সেখানে কী করার থাকে?

ডাইনিং হলে ভর্তুকি দেয়ার কোন তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। যদিও সরকারের অনেক খাতে বিপুল ভর্তুকি এসব ক্ষেত্রে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে

অন্যান্য তহবিল থেকে কিছু কিছু অংশ ডাইনিং হলে দেয়া হয়। এরপরও যে খাওয়া সেখানে দেয়া সম্ভব হয় তা খেয়ে একজন মানুষের পক্ষে সুস্থ থাকা খুবই কঠিন।

শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে গেলে যে বিষয়ে পড়াবেন সে বিষয়ে অন্ততপক্ষে প্রয়োজনীয় বইপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নালের রেফারেন্স দেবেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বই পত্র থাকে না। এর ফলে শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী উভয়কেই অভিন্ন সংকটে পড়তে হয়।

তার মানে যেখানে ক্লাস করতে হবে সেখানে ক্লাস করার উপায় নেই, যেখান থেকে বই নিতে হবে সেখানে বই নেই, যেখানে থাকার স্থান সেখানে পড়ার পরিবেশ নেই, যা খাওয়ানো হয় তা খাওয়ার অবস্থা নেই– এরকম পরিস্থিতিতে কীভাবে শিক্ষা গ্রহণের স্বাভাবিক পরিবেশ থাকবে? ছাত্ররা যদি এ নিয়ে কোন আন্দোলন না করে তা হলেও কি বলা যাবে যে স্বাভাবিক পরিবেশ রয়েছে?

অর্থাৎ বর্তমানে একজন ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা ভালোভাবে করতে গেলে তাকে ১. হলের বাইরে পড়াশুনার পরিবেশ রক্ষিত হয়, এরকম স্থানে থাকতে হবে। ২. ডাইনিং হলের বাইরে খেতে হবে। ৩. বইপত্র কিনতে হবে, নইলে বিভিন্ন লাইব্রেরি খুঁজতে হবে, ফটোকপি করতে হবে। ৪. ক্লাসের বাইরে সাহায্য করার মতো শিক্ষক খুঁজতে হবে। এ কাজগুলো করতে গেলে একজন ছাত্র-ছাত্রীকে মাসে কমপক্ষে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা খরচ করতে হবে। উপরের কাজগুলো না করলেও তাকে মাসে প্রায় ৭/৮০০ টাকা খরচ করতে হয়। কোন রকম জরিপ না করেই বলা সম্ভব যে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে তাদের শতকরা ৯০ জনের পক্ষে ওপরের খরচ বহন করা অসম্ভব। অনেক ছাত্র টিউশনি বা পার্টটাইম চাকরি করেই শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করে এবং পরিবারকেও কিছু দিতে হয়। এসবের ফল যা দাঁড়ায় তা নিয়ে অনেকে হাহুতাশ করেন এবং পাইকারিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের দোষারোপ করেন, কিন্তু মূল কারণ তলিয়ে দেখা হয় না।

শিক্ষাখাতকে একটা উৎপাদনশীল খাত হিসেবে দেখা এবং এখাতে ব্যয়কে একটি উৎপাদনশীল ব্যয় হিসেবে দেখা বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনীতিরও একটি বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের লুটেরা অর্থনীতি যেভাবে অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে অর্থব্যয়কে অপচয় মনে করে তেমনি শিক্ষাখাতে অর্থব্যয়কেও অপচয় হিসেবেই ধরে থাকে। সে কারণে ঘোষিত ব্যয়বরাদ্দও এখানে কার্যকর হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় যৌথভাবে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৫৪.০১ কোটি টাকা, কিন্তু বাস্তবত এ খাতে ব্যয় হয়েছে ২৫৮.৮৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রকৃত ব্যয়বরাদ্দ টাকার অঙ্কে প্রায় অর্ধেকে (৫৭.০১%) নেমে এসেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই খাতে মোট

বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৭০৭ কোটি টাকা, কিন্তু টাকার অঙ্কে প্রকৃত ব্যয় দাঁড়ায় ৫০৯.৫১ কোটি টাকা বা শতকরা ৭২ ভাগ। প্রকৃত মূল্যে এই বরাদ্দ আরও কমেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ১৩৩টি নতুন প্রকল্প সমাপ্ত করার কথা ছিল, কিন্তু এর মধ্যে শুধু ৮৮টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। এই সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর অধিকাংশই আবার প্রথম ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্প। মোট ৮৮টির মধ্যে ৫২টি আগের পরিকল্পনা থেকে এসেছে এবং মাত্র ৩৬টি এই পরিকল্পনাকালে গৃহীত প্রকল্প। মোট বরাদ্দের মধ্যে মোট ১২০ কোটি টাকা পুরনো অসমাপ্ত প্রকল্পের জন্যে খরচ করা হয়।

শিক্ষাখাতে প্রকৃত ব্যয় হ্রাস কোন খামখেয়ালির ফসল নয় এবং এটি বিভিন্ন সরকারের দিক থেকে অভিন্ন কার্যক্রম হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তার মানে এটি শুধু সরকারের নীতি নয়, সামগ্রিক শাসক-শোষক শ্রেণীরই নীতি।

শাসকশ্রেণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়কে সমস্যা সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখে দু' দিক থেকে। প্রথমত এই প্রতিষ্ঠানসমূহে সমবেত তরুণ সমাজ সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা নিলে তা স্থিতাবস্থাকে আঘাত করবেই। দ্বিতীয়ত, এখান থেকে উত্তীর্ণ হলেই এরা নতুন কর্মসন্ধানী হয়ে কাজের জন্যে চাপ সৃষ্টি করবে। সেকারণে এখানে একটা জটিল ও নিরুৎসাহী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের জন্য বরং সুবিধাজনক।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে যেমন গড়ে তোলা হয়েছে ব্যবসায়িক উচ্চ ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়কে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়ে ব্যয়বহুল, কতিপয়ের জন্যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিরুদ্ধ কার্যক্রম

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে তার মূল শিক্ষাখাতে ব্যয়হ্রাসের সরকারি নীতির মধ্যে নিহিত। কিন্তু এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিরোধী অবস্থার শেষ নয়। শেষ নয় বলে আমরা দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এমন কিছু ঘটছে যা বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এই ঘটনাগুলোর ধরন এখানে উল্লেখ করা যায় : ১. ভর্তি নিয়ে দুর্নীতি বা অনিয়ম ২. পরীক্ষায় দুর্নীতি বা অনিয়ম ৩. শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ৪. বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ কাজ বা পণ্যদ্রব্য সাপ্লাই নিয়ে দুর্নীতি ও সংঘাত ৫. ছাত্র কিংবা শিক্ষকদের ওপর সন্ত্রাস ৬. সিট বিতরণে অনিয়ম ইত্যাদি।

এই ঘটনাগুলোর অধিকাংশের মধ্যে যদিওবা কিছু ছাত্র জড়িত থাকে তবে তাদের সংখ্যা শতকরা ১ জনও নয়। 'ছাত্ররা' এই সব ব্যাপারে কেন জড়িত হয়?

তাদের জড়িত হওয়া এবং এর পেছনে প্রাপ্ত শক্তির উৎস বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর নয়, প্রধানত বাইরে। বস্তুত এদের জীবনযাপন, মনোযোগ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ ইত্যাদি লক্ষ্য করলে এদের ছাত্র বলা যাবে না। শিক্ষা এমনকি ডিগ্রিও এদের ভবিষ্যৎ জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কহীন। কোন ডিগ্রি না পেলেও সর্বোচ্চ মেধার ছাত্রের চাইতে সচ্ছল জীবনযাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় গ্রাউন্ড ওয়ার্ক তারা ছাত্র-জীবনেই করে ফেলে। এই গ্রাউন্ড ওয়ার্কের মধ্যেই পড়ে উপরোক্ত কার্যাবলি।

এদের জন্ম, অস্তিত্ব ও বিকাশ অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই। এরা একজন দু'জন নয়, ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সেজন্যে সরকার পরিবর্তনের পরও এরকম গোষ্ঠী ঠিকই টিকে থাকে। বিভিন্ন নামে। স্থানীয় ও জাতীয়, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবেই এরা কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও তাদের মিত্র থাকে। মিত্র থাকে প্রশাসনে। শিক্ষকদের মধ্যেও কেউ থাকে না, এটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। কিন্তু সেই 'শিক্ষকরা'ও ঐ ছাত্রদের মতোই মূলত 'শিক্ষক' নন। এই ছাত্র এবং শিক্ষক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র এবং শিক্ষকের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। 'ছাত্র' ক'জন প্রকাশ্যে; শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেছনে।

যেসব ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক চরিত্র ক্ষুণ্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে আহত করে, শিক্ষকদের অথর্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং শিক্ষকদের ওপর ছাত্রদের আস্থা বিনষ্ট করে, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটা যৌক্তিক নয়। এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রধানত পরিচালনা করেন শিক্ষকেরা এবং বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা বিরোধী এসব কার্যক্রমের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না, বরং দেখা যায় প্রশাসন তাদের তোয়াজ করছে, তাদের অবৈধ সুযোগ-সুবিধা বন্টন করছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের স্বাভাবিক অধিকার ও শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে। এটা কেন হয়?

বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি বিচার করতে হবে। ৬০ দশকে বিশ্ববিদ্যালয় যে আইন দ্বারা পরিচালিত হতো সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ব্যক্তি উপাচার্য, আচার্য অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হতেন। উপাচার্য আবার বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি ও ডিনদেরকে সরাসরি নিযুক্তি দিতেন। সিলেবাস প্রণয়ন, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের স্বাধীনতা ছিল সীমিত। বস্তুত শিক্ষকদের অবস্থা ছিল অনেকটা

কর্মচারীর মতো। এই অবস্থা থাকার কারণে একদিকে যেমন সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রবল, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় গুটিকয় ব্যক্তির হাতের মুঠোয় ছিল। গণতান্ত্রিক মতামত প্রকাশ ও তাকে নির্ধারক অবস্থায় নিয়ে যাবার সুযোগ একেবারেই ছিল না। দীর্ঘদিনের শিক্ষা-আন্দোলন, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩ এই পরিস্থিতির অবসান ঘটায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি করে।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবে, সিনেট উপাচার্য নির্বাচন করবে এবং শিক্ষা পর্ষদ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উপরের তিনটি প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন। ডিনগণ নির্বাচিত হবেন এবং বিভাগীয় সভাপতিরা বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে থেকে (সহকারী অধ্যাপক পর্যন্ত) একের পর এক দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই ব্যবস্থার অগ্রসর দিকটি হচ্ছে এতে আমলাতান্ত্রিকতার সুযোগ কমে যায়। নির্বাচন যেহেতু একমাত্র উপায়, সেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সকল শিক্ষকের কাছে দায়ী থাকতে হয়। ৬০ দশকের মতো কিছু ব্যক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে না।

কিন্তু আইনগত ফাঁক-ফোকরের কারণে এর মধ্যেও অগণতান্ত্রিক উপাদান থেকে যায় এবং তাকে আশ্রয় করেই জন্ম নেয় নানারকম অবাঞ্ছিত ঘটনা। সিনেট উপাচার্য নির্বাচন করে ঠিকই, কিন্তু সিনেটে মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি থাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ। এখানে সরকারের প্রত্যক্ষ মনোনীত এবং নিয়ন্ত্রিত সদস্য থাকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। সেজন্যে উপাচার্য নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ছাড়াও অন্যদের ভূমিকার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে। সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে, কিন্তু সেখানে শিক্ষক প্রতিনিধি হচ্ছেন সংখ্যালঘিষ্ঠ। সেকারণে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারি প্রতিনিধিদের ভূমিকাই অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা পর্ষদেও প্রভাব থাকে।

সিনেট তিন জনের একটি উপাচার্য প্যানেল তৈরি করে। কিন্তু কে উপাচার্য হবেন, সেটা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করেন আচার্য বা রাষ্ট্রপতি। এর ফলে ভোটারদের অগ্রাধিকার সেখানে অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না। সরকারের গ্রহণযোগ্যতা সেখানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করার জন্যে একজন উপাচার্য প্রার্থীকে নিজেকে যে ভূমিকায় স্থাপন করতে হয়, সেটা সংগত কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিকাশের পক্ষে যায় না। ৬০ দশকের মতো সকল পর্যায়ে না হলেও এখানেও চূড়ান্ত পর্যায়ে সরকারের প্রতি আনুগত্য, তার

স্বার্থ প্রভাব রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধতার মাধ্যমেই একজন উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন।

এরপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার, তার সামগ্রিক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে রাখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। অ্যাক্টে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়কারী হিসেবে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এখন এই কমিশন সরকারের সম্প্রসারিত হস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংকোচন, তার পরিকল্পনায় বাধা প্রদান, নতুন বিভাগ বা হল নির্মাণে বাধা প্রদান, নানা প্রকার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি ইত্যাদিই এখন মঞ্জুরি কমিশনের প্রধান ভূমিকা।

অর্থাৎ সবগুলো দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকেরাই সেটি পরিচালনা করছেন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে সব সিদ্ধান্ত প্রণীত হচ্ছে–বাস্তবত এর কোনটাই পুরোপুরি ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মূলত সরকারি নীতিকেই বাস্তবায়িত করেন, বিভিন্ন ফোরামে নির্বাচিত লঘিষ্ঠসংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধিরা তার অংশীদার বা নির্বাক দর্শক থাকেন মাত্র। যেখানে তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেন, সেগুলো গৌণ বিষয়।

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ এবং বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এক ধরনের চাপ অব্যাহতভাবে জারি রাখা হয়। যদি অর্থ মঞ্জুর করা হয় সুইমিং পুলের জন্যে, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রতিষ্ঠানের কোন অধিকার নেই সে অর্থকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হল নির্মাণ বা ক্লাস রুম নির্মাণের জন্য খরচ করার। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব সমস্যা স্থায়ী সমস্যা হিসেবে শিক্ষা বিরোধী ভূমিকা পালন করছে সেগুলো দূর করার ব্যাপারে মঞ্জুরি কমিশনকে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না, বরং এগুলোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বাজেট কাঁটছাঁট তাদের উৎসাহ বেশি দেখা যায়। এর কারণ সহজেই বোধগম্য।

যে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট এখনো প্রচলিত হয়নি সেখানে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল, নৈরাজ্যিক এবং হতাশাব্যঞ্জক।

দু'টি পথ

সবকিছু মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষত উপাচার্যের সামনে দু'টি পথ খোলা থাকে। একটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্যে দৃঢ় স্বাধীন ভূমিকা নেয়া, যে ভূমিকা নিতে গেলে তাকে অতি

অপরিহার্যভাবে সরকারি নীতির সাথে সংঘাতে যেতে হবে। তার পক্ষে আরোপিত নানা প্রকার বিধি-নিষেধ ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সরকারি নীতির সাথে একাত্ম হয়ে সরকারি লিখিত অলিখিত নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। সরকারি নীতি বাস্তবায়নের সক্রিয় অংশীদার হয়ে পরবর্তী উপাচার্য পদটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা।

প্রথম ভূমিকা গত ১৪ বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব কমই দেখা গেছে। প্রথম ভূমিকা নিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের দুষ্টচক্রের সাথে যেমন সংঘাতে নামতে হয়, তেমনি পরবর্তী সময়ে উপাচার্য প্যানেলে নির্বাচিত হলেও এ পদে নিযুক্তি পাবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। এই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এমন জনের সাক্ষাৎ আমরা খুবই কম পেয়েছি। সে কারণে দ্বিতীয় ভূমিকাই এখন প্রধান বলে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ভূমিকার আধিপত্যের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা, পরিচালনা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রায় ৬০ দশকের মতোই এক ধরনের নতজানু অবস্থা দেখা যায়। এই নতজানু অবস্থার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও মদদ বা প্রশ্রয় দিতে হয় এমন কিছু শক্তিকে যারা শিক্ষার সপক্ষ শক্তি নয়, ক্ষমতার সপক্ষ শক্তি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোৎকৃষ্ট মেধার অধিকারী যারা, তারাই সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পান। তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ৭১-এর পূর্বে এবং পরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ শোনা যায়। এভাবে যারা নিয়োগ পান তাদের ভূমিকা যে শিক্ষকসুলভ হবে না, সেটা বলাই বাহুল্য। এদের ভূমিকা অনেক সময় সমগ্র শিক্ষক সমাজকে বিব্রত ও লজ্জিত করে।

শিক্ষকদের অনেক সময় সমরূপ একক সত্তা হিসেবে দেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে কোন উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় এক দু'জন শিক্ষকের কোন অপকর্মকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ধারণার ওপর আক্রমণ চালানো হয়।

যারা আজ শিক্ষক তারা কেউ কিছুদিন আগে, কেউ বেশ কয়েক বছর আগে ছাত্র ছিলেন। ছাত্র থাকাকালে পারিবারিক, সামাজিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রভাবের মিথস্ক্রিয়ায় তারা ভিন্ন ভিন্ন মানসিক গড়ন লাভ করেছেন। সে কারণে শিক্ষক হলেও তাদের সকলের চিন্তা-চেতনা মূল্যবোধ আশা-আকাঙ্ক্ষা

এক হওয়ার কথা নয়। এদের মধ্যে শিক্ষকতার বোধ আশা করলেও একই সমাজবোধ আশা করা অযৌক্তিক। সমাজবোধের ভিন্নতার কারণে কোন শিক্ষক প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানে যদি নিজেকে স্থাপন করেন, সেটা বিস্ময়কর মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। এসব কারণে শিক্ষকদের মধ্যে মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক। মতবিরোধ থেকে বিভিন্ন দল বা গ্রুপের উৎপত্তি হতে পারে। এ নিয়ে অনেকে আপত্তি করেন। ভালো মানুষি প্রত্যাশা থেকে প্রশ্ন তোলেন শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি কেন? এটাও যৌক্তিক প্রশ্ন নয়। তবে যদি প্রশ্ন ওঠে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি বর্তমানে যেরূপ নিয়ে বিদ্যমান সেটা কোন পরিপক্কতার লক্ষণ কি না তাহলে সে প্রশ্ন অবশ্যই যৌক্তিক।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে যে গ্রুপ বিভক্তি আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কোন আদর্শগত ভিত্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে টার্গেট করেই এই বিভক্তি হয়। সেকারণে রাজনৈতিক বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্যসূত্র অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্য ব্যাপার হয় না। প্রশাসনে আসীন ও তার বিরোধী প্রভাবেই শিক্ষকদের বিভক্তি থাকে। শিক্ষকদের পদোন্নতি বিভিন্ন সুবিধা ইত্যাদি কেন্দ্র করে বিরোধও হয়। এগুলো সৃষ্টি করে কিছু তিক্ত ঘটনা ঘটে যা শিক্ষক হিসেবে সচেতন যে কারও পক্ষে লজ্জার কারণ।

কেন ঘটনাগুলো ঘটে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব নিয়ে কোন অনিয়ম খামখেয়ালিপনা দীর্ঘসূত্রিতা থাকার কথা নয়, তবু কেন ঘটে? এই ঘটনার জন্যে 'অমুক ব্যক্তি দায়ী' বলাটা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। এই ঘটনার জন্যে কিছু শর্ত স্থায়ীভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বজায় রাখা হয়েছে। শর্তগুলো এমন যাতে করে কিছু ব্যক্তির হাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। এই কিছু ব্যক্তি হয়ত স্থায়ী নন, কিন্তু প্রক্রিয়াটা স্থায়ী।

দেশের ছ'টি বিশ্বদ্যিালয়েই শিক্ষকদের বেতন স্কেল সরকারি অন্যান্য বেতন স্কেলের অনুরূপ। গত ১৫ বছরে অধ্যাপক থেকে শুরু করে প্রভাষক পর্যন্ত সকলের গড়পড়তা প্রকৃত আয় এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩০ থেকে ৪০-এ। শিক্ষকেরা প্রকৃতপক্ষে এখন মানসিক শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে যারা শুধু শিক্ষকতা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের পক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে সবসময় পীড়িত ও অস্থির থাকা স্বাভাবিক। দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের সংখ্যাই গরিষ্ঠ। কিছু শিক্ষক আছেন যারা পারিবারিক সূত্রে বা কনসালট্যান্সির মাধ্যমে বা অন্যান্য কোন খণ্ডকালীন কাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে সচ্ছল করেছেন তাদের সংখ্যা খুবই কম।

এই অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষক তাদের শিক্ষকতার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখা যায় যে পেশাগত জটিলতা বা ঝামেলা থেকে মুক্তভাবে শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। পদে পদে তাদেরকে নানা রকম প্রতিকূলতার কিংবা অসম্মানজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

তার বেতন বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা বা পদোন্নতিও সহজ স্বাভাবিক নিয়মে হয় না। স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি পদে শিক্ষকের নিয়োগ, সম্পূর্ণ নতুন প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে মেধা গবেষণা ও প্রকাশনার ভিত্তিতে আপগ্রেডিং বা উচ্চতর পদে নিয়োগ হওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে অনুমোদিত নীতিমালা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এমন থাকে যে, অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা বা মেধা থাকলেও একজন শিক্ষককে বিভাগীয় সভাপতি বা উপাচার্য বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক জাল ও হায়ারার্কির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকতে হয়। এই নির্ভরশীলতা দূর করে যথাযথ যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি ঘটার মতো নীতিমালা প্রণয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার কাঠামোও বাধাদান করে, নির্ভরশীল শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। এই নির্ভরশীলতা একজন শিক্ষককে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশীদার হতে বাধা দেয়। তার স্বাধীন মতামত ও ভূমিকা গ্রহণেও বাধাগ্রস্ত করে। তাই একজন শিক্ষকের কাছ থেকে স্বাধীন ও দৃঢ় ভূমিকা প্রত্যাশিত হলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে এখনও সুলভ নয়।

শিক্ষকের নানা অসম্মানজনক ঘটনার এখানেই শেষ নয়। দেখা যায় তিনি একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও আইনগত জটিলতায় তিনি অসহায় বোধ করেন, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রবল প্রতাপেই চলতে থাকে।

সমাজে সন্ত্রাস, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ব্যাপারে এখন যথেষ্ট প্রচার আছে। এটা চোখেও পড়ে বেশি। কিন্তু এই সন্ত্রাস কি বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা?

লুটপাট, শোষণ, নির্যাতন বর্তমান সমাজের প্রধান চরিত্র। এই লুটেরা কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ নিয়োজিত, তারা নিজেদের এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। তৈরি করতে হয় মাস্তান বাহিনী। যারা ছিটেফোঁটা ভাগ নিয়ে এই শ্রেণীর সামগ্রিক কার্যক্রমকে চালু রাখে। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধকে গুড়িয়ে দেয়ার জন্যে সশস্ত্র সন্ত্রাস যেখানে রাষ্ট্রীয় নীতি, তখন তার আশ্রয়ে স্থানিক সন্ত্রাস সেখানে একইভাবে ডালপালা বিস্তার করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সামগ্রিক সন্ত্রাসমূলক সমাজচরিত্রের খণ্ডিত অংশই দেখা যায়। সন্ত্রাসে যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাদের সংখ্যা খুব কম। শুধু এখন নয় ৬০ দশক থেকে সরকারি ও সামাজিক ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতিয়ার হিসেবেই এরা কাজ করছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস বা সংঘর্ষের কারণ হিসেবে অনেক সময়ই ছাত্রদের রাজনৈতিক সংগঠন করাকেই দায়ী করা হয়। এ ধরনের যুক্তি অজ্ঞতা কিংবা উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা থেকেই জন্ম নিতে পারে। কেননা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব নিয়ে সংঘর্ষ হয় তার মধ্যে কিছু কিছু আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক মনে হলেও অনেকগুলোর উৎস ভিন্ন।

সেসব সংঘর্ষই বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে, যেখানে পরিকল্পিত সন্ত্রাস চালানো হয় এবং যেখানে এক পক্ষের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষ চড়াও হয়। যারা এভাবে চড়াও হয় তাদের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কেননা তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাঠামো দ্বারা আশ্রিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইন কানুনের উর্ধ্বে অবস্থান করে। এরা হাজারো অপরাধ করলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আইনতো দূরের কথা রাষ্ট্রীয় আইনও তাদের নাগাল পায় না। মাঝে মধ্যে জনমত প্রবল হলে দু' একজনের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু প্রক্রিয়া শেষ হয় না। তারা সুবিধামতো দল বেছে নেয়। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে এদের তৈরি করে, এদের সাথে আপস করে চলে, প্রশ্রয় দান করে, নিজেদের অপকর্ম বা মেরুদণ্ডহীন সুবিধাবাদী নীতি অব্যাহত রাখার স্বার্থে।

যেহেতু এরা মূলত ছাত্র নয়, যেহেতু এদেরকে লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে তৈরি করা হয়, সেজন্যে সাধারণ শিক্ষকদের পক্ষেও এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। কেননা শিক্ষক অস্ত্রধারী বাহিনী নন, তার একমাত্র অস্ত্র নৈতিক চাপ। আবার শিক্ষকদের একাংশ যদি স্কুল-কলেজকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত থাকেন, তা হলে কোন প্রকার নৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করার অধিকারও তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। তারা বরং এদের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ান।

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ। শেষ কথা

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান নৈরাজ্য ও অশিক্ষার দাপট কমার কোনো সম্ভাবনা এখনও দৃশ্যমান নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের ব্যাপারে ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের মধ্যে হতাশা যথেষ্ট। কিন্তু এই সেশনজটের উৎস খুঁজতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তার মূল খুঁজলে চলবে না। এ কথা ঠিক যে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরবর্তী জীবনের অনিশ্চয়তা ছাত্র-ছাত্রীদের চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত করে, শিক্ষার প্রতি

শ্রদ্ধাহীন করে তোলে। চাকরির বয়সসীমা চলে যায়, বয়সসীমা থাকলেও তার চাকরি হয় না। কেননা লুটপাটের ফলে উৎপাদনশীল খাতের বিস্তার নেই, সে কারণে স্থায়ী স্থিতিশীল কর্মসংস্থানেরও বিস্তার ঘটে না। এর ওপর চাকরিতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ঘটনাকেও আরও জটিল করে তোলে। কিন্তু এরপর ছাত্রছাত্রীদের বিপুল অধিকাংশ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা শেষ করতে চায়।

অন্যদিকে, শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও তাই। শিক্ষকতা পেশা হিসেবে বর্তমানে খুবই নাজুক, অনির্ভরযোগ্য। স্কুল কলেজে শিক্ষক কোচিং বা প্রাইভেট টিউশনি করলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকাদারি গবেষণা করলে, একজন শিক্ষক নিজের জীবিকা ঠিকভাবে নির্বাহ করতে সক্ষম। এই কাজগুলোতে বেশিমাত্রায় জড়িত হলে শিক্ষকতার দায়িত্বও ঠিকভাবে পালন সম্ভব হয় না। যারা শিক্ষকতা বেছে নেন তাদের জন্য এই অবস্থা অস্বস্তিকর, হতাশাব্যঞ্জক। এরপরও শিক্ষকদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই পাওয়া যাবে যারা শিক্ষকতার গণ্ডির বাইরে চলাফেরা করেন এবং ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিকে প্রধান হিসেবে আঁকড়ে ধরেন।

হাতেগোনা কিছু ব্যবসায়ী ও হাতিয়ার ছাত্র যেমন প্রধানত ছাত্র নয়, তেমন হাতেগোনা কিছু শিক্ষকও প্রধানত শিক্ষক নয়। এই অশিক্ষকরা অছাত্রদের সাথে মিলে সৃষ্টি করে দুষ্টচক্র, শিক্ষকদের ব্যবহার করে অশিক্ষক নেতা বাড়িগাড়ি বানায়, তার দুর্নীতির খবর প্রকাশের পর সে সরকারি পদে ভূষিত হয়। ছাত্রদের মধ্যে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও নীতিহীন কার্যক্রমে পারঙ্গম হয়ে উঠলে তার হাতে আসে পারমিট, লাইসেন্স বা বিদেশে ভালো চাকরির সুযোগ। এভাবেই এদের ঐক্যসূত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে প্রবল প্রতিবন্ধকতার। শিক্ষার বিরুদ্ধে।

কলেজে নকলকে প্রতিষ্ঠা করে যে অধ্যক্ষ নিজের মুনাফা বৃদ্ধি করে, স্কুলের যে শিক্ষক ছাত্রকে নকল সরবরাহ করে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষক বা প্রশাসন শিক্ষা বিরোধী কার্যক্রমে যুক্ত থাকে তারা নিজেদের এসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে শিক্ষাঙ্গনে কিছু নির্বোধ দানব তৈরি করে, কিংবা তাকে আশ্রয় দান করে। এদের বেড়ে ওঠার মূল শক্তি যোগায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনে যখন হাতেগোনা কজন ছাত্র বা কজন শিক্ষক নামধারী ব্যক্তির কার্যক্রম নৈরাজ্যকে গভীরতর করে তখন এর দায়-দায়িত্ব সকল ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক সমাজের ওপর চাপিয়ে প্রচারণা চালানো হয়। প্রচারণা চালানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ধারণার বিরুদ্ধে, আর বাস্তবে এর স্বায়ত্তশাসন বিভিন্ন নিয়ম-কানুন দ্বারা প্রতিনিয়ত খর্ব হতে থাকে। বাস্তবে তার অস্তিত্বই থাকে না। ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরাও এই প্রচারণায় শরিক হয় এবং এই প্রচারণা পরিচালনা করে তারাই, রাষ্ট্রীয়ভাবে যারা ঐ দুষ্টচক্রকে লালন-পালন করে।

অন্যদিকে, এই দুষ্টচক্রের অপতৎপরতা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-শিক্ষককে জিম্মি করে রাখে। এই চক্রই শিক্ষাখাতের ক্রমাবনতি ও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে শাসক শ্রেণীর মূল শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

বৈষম্যমূলক অবৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষাখাতে প্রকৃত ব্যয় হ্রাস, শিক্ষা ব্যয় নির্বাহে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করা ইত্যাদিকে অনেকে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীনতার ফসল বলে চিহ্নিত করেন। আসলে এগুলো বরং দুষ্ট পরিকল্পনা জালেরই ফসল।

যে দেশে শিক্ষাখাতের বিকাশ শাসকশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী, সেদেশে শিক্ষাখাতে সমস্যা জিইয়ে রাখা এবং উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় তরুণদের শাসন-শোষণ ও লুটপাটের হাতিয়ার বানিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা খুব বাস্তব।

কিন্তু এরপরও কথা থাকে এসব অপচেষ্টা যারা করছে তারা তো হাতেগোনা মুষ্টিমেয়। শিকার হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ প্রশ্ন থাকতেই পারে যে, তাদের দিক থেকে এ অপচেষ্টার জাল ছিন্ন করার উদ্যোগ কেন এখনও প্রবল নয়? তাদের ভূমিকা কি 'সাইলেন্ট মেজরিটি' হিসেবেই অব্যাহত থাকবে?

বিচিত্রা, অক্টোবর, ১৯৮৭

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার সমস্যা ও শক্তি

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা এখন সামাজিকভাবে কোন আকর্ষণীয় পেশা নয়। বর্তমান সমাজে ভোগচাহিদার বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা পশ্চাদ সারির পেশা। এই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ বর্তমানে শুধু যে আর্থিক সমস্যাই মোকাবিলা করছেন তাই নয়, মুক্ত বুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রে নানাদিক থেকে হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা হিসেবে দাঁড়ানোর জন্যে সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক যে আনুকূল্য প্রয়োজন তা সম্প্রসারণের পরিবর্তে সংকুচিতই হচ্ছে।

সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার একটি উচ্চ ধাপ হিসেবে শিক্ষকতার মধ্যে একটা দুর্দমনীয় শক্তি আছে। সে শক্তির কারণে প্রকৃত শিক্ষকদের মধ্যে প্রচণ্ড অহংবোধ আছে। এই অহংবোধই তাকে দাঁড়ানোর, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় স্বাধীনভাবে নিয়োজিত হওয়ার শক্তি যোগায়।

এর পরও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ক্রমেই শক্তিপ্রাপ্ত হচ্ছে সেগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : ১. আর্থিক প্রতিকূলতা, ২. মেধার ব্যবহারে আনুকূল্যের অভাব এবং ৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র ও মুক্তিবুদ্ধির চর্চার সমস্যা।

শুধু অর্থনৈতিক দিকটি বিবেচনা করলে শিক্ষকতা পেশার প্রতি যোগ্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট হওয়ার যুক্তি পাওয়া মুশকিল। যারা শিক্ষকতা পেশায় আসেন তারা শিক্ষার্থী জীবনে সফল, কৃতী। তাদের পক্ষে আর্থিক সাফল্যের জন্যে উপযোগী পেশা গ্রহণের সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি। যদিও বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশে অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভের মতো পেশা গ্রহণের জন্যে শিক্ষার্থী জীবনের সাফল্য এখন গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আর্থিক জীবনের সংকট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। সংশ্লিষ্ট সকলে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এ সম্পর্কে ভালো অবগত আছেন। তবে এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, অন্যান্য অনেক নির্দিষ্ট আয়ের মানুষদের মতো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরও প্রকৃত আয় গত দুই দশকে কমেছে। ১৯৭২ সালে একজন প্রভাষকের মাসিক মূল বেতন ছিল ৪৫০ টাকা। ঐ টাকায় যে দ্রব্যাদি কেনা যেত সেসব কেনার জন্যে এখন জীবন-যাত্রার ব্যয় সূচক

অনুযায়ী মূল বেতন হওয়া উচিত ৬৭৫০ টাকারও বেশি। অর্থাৎ একজন প্রভাষক যদি এখন মূল বেতন হিসেবে ৬৭৫০ টাকা পান তা হলে হিসাব অনুযায়ী ধরে নেওয়া যাবে তিনি ১৯৭২ সালের সমান প্রকৃত বেতন পাচ্ছেন। কিন্তু বর্তমানে একজন প্রভাষকের মূল বেতন ২৮৫০ টাকা, অর্থাৎ সহজ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের শিক্ষকতার শুরুর বিন্দুতেই প্রকৃত আয় গত দুই দশকে কমে শতকরা ৪০ ভাগের মতো দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ক্রয়যোগ্য পণ্যের ঝাঁপিতে নতুন অনেক পণ্য যোগ হয়েছে। মধ্যবিত্তের প্রতিযোগিতায় বেতনের টাকা দিয়ে শিক্ষকরা, অন্যান্য সীমিত আয়ের মানুষদের মতোই, পেছনের সারিতে চলে গেছেন। সবসময় হিসাব-নিকাশ ও নানা পথ অনুসন্ধানে তাদের এখন অনেক সময় পার করতে হয়।

এই পেশার বৈষয়িক ক্ষেত্রে কিছু আকর্ষণ কিংবা বিকল্প কিছু রাস্তা এখন তৈরি হয়েছে। সম্ভবত সেগুলোই এখন এই পেশার বিকর্ষণ নিরোধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর একটি হলো বিদেশ গমন। স্বাধীনতার ফলে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি সূত্রে 'উন্নত' দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ বেড়েছে। এসব ক্ষেত্রে আমলা, এনজিও কর্মকর্তাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা সার্থকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উচ্চ শিক্ষার্থে উন্নত দেশগুলোতে গমন একদিকে যেমন পেশাগত উৎকর্ষ বাড়াতে সাহায্য করে, তেমনি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভেও আনুকূল্য দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষে আরও যেসব বিদেশ যাত্রার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিতরা অন্যদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন। ইদানীং আমলাতন্ত্রের সদস্যরা এ সুযোগগুলো আরও বেশি হারে গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন বলে জানা যায়।

আয় ঘাটতি মেটানোর বিকল্প আরেকটি রাস্তা হলো গবেষণা। বিশেষত শিল্পোন্নত দেশ বা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অর্থানুকূল্যে গবেষণা, তা যে মাপেরই হোক, এখন শিক্ষকদের আর্থিক ঘাটতিপূরণ বা স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্যে অন্যতম অবলম্বন। অন্যদিকে, এটি অবশ্য শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষলাভ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রেও সহায়তা করে। এছাড়া আরো কিছু পথে কিছুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের আয়ের কিছু সংকুলান হয়, যেমন—নোটবই রচনা, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি। শেষোক্ত কাজগুলো অবশ্য এখনো সম্মানজনক হিসেবে শিক্ষক সমাজে গৃহীত হয়ে উঠেনি।

একজন প্রভাষক তো দূরের কথা একজন পূর্ণ অধ্যাপকের পক্ষেও একক বেতনের টাকা দিয়ে পরিবার নির্বাহ করা অসম্ভব। শিক্ষকতার জন্যে লেখাপড়ার জন্যে যে প্রচুর সময় দরকার সে সময়ের বেশিরভাগ অংশ অতএব জীবন নির্বাহের অর্থ সংগ্রহে শিক্ষকরা ব্যয় করেন। এই সময় ব্যয়, নানা পথ অনুসন্ধান

শিক্ষকতাকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তার কোন পরিসংখ্যান বা সমীক্ষা আমার কাছে নেই। সাধারণ পর্যবেক্ষণে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, আর্থিক জীবনের টানাপড়েন ও তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে উদয়াস্ত বিমর্ষ, উত্তেজিত, বিপন্ন, ব্যস্ত, অস্থির থাকার ফলে যে কাজটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা হলো শিক্ষকতা।

শিক্ষকতাকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্যতা ধারণ করেন, ধরেই নেয়া যায় যে, তাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে, উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার অধিকারী। অবিরাম ও প্রবাহিত তরুণ প্রজন্মের সাথে তাঁদের লেনদেন হয়, তাঁদের কাছে সমাজের প্রত্যাশা থাকে, তাঁরা সৃজনশীল বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও আন্তরিকতা দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করবেন।

এই সৃজনশীল বিশ্লেষণ ক্ষমতা একটি অব্যাহত চর্চার বিষয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কারও মধ্যে এই ক্ষমতার বিকাশ হয় না। এর জন্যে বিপুল অধ্যয়ন, গবেষণা, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা, বিতর্ক প্রকাশনা ইত্যাদি অপরিহার্য শর্ত। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় যারাই আন্তরিকভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন এই শর্ত পূরণের পথে বাধা কতখানি।

প্রথমত, নিজেদের আর্থিক দৈন্য শিক্ষকদের সুস্থির জীবনলাভে অক্ষম করে তোলে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই-জার্নাল সংগ্রহও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও যথেষ্ট বই জার্নাল যোগান দেয়া কিংবা মৌলিক গবেষণায় অর্থসংস্থান কিংবা প্রকাশনায় সহযোগিতা দানের অবস্থা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তৈরি হয় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় একদিকে এমনিতে তুচ্ছ, অন্যদিকে অন্যান্য খাতের তুলনায়ও তা খুবই কম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবহন খাতে যে ব্যয় হয় তার ১০ ভাগের মাত্র ১ ভাগ ব্যয় হয় গ্রন্থাগারে। যাওয়া-আসাই যেন প্রধান কর্ম, পথের ধারে পড়ে থাকে গ্রন্থাগার নামক এক ভবন। গ্রন্থযোগ হয় কমই।

তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের মৌলিক গবেষণাতেও অর্থসংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই। সরকারিভাবেও এ ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ নেই। মাঝেমধ্যে যে মুষ্টিভিক্ষার মতো কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা আবার 'দলভারী' করার প্রকল্পের অধীনস্ত হয়ে যায়।

এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিজের সৃজনশীল তাড়না থেকে কোন জরুরি মৌলিক বিষয়ে গবেষণায় হাত দেয়ার সুযোগ নেই। গবেষণার জন্যে আন্তর্জাতিক সংস্থায় ধরনা দান এবং এই দেশি-বিদেশি লর্ডদের পছন্দসই বিষয়কে পছন্দ করা (তার মান যাই হোক না কেন) ছাড়া আর উপায় থাকে না। এভাবে যে গবেষণা হয় তাতে অর্থ আয় হয়, কিন্তু মৌলিক গবেষণার অভাব পূরণ হয় না। সৃজনশীল

কাজের জন্যে নিজের তাগিদ তৈরির প্রক্রিয়া এতে কমই তৈরি হয়। গবেষক তৈরির প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু এর কোন বিকল্পও এখন উপস্থিত নেই।

চতুর্থত, প্রকাশনা ক্ষেত্রেও প্রায় একইরকম সমস্যা। বাংলাদেশের সমাজে এখন সবকিছুতে যেমন চিন্তাহীন মেধাহীন শর্টকাট সাফল্য অর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও তাই। কোনরকম চিন্তা বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিকাশ ছাড়া নোট বই আশ্রয়ী মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভর করে পরীক্ষায় ভালো করা এখন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান প্রবণতা। এর কারণে নোট বইয়ের চাহিদা অনেক বেশি, বাণিজ্যিক বিবেচনায় নোট বই একটি ভালো বিনিয়োগ ক্ষেত্র। সেজন্যে এখন কোন শিক্ষক যদি প্রয়োজনীয় মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন তা হলে সেটি প্রকাশ করা দুরূহ, প্রকাশ করা সম্ভব হলেও সেখান থেকে নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে কোন অর্থ আশা করা বৃথা। অন্যদিকে, অনেক কম পরিশ্রমের কাজ নোট বই প্রকাশের জন্যে অজস্র প্রকাশক পাওয়া যায় এবং আগাম থেকে শুরু করে প্রচুর অর্থ আয়ও তা থেকে সম্ভব। এর ফলে সামাজিক এসব প্রবণতা, শিক্ষকদের মৌলিক প্রকাশনা থেকে নোট বইয়ের দিকে যাওয়ার জন্যেই প্ররোচিত করে। নোট বইয়ের দিকে যাওয়ার আকর্ষণকে প্রতিহত করা হয়তো ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব, কিন্তু গবেষণা প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিকূলতা দূর করা ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগই একমাত্র শিক্ষা। কিন্তু গবেষণার মতো এরকম মৌলিক প্রকাশনা ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কার্যকর ধারাবাহিকতার কোন উদ্যোগ দেখা যায় না।

গবেষণা প্রকাশনা এবং সৃজনশীল উদ্যোগসমূহে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নেতৃত্বদান করার কথা, সেখানে সেগুলোর এই অথর্ব পঙ্গু ভূমিকার পেছনে মূল দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের। বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের কোন গুরুত্ব অনুভব করে না, কেননা কোন ব্যাপারে স্বাধীন উদ্যোগ নিতে কিংবা চিন্তা-ভাবনা করতে তারা অভ্যস্ত নয়। গবেষণা, প্রকাশনা, পরিকল্পনা, উদ্যোগের কাজে তারা দাতা সংস্থা বলে পরিচিত সংস্থা ও পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলোর হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। শিক্ষাখাতে স্বাধীনতার পর থেকে আনুপাতিক ব্যয় হ্রাস, অপরিকল্পিত অসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা, অনুপাদনশীল শিক্ষায় বেশি ব্যয়বরাদ্দ ইত্যাদি এরই বহিঃপ্রকাশ। পরিস্থিতির জন্যে পরবর্তী দায়িত্ব বর্তায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপর। শিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে নিজস্ব উদ্যোগ, পরিকল্পনা অর্থায়নের নানা বিকল্প পথ অনুসন্ধানে প্রশাসনিক উদ্যোগের কোন দৃষ্টান্তও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় না। ফলাফল হিসেবে মেধা ও সৃজনশীল ক্ষমতার কত অপচয় হচ্ছে তার হিসাব করা কঠিন। তবে এই অপচয় যে বিশাল তাতে সন্দেহ নেই।

সৃজনশীল বিদ্যাচর্চার সর্বোচ্চ পীঠস্থান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার সাথে নিয়ন্ত্রণ, সংকীর্ণতা, মতান্ধতা, আমলাতান্ত্রিকতা অসংগতিপূর্ণ। মুক্তবিদ্যা চর্চার জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বৈচিত্র্যময় ধ্যান-ধারণা, মতের বিকাশ, বিতর্ক ধারণ করা ও তাকে এগিয়ে নেয়ার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক-স্বৈরাচারী ভূমিকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শিক্ষকদের পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর কর্মচারী বানানোর জন্যে সর্বাত্মক অপচেষ্টা তখন নিয়োজিত ছিল। উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষক নিয়োগ এবং অপসারণকে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছু অনুগত কর্মচারীর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার প্রতিবাদে সেসময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকেরাও সরব হয়েছিলেন। অনেককেই এর জন্যে এর মূল্য দিতে হয়েছে।

৬০ দশকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের লড়াই এবং সর্বোপরি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল হিসেবেই দেশের প্রধান ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। এই স্বায়ত্তশাসনের উজ্জ্বল দিকটি হলো শিক্ষকদের মতো প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দান। এছাড়া এই অর্ডিন্যান্স বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায়, সিলেবাস প্রণয়নে, শিক্ষক নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অধিকার সম্প্রসারিত করে।

ইদানীং এই স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে একটি জোরদার প্রচারণা আছে। শাসক শ্রেণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ করার জন্যে এই প্রচারণায় সবল অংশীদার। প্রচারণায় জোর দিয়ে বলা হয় যে, এই স্বায়ত্তশাসন শিক্ষক-রাজনীতির জন্মদান করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাস বৃদ্ধি করছে। এই প্রচারণার সুযোগ নিয়ে এখন পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন আদৌ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। নতুন যেসব বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, যেমন— খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এগুলোতেও এই স্বায়ত্তশাসন বিধি চালু করা হয়নি।

স্বায়ত্তশাসন বিরোধী প্রচারণায় শিক্ষক-রাজনীতির কথা বলা হয়। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন যেখানে নেই সেসব প্রতিষ্ঠানে যেমন সরকারি কলেজ, এমনকি খোদ আমলাতন্ত্রের মধ্যে এখন অনেক মত-পথ-সংঘাত কোন গোপন ব্যাপার নয়। এমনকি সমাবেশ-ধর্মঘটও তারা করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যখন স্বায়ত্তশাসন ছিল না তখনও দলাদলি কম ছিল না। তখন কোন ব্যক্তির পক্ষে উর্ধ্বতন ব্যক্তির সন্তুষ্টিবিধান ছাড়া টিকে থাকাই মুশকিল ছিল। স্বায়ত্তশাসন অ্যাক্টের পর তেলমর্দন, তোয়াজ, আনুগত্যের প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা অনেক

কমে গেছে। শক্তভাবে দাঁড়ালে একজন শিক্ষক, পেশার জন্যে কোন হুমকি সৃষ্টি না করেও, এখন স্বাধীনভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সন্ত্রাসের প্রচারণাটিও বাস্তবতার বিকৃত উপস্থাপন। প্রচারণা থেকে মনে হতে পারে যে, যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন আছে সেখানেই যাবতীয় সন্ত্রাস। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় আরও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস হচ্ছে যেগুলো পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রিত। পুরো সমাজ ও রাষ্ট্র যেখানে সন্ত্রাসের ওপর ভিত্তি করেই টিকে আছে সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে কিংবা বন্ধের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ভূমিকা যথেষ্ট শর্ত নয়।

যে সন্ত্রাস ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন সময়ে দেখা যাচ্ছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে জাতীয় রাজনীতির সাথে সেগুলো সরাসরি সম্পর্কিত এবং এসব সন্ত্রাসীরা প্রশাসনের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েই যে টিকে আছে, সেটাও আমরা সবাই বুঝতে পারি।

চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে সন্ত্রাসী পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত '৭১-এর ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী এই দলের শক্তি বৃদ্ধি একদিকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে তা মুক্ত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা স্মরণ না করে পারি না যে, এই দলটির নেতৃত্বে গঠিত আলবদর বাহিনীর হাতেই, দুই দশক আগে এই মাসেই, মুক্ত চিন্তা ও মানবিক ভূমিকা গ্রহণের অপরাধে শত শত শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। বধ্যভূমিতে তাদেরকে লাশ বানানো হয়েছিল মুক্ত চিন্তাকে কবরস্থ করার জন্যে। দুর্বৃত্তদের সে চেষ্টা সফল হয়নি বলে এখনও তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। '৭১-এর শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের দলের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি আক্রমণে এত বছর পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতিদিন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে চলাফেরা করতে হচ্ছে। এটা আমাদের সবার জন্যে লজ্জার, অপমানের। এরা হচ্ছে সামাজিক ফ্যাসিবাদী শক্তির অংশ যারা মত প্রকাশের জন্যে ফাঁসি দাবি করে, হামলা করে, রগ কাটে, গ্রন্থ নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়, মতপ্রকাশকে বাধা দেবার জন্যে ধর্মকে কুৎসিতভাবে ব্যবহার করে। এদের উত্থান বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র সমাজে মুক্ত গণতান্ত্রিক চর্চার পথে বাধাস্বরূপ।

স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে এটা বলা দরকার যে, স্বায়ত্তশাসনের যে ব্যবস্থা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে তা ত্রুটিমুক্ত নয় এবং তার অপপ্রয়োগও কম হয়নি। এই অপপ্রয়োগই এখনকার প্রচারণাকে শক্তি যুগিয়েছে। আমি মনে করি,

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উজ্জ্বল দিকগুলো হলো—১. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতপ্রকাশের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি। ২. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ও শিক্ষা, পাঠ্যসূচি, পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষকদের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা। ৩. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নির্বাচিত সংস্থাসমূহের প্রধান ভূমিকা।

বলা বাহুল্য, গত দুই দশকে এই উজ্জ্বল দিকগুলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকার ও সামাজিক অগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রচর্চার প্রতিবন্ধকতার কারণে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের বর্তমান ক্রুটি দূর করার আসল উপায় হচ্ছে ওপরের উজ্জ্বল দিকগুলো সম্প্রসারণ ও বাধামুক্ত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তৈরি।

সিন্ডিকেট, সিনেট ইত্যাদি সংস্থায় এখনও কার্যত সরকারি বা সরকার প্রভাবিত ব্যক্তিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাছাড়া অর্থসংস্থান ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং সর্বোপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণের বহুরকম পথ খোলা রেখেছেন। এই পথগুলো আরও উর্বর হয়ে ওঠে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চেতনার অভাব দেখা দেয় এবং সংকীর্ণ স্বার্থ শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে গ্রাস করে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকেরা সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ভাবাদর্শের উর্ধ্বে নন। সে অনুযায়ী তাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক মত ও পথের মধ্যে পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। সে অনুযায়ী যুক্তিসংগতভাবে নিজেদের মত প্রকাশ, বিতর্ক, পার্থক্যের সুযোগও শিক্ষকদের অবশ্যই থাকতে হবে। এগুলোকে কেন্দ্র করে যদি শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন দলের উদ্ভব হয় তাতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই। মতপার্থক্য নিয়ে শিক্ষকরা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাজীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে তা নিয়ে অগ্রসর হবেন, এটা বরং সুস্থতারই লক্ষণ।

কিন্তু যখন দেখা যায়, শিক্ষকদের দল-তৎপরতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা জীবনকে কেন্দ্র করে যতটা, তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়, যখন দেখা যায় ক্ষমতা গ্রাস করার জন্যে দল নেতৃত্ব যে কোন সংকীর্ণ পথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, যখন দেখা যায় দলভারী করার জন্যে শিক্ষক নিয়োগের চাইতে ভোটার নিয়োগে প্রভাবশালী শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বেশি আগ্রহী, যখন দেখা যায় ভোটার নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক নির্বাচনী কমিটি এবং সিন্ডিকেটকে কুৎসিতভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে তখন গণতন্ত্রচর্চার খোলসটাই থাকে- মর্মবস্তুর দিক থেকে তা অগণতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক চর্চায় পরিণত হয়। বাস্তবে সেটাই হয়েছে।

আগের আলোচনার সূত্র ধরে আবারও বলতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করতে আসেন তাঁরা আর্থিক বিবেচনার চাইতে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার তাগিদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ, স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনাতেই এই পেশায় যোগ দেন। দৃঢ় মেরুদণ্ড না থাকলে কারও পক্ষে এই পেশায় আসা কিংবা সার্থকভাবে শিক্ষকতা করা সম্ভব নয়। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রধান শর্ত হলো আত্মপ্রত্যয় ও অহংবোধ, যার মধ্যে এগুলো নেই তার পক্ষে শিক্ষকতার পেশা বেমানান। যাঁর দাঁড়ানোর জন্যে অন্যের দন্ড প্রয়োজন হয় তাঁর মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকবে, এটা আশা করার কোন কারণ নেই।

সে হিসেবে যাঁরা শিক্ষকতায় আসেন, ধারণা করা সংগত যে, তাঁরা নিজেদের যোগ্যতায় আসেন, পদোন্নতি লাভ ইত্যাদিও তাঁরা নিজেদের যোগ্যতায়ই পেয়ে থাকেন। এখানে দেনদরবার, ধরনা, তোয়াজ, প্রভুতোষণ ইত্যাদি প্রবণতার সুযোগ কম থাকারই কথা। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ বা পদোন্নতির ঘোরপ্যাঁচ ও পর্দার আড়ালের নানা তৎপরতা দেখলে এই ধারণা আহত হয়। দেখা যায়, যোগ্যতা নিয়ে একজন শিক্ষক নিয়োগ বা পদোন্নতি পেলেও তার সামনে এমন সব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে তিনি সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রভাবশালী কারও না কারও দ্বারস্থ হচ্ছেন এবং তার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে যা পাওয়ার কথা সেটা তাকে 'পাইয়ে দেয়া হলো'– 'আনুকূল্য প্রদর্শন করা হলো'-এরকম একটি ধারণা সৃষ্টি করা হয়। তাকে আনুকূল্য প্রদর্শনের মাধ্যমে এমন একটি বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলা হয়, যা পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক তৈরি করে।

দল ভারী করার জন্যে এ ধরনের তৎপরতা মতপার্থক্যের গণতান্ত্রিক চর্চার বদলে তৈরি করে সংকীর্ণ দলাদলি। যাকে অজুহাত হিসেবে ধরে গণতান্ত্রিক চর্চার যে মর্মবস্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ, তাকে নির্মূল করার জন্যে উদ্যত হয় শাসক শ্রেণী ও সামাজিক বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক শক্তি। এসব শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্তান ও মেরুদণ্ডহীন সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, মাস্তানি দিয়ে যেমন মুক্তবুদ্ধির চর্চা হয় না, তেমনি কোন মেরুদণ্ডহীনের পক্ষেও স্বাধীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়।

শিক্ষকদের জবাবদিহিতার একটি প্রশ্ন এখন বিভিন্ন মহল থেকে জোরেশোরেই উত্থাপিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে, শিক্ষকরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। তাদের জবাবদিহিতার কোন জায়গা নেই বলে এটি অবাধে চলছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানে অবনতি দেখা যাচ্ছে।

অভিযোগে অতিরঞ্জন থাকলেও পরিস্থিতি এমন যে, আমরা এই অভিযোগ অস্বীকার করতে পারি না। বস্তুত অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের মধ্যে এমন শিক্ষকও আছেন যাদের ক্লাস নেয়ার সময় নেই, মাসের পর মাস খাতা দেখার

সময় নেই, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলার সময় নেই। সংখ্যা খুব কম হলেও এ ধরনের শিক্ষকের উপস্থিতি সমস্ত শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি বা গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

জবাবদিহিতা দরকার। কিন্তু কীভাবে এটা সম্ভব? শিক্ষকরা কার কাছে জবাবদিহি করবেন? তবে কি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি? সেটি তো ভয়াবহ আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি করে। শিক্ষকের মধ্যে কি হায়ারার্কি করলে এটা সম্ভব? বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা ডিন বা উপাচার্য যেই হোক না কেন পদাধিকার বলে তাঁকে যদি এজন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হয় তাহলে এই নিশ্চয়তা কে বিধান করবে যে তিনি এর অপপ্রয়োগ করবেন না? এই ক্ষমতাবলে তিনি নিজেই একজন আমলায় পরিণত হবেন না? কিংবা নিজে এর জন্যে যথেষ্ট যোগ্য?

এসব পথে ৬০-এর দশকের প্রভু তোষণের প্রক্রিয়াই কেবল জারি হওয়া সম্ভব। অধস্তন শিক্ষককে অপদস্ত করা, জবাবদিহিতার নামে তার স্বাধীন মত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করার পথই এসব মাধ্যমে বেশি সক্রিয় থাকবে বলে আশঙ্কা করার যুক্তি আছে। কিন্তু এই কারণ দেখিয়ে জবাবদিহিতার প্রশ্ন থেকে আমরা সরে আসতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে জবাবদিহিতার এমন একটি ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে দাঁড় করানো দরকার, যাতে জবাবদিহির ব্যবস্থাও থাকে আবার আমলাতন্ত্রের বিষচক্রও সৃষ্টি না হয়।

এমনিতে ধরে নেয়া হয় যে, শিক্ষকরা দায়িত্বশীল। তাঁদের প্রধান জবাবদিহির জায়গা নিজের কাছেই। কিন্তু এখন আমরা দুঃখের সাথেই বলতে বাধ্য যে, এটি সম্ভবত আর যথেষ্ট শর্ত নয়।

সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজের কাছে জবাবদিহির যে উহ্য ধারণা আছে তাকে সজীব রেখেই আমি আরও তিনটি পথ প্রস্তাব করতে চাই। প্রথমত, শিক্ষকের দায়িত্ব পালন, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন বিবেচনা করার পন্থা নির্ধারণ। দ্বিতীয়ত, বিভাগীয় সভায় সকলের উপস্থিতিতে সকলের ক্লাস, পরীক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন সম্পর্কে নিয়মিত পর্যালোচনার ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ত, শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে এ বিষয়টি তত্ত্বাবধানের একটি প্রক্রিয়া জারি রাখা। এই তিনটি ক্ষেত্রে তথ্যের স্বচ্ছতা, সকলের অংশগ্রহণ এমনভাবে থাকা সম্ভব যাতে কোন রকম আমলাতান্ত্রিকতা তৈরি হওয়ার সুযোগ নেই, কিন্তু অন্যদিকে শিক্ষকদের পারস্পরিক ও সম্মিলিত মতামতের মধ্যে দিয়েই জবাবদিহিতার একটি প্রক্রিয়া দাঁড় করানো সম্ভব।

বৈষয়িক জীবনের টানাপড়েন, শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ অবস্থান, সামাজিক, ধর্মীয়, ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহের উত্থান এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অগণতান্ত্রিক চর্চার মধ্যেই আমাদের শিক্ষকতা চলছে। এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেই অনেক শিক্ষক নিজেদের দায়িত্ববোধকে প্রতিনিয়ত ঝালাই

করছেন—ক্ষোভ ক্রোধ ভেতরে নিয়ে মুক্তবুদ্ধির অহংবোধকে সম্বল করে তারা কাজ করছেন। তাঁদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার শক্তি এখনও নিঃশেষ হয়নি, তাঁদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার ঔজ্জ্বল্য পুরোপুরি নির্বাপিত হয়নি।

সেজন্যে ভরসার জায়গা মুক্ত ও দায়িত্বশীল শিক্ষকেরাই। এই পেশার নিজস্ব গতিশীলতা আছে। প্রতিদিন আমরা শত শত ছাত্র-ছাত্রীর সামনে দাঁড়াচ্ছি, তাদের কাছেই আমাদের আসল জবাবদিহি, তাদের কাছে আমাদের প্রতিনিয়ত পরীক্ষা। রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তি, অক্ষম আমলা বা লোভী শিক্ষক লর্ডদের আধিপত্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাজীবন মুক্ত করার চাপ ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের কাছেই জবাবদিহিতে প্রস্তুত সাবালক শিক্ষকেরা যত বেশি তৈরি করতে পারবেন ততই পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্র পরিপক্ব হবে। এবং একমাত্র সে পথেই শিক্ষকতার শক্তি, মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষমতা নিজের প্রকৃত প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ। ডিসেম্বর, ১৯৮৯

দেশ কার হাতে

মাথাপিছু আয়ের হিসেব ধরলে বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ। গত দশ বছরের হিসাব নিলে ভয়াবহ চিত্র দেখতে পাই। উৎপাদন বাড়েনি, বেড়েছে জনসংখ্যা। শতকরা হিসেবে ধরলে সবচেয়ে বেড়েছে কোটিপতি। দশ বছরে বাংলাদেশ সব কিছুতে পিছিয়ে থাকলেও সৃষ্টি করেছে কোটিপতি। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সঙ্গে 'দক্ষ' এবং 'উচ্চাভিলাষী' যোগাযোগ, কোটিপতি হওয়ার প্রধান ভিত্তি। এই মন্তব্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই। ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা অনাদায়ই হচ্ছে এইসব কোটিপতির আয়ের উৎস। একটি 'লুম্পেন' অর্থনীতি, শিল্প কারখানার কিংবা স্থাবর মালিকানার চাইতে 'কন্টাক্ট' এবং 'কন্ট্রাক্টের' ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই যোগাযোগ এবং চুক্তির একপক্ষে থাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ক্ষমতাবান ব্যক্তি, অন্যপক্ষে থাকে উঠতি কিংবা ইতোমধ্যেই উঠেছেন এমন কোটিপতিরা। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্যতম শক্তিটি হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। এই পারস্পরিক সম্পর্কে সহযোগিতা করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম একটি অংশ, বর্তমানে ওভার ড্রাফট, অ্যাডভান্স এবং প্রডাকটিভ সেক্টরে ঋণ ইত্যাদি শিরোনামে জনগণের আমানতি অর্থ একটি গোষ্ঠীকে প্রদান করছে। এই গোষ্ঠী ব্যাংক থেকে এই অর্থ নিয়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা পরিচালনা করছে। তৈরি করছে নিজেদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি। ব্যাংকের কয়েক হাজার কোটি টাকা কিছু লোকের লুণ্ঠনে গত কয়েক বছরে দেশে তৈরি হয়েছে শতাধিক কোটিপতি। যে কোটিপতির সংখ্যা বাহাত্তর সালে কিছু দুই জন। এই কোটিপতিরা শিল্প কিংবা কৃষি উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করেনি, বিনিয়োগ করেছে দেশের অভ্যন্তরে শিল্প কিংবা কৃষিপণ্য সঞ্চালনে অথবা আমদানি-রপ্তানিতে। তাদের ভিত্তি বিদেশে। ব্যবসা এদেশে। ব্যবসার মূলধন তাদের নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের। কিন্তু ব্যবসায় মুনাফা ব্যাংক থেকে গৃহীত অর্থ সবই চালান হচ্ছে দেশের বিদেশি ব্যাংকে কিংবা সরাসরি বিদেশে। দেশের অর্থে কিছু কোটিপতি অর্থনীতির কঙ্কালকেই খেয়ে নিচ্ছে ঘুনেপোকার মতো। তাদের স্ফীত দেহের বিশ্রামের জন্যে বিদেশে ক্রীত হচ্ছে বাসভবন, হোটেল, ব্যাংক-ব্যালান্স ইত্যাদি।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ তারিখে সরকারি এক আদেশ-বলে সারা বাংলাদেশে ব্যাংক শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত বলে ঘোষণা করা হয়। ১২টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাংক একত্রিত করে গঠিত হয় ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। এর সঙ্গে আরও দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক পরবর্তীকালে যুক্ত হয়; এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক।

১৯৭২-এ যে ব্যাংকগুলো জাতীয়করণ করা হয়, সেগুলোর অধিকাংশই ছিল পরিত্যক্ত সম্পত্তি। বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ নিয়ে সবকটি ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবসায়িক পুঁজির অন্যতম শক্তি হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর যে ভূমিকা, তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে। পরিত্যক্ত বৃহৎ শিল্পকারখানা এবং ব্যাংক শিল্প জাতীয়করণের পদ্ধতি যেরকম ছিল তাতে অনিবার্য বর্তমান পরিণতির দিকে এটি ক্রমশ এগিয়ে গেছে। ব্যাংক জাতীয়করণ করবার পরবর্তী পরিস্থিতি যদি আমরা ঘটনাক্রমিকভাবে সামগ্রিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখি তা হলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে।

স্বাধীনতার পর যে দলটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শাসনভার গ্রহণ করে তারা ছিল প্রধানত কৃষি জমির মালিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পপতি এবং পেশাজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী দল। দলীয় নেতৃত্ব, আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং সাংগঠনিক চরিত্র, বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে এই শ্রেণীগুলোর প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। যার ফলে এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল সব ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চরিত্র, ক্ষমতা গ্রহণের পর, উৎকটভাবে প্রকাশিত হয়। ৭২-এ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহ জাতীয়করণ করবার পর এগুলোর পরিচালনার ভার দলীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই বিতরণ করা হয়, এবং দলীয় ছত্রছায়ায় দেশের পরজীবী গোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিশাল অংশ কালো টাকার মালিক হয়। বাংলাদেশে যেহেতু এর পূর্বে শিল্প পুঁজির বিকাশ ছিল শ্রম, সেহেতু ব্যবসায়িক পুঁজি গঠনের এই প্রক্রিয়া অবাধে অর্থনীতিতে প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। এই পুঁজির শক্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিও সংশোধিত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিল্প বিনিয়োগের সীমা, ব্যাংক ঋণের নিয়ম ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ঘোষিত সমাজতন্ত্রের আবরণ ক্রমশ দূর হয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রবাহ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলে। ১৯৭৫-এর পর থেকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরা, পারস্পরিক স্বার্থে, অধিকতর জোটবদ্ধ হয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। কেউ কেউ দেশ ত্যাগ করে, সম্পত্তি পাচার করে আবার ফিরে আসে বিদেশে খুঁটিস্থাপন করে।

লুটেরা অর্থনীতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতি দীর্ঘস্থায়ী কোনো স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া ব্যবসায়িক পুঁজির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সীমাহীন শোষণ এবং দস্যুবৃত্তি চালানোর ফলে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভও দেখা দেয় স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এসব কারণে লুম্পেন বা 'লুচ্চা' 'কোটিপতিরা তাদের অর্জিত সম্পদ বিদেশে পাচারে অধিকতর আগ্রহী। তারা নিজেদের সম্পদকে যতটা সম্ভব নিরাপদে রেখে সরকারি অর্থে নতুন মুনাফা লুটতে ইচ্ছুক। ব্যবসায়িক পুঁজির এই দাবি রাষ্ট্রযন্ত্র পূরণ করতে অনিচ্ছুক নয় বলে বড় লুটেরাদের এ নিয়ে কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি, এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করেও। তারা ব্যাংক থেকে খুব সহজে কোটি কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালিয়েছে এবং মুনাফা বিদেশেই পাচার করেছে। এ ব্যাপারে সহায়তার জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশী ব্যাংকের বিদেশি শাখা। বর্তমানে ব্যক্তিমালিকানায় যে ব্যাংকের তোড়জোড় চলছে সে ঘটনাও একইভাবে সম্পর্কিত। যারা এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্যে আবেদন করেছে তারাই বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বিশাল অঙ্কের ঋণ অতীতে ভোগ করেছে এবং বর্তমানেও করছে। এটি নিশ্চিত যে, ব্যাংকের জন্যে তারা যে মূলধন বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে সে অর্থও তাদের নিজস্ব নয়, তা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকেই বিভিন্নভাবে সংগৃহীত। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহের জন্যে ইউনিয়ন পর্যন্ত শাখা খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ৪,০০০ শাখা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে জনগণের যে সঞ্চয় সরবরাহ করছে তা মূলত ব্যবসায়িক পুঁজিরই শ্রীবৃদ্ধি করছে।

ব্যাংক ঋণের গন্তব্য

গত মাসে দৈনিক ইত্তেফাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছিল। যেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক কিংবা বাণিজ্যিক কোনো ব্যাংক এর প্রতিবাদ জানায়নি, সেহেতু আমরা এই প্রতিবেদনটিকে বস্তুনিষ্ঠ বলে ধরে নিতে পারি। প্রতিবেদনে উল্লিখিত কয়েকটি তথ্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে :

১. দেশের ৫টি ব্যবসায়ী গ্রুপ বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে। এদের ভূমিকা গড ফাদারের মতো। প্রচলিত কোনো নিয়ম-কানুন এদের জন্যে প্রতিবন্ধক হয় না। এদের নির্দেশেই ব্যাংক চলে।

২. বেসরকারি খাতের জন্যে মোট বরাদ্দকৃত ঋণের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ এই কয়টি গ্রুপ ভোগ করে।

৩. শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, দেশের বাইরে অবস্থিত বাংলাদেশী ব্যাংকের শাখাগুলোও এদের কোটি কোটি টাকা সরবরাহ করছে।

৪. একটি কোম্পানি লন্ডনস্থ একটি ব্যাংকের শাখা থেকে ১৩ কোটি টাকা, আবুধাবিস্থ শাখা থেকে এস ও ডি হিসেবে ২ কোটি দেরহাম, এল, সি লিমিট হিসেবে এক কোটি ৩০ লক্ষ ডলার এবং লেটার অব গ্যারান্টি হিসেবে এক কোটি দেরহাম এবং ৫০ কোটি টাকা ঋণ ভোগ করছে।
৫. লন্ডনভিত্তিক ব্যবসারত একটি কোম্পানি মাত্র ৪ হাজার পাউন্ড মূল্যের একটি ফ্যাক্টরি দেখিয়ে প্রায় সোয়া দু'লক্ষ পাউন্ড পরিমাণ ঋণ ভোগ করছে। এর পরও প্রদত্ত ঋণের প্রকৃত সুদের একটি অংশ মওকুফ করে দেয়া হয়েছে।
৬. কোম্পানিগুলো যে পরিমাণ ঋণভোগ করছে তার শতকরা ৫ ভাগের জন্যে দেয় কর ও আয়করও তারা শোধ করছে না।

এছাড়াও অন্যান্য সূত্র থেকে ব্যাংক ঋণের গন্তব্য সম্পর্কে আরো যে ভয়াবহ তথ্যগুলো পাওয়া গেছে তার কয়েকটি এরকম :

৭. যিনি এদেশের সবচে 'বড়লোক' বলে পরিচিত, তিনি ব্যাংক ঋণের ওপর ভিত্তি করেই প্রধানত তার ব্যবসা পরিচালনা করেন। এখন তার ব্যবসার মূল কেন্দ্র বিদেশে। শিল্প, কৃষি ইত্যাদি খাতে উৎপাদনের নামে ঋণ নিয়েই তার ব্যবসা চলে। সম্প্রতি তিনি বিভিন্ন নামে ঢাকার আশে পাশে জমি সংগ্রহ করেছেন তিন হাজার একর, কিছু কিছু জমিতে বাড়ি তুলে মধ্যপ্রাচ্যের বাংলাদেশীর কাছে বিক্রি করবেন। টাকা বিদেশে গৃহীত হবে। অর্থাৎ দেশের জমি বেচেও বিদেশে সঞ্চয় ঘটবে।
৮. একটি ব্যাংক কিছুদিন আগে একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর নামে কয়েক কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করবার পর, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঋণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড়ের জন্য কয়েকদিন কর্মব্যস্ত দিন কাটান। ব্যবসায়িক গোষ্ঠীটির এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে হয়নি।
৯. একজন কোটিপতি শিল্প প্রতিষ্ঠার নামে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মাত্র কিছুদিন আগে গুলশানে একটি বাড়ি এবং অন্যত্র একটি হোটেল নির্মাণ করেছেন। মর্গেজ দেয়া কারখানায় উৎপাদন নেই-যন্ত্রপাতি যা আছে তাতে ঋণের চার ভাগের এক ভাগও আদায় হবে না।
১০. কিছুদিন আগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঢাকাস্থ শাখা থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে একজন ব্যবসায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত একটি কারখানা ক্রয় করেন এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তার সকল সরঞ্জাম প্রায় দ্বিগুণ দামে আরেক পার্টির কাছে বিক্রয় করেন।
১১. একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে এক ভদ্রলোক শিল্প যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্যে কয়েক কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা নিয়ে তিনি যথাযথ চুক্তির মাধ্যমে নিজেই বিদেশে গিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। কাগজপত্রে

ঋণের পুরো টাকা যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্যে দেখানো হলেও সেগুলো কিনতে প্রকৃতপক্ষে লাগে শতকরা দশ ভাগ অর্থ। বছর খানেক পর ব্যাংক পুরনো অকেজো যন্ত্রাদি এবং জমি (যার দাম প্রদত্ত ঋণের এক-চতুর্থাংশেও নয়) অনাদায়ী ঋণ পরিশোধ না করায় জবর দখল করে। জবর দখল এখনো রয়ে গেছে।

১২. কোনো সুনির্দিষ্ট জামানত না দেখিয়ে এক ব্যক্তি কিছুদিন আগে দেড় কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন। এই ঋণ নেবার পর টাকাসহ তিনি পাড়ি জমিয়েছেন লন্ডনে।

১৩. কৃষিভিত্তিক শিল্পের নামে কোটি কোটি টাকার ঋণ দিচ্ছে কৃষি ব্যাংক। সে টাকায় পরিবহনের ব্যবসা, বার্জ ক্রয়, হোটেল ব্যবসা সবই চলছে। শিল্প ব্যাংকের দেয়া ঋণেরও ব্যবহার হচ্ছে একইভাবে।

উপরোক্ত ঘটনাবলি থেকে কয়েকটি দিক সুস্পষ্ট

ক. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ঋণ দেশের কয়েকটি প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। উৎপাদনমূলক কাজের নামে ঋণ নেয়া হলেও সেগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে ভোগ ও ব্যবসায়।

খ. সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তারা এই পরিস্থিতি বজায় রাখতে অত্যন্ত উৎসাহী।

গ. ব্যাংক ঋণের এই অবস্থার কারণে দেশের সম্ভাব্য উৎপাদনশীল পুঁজি বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

ঘ. বিদেশি মুদ্রার যথাযথ ব্যবহার না হওয়ায় বিদেশি মুদ্রার চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। এই বৃদ্ধি অর্থনীতির উৎপাদন খাতগুলোর কোন কাজে আসছে না।

ঙ. প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা দুর্নীতিবাজ প্রশাসন আইনের ফাঁক, ব্যাংক ঋণের এই গতিকে শক্তি যোগাচ্ছে।

চ. বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে যে, দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী আমলা বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইতিমধ্যে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন। একটি সংস্থার অনুসন্ধান রিপোর্টে বেশ কয়েকজন আমলার বিদেশে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ কয়েকশ মিলিয়ন ডলার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋণের শ্রীবৃদ্ধি, শ্রীহীন অর্থনীতি

বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন সূত্রে জানা যায় যে, ইদানীংকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে সঞ্চয় কমছে এবং সেইসঙ্গে ঋণের পরিমাণ বাড়ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সঞ্চয়ের পরিমাণ কমবার কারণ প্রধানত তিনটি :

১. বড় বড় ডিপোজিটের মালিকেরা এ্যাকাউন্ট প্রত্যাহার করে তা বিদেশি ব্যাংকে জমা রাখছে।

২. বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা বহুজাতিক ব্যাংকগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে সংস্থার কোটি কোটি টাকা বিদেশি ব্যাংকেই জমা রাখছে।

৩. ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ এবং ওভার ড্রাফট নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিদেশি ব্যাংকে টাকা জমা রাখছে অথবা তা বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে। এসবের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে আমানত কমছে এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোতে আমানত দ্রুত হারে বাড়ছে। একটি বিদেশি ব্যাংকের দৈনিক লেনদেন গত বছর গড়ে ছিল ৩০ লক্ষ টাকা; গত মাসে এটি ১ কোটিরও অনেক ওপরে উঠে গেছে। অন্যদিকে, দেশী ব্যাংকগুলোতে এই হার শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ কমে গেছে।

গত এপ্রিল ১৯৮১ পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ ছিল ৩,৪৩১ দশমিক ৭ কোটি টাকা। একই সূত্রে জানা গেছে যে, প্রধানত অগ্রিম বাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে দু'শো কোটি টাকারও বেশি। ১৯৭১-৭২ থেকে শুরু করে ১৯৮১ পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির একটি চিত্র নিচের ছক থেকে পাওয়া যাবে :

	(কোটি টাকায়)
১৯৭১-৭২	৪২৬.৬১
১৯৭২-৭৩	৬১২.৫৫
১৯৭৩-৭৪	৮১৬.৯৩
১৯৭৪-৭৫	৮৯৩.৩৭
১৯৭৫-৭৬	১০৬৪.৮৯
১৯৭৬-৭৭	১২৫৯.৬৫
১৯৭৭-৭৮	১৬০৩.১৭
১৯৭৮-৭৯	২০৪২.৮৭
১৯৭৯-৮০	২০৩৬.৫৬
১৯৮০-৮১ (এপ্রিল ৮১ পর্যন্ত)	৩৪০৫.৫৬

পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪৬৩ দশমিক ৩৭ কোটি টাকা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এই ঋণের ক্ষেত্রে (অগ্রিম, ওভার ড্রাফটসহ) প্রধানত ব্যবসায়িক খাতগুলোই কীভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তা একটি দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হবে।

জনতা ব্যাংকের ১৯৭৯ সালের বার্ষিক রিপোর্টে সে বছরে প্রদত্ত আউটস্ট্যান্ডিং অগ্রিম কী কী খাতে রয়েছে তার ছক দেয়া হয়েছে এভাবে :

		(কোটি টাকায়)
১.	পাট বাণিজ্য	৬৪.৩৭
২.	পাট শিল্প	৫৮.১৫
৩.	চামড়া (বাণিজ্য ও শিল্প)	২৮.৭২
৪.	বস্ত্র (বাণিজ্য ও শিল্প)	৩৩.২৯
৫.	পরিবহন	১২.৯৪
৬.	লৌহ এবং ইস্পাত	২১.০০
৭.	চা (শিল্প ও বাণিজ্য)	৪.৩৫
৮.	চিনি	১১.৫১
৯.	গৃহনির্মাণ	১০.৫৮
১০.	ক্ষুদ্র ঋণ	১৪.৮৬
১১.	পল্লী ঋণ	২০.৪৭

উপরোক্ত খাতগুলো সম্পর্কে একটু সচেতনভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে মোট আউটস্ট্যান্ডিং অগ্রিম ২৮০ দশমিক ২৪ কোটি টাকার মধ্যে ১৮৫ দশমিক ৯ কোটি টাকাই ব্যবসায়িক খাতে রয়েছে।

বাংলাদেশে শিল্পখাতে বিভিন্ন ধরনের ঋণ দেবার জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও 'শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিল্প ব্যাংক (এছাড়াও রয়েছে শিল্প ঋণ সংস্থা)।

১৯৭৯-৮০ সালে শিল্প ব্যাংক যে ঋণগুলো দিয়েছে সেগুলো, অফিসিয়াল কাগজপত্র অনুযায়ী :

১. মুদ্রা	ঋণের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (মিলিয়ন)
বিদেশি	১১৩	৭২১.৭৯
দেশী	১৮২	৩৭০.৪৫
মোট	২৯৫	১০৯২.০৪
২. অঞ্চল	**পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)**	**শতকরা হার**
ঢাকা	৬৭০.৬৭	৬১.৪১
চট্টগ্রাম	১৫৬.৫৬	১৪.৩৪
খুলনা	১৫৫.৮৩	১৪.২৭
রাজশাহী	১০৮.৯৮	৯.৯৮

উপরের প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২টি মাত্র সরকারি, বাকি সবই বেসরকারি। মোট ১০৯ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি ৭ কোটি টাকারও কম।

উপরোক্ত ছকগুলো থেকে মনে হয়, বেসরকারি খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে। সবচাইতে উৎসাহী শিল্প উদ্যোক্তা রয়েছেন ঢাকায়। শুধু শিল্প ব্যাংক নয়, শিল্প ঋণসংস্থা এবং সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ অগ্রিম, ওভারড্রাফট ইত্যাদির অফিসিয়াল কাগজপত্র দেখলেও একথাই মনে হবে। কাগজপত্রে গত আট বছরে সহস্রাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এরকম ব্যাংক ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তবে এর কয়টির অস্তিত্ব আছে? এ প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তারা জানেন, কিন্তু তা বলতে পারবেন না। কেননা, বাস্তব তথ্য এবং কাগজি তথ্যের মধ্যে ফাঁক অত্যন্ত বেশি। চামড়া, তামাক, তাঁত, ক্ষুদ্র শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলেই জানেন কীভাবে উৎপাদনমূলক খাতের নামে লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ তোলা হয় এবং তা জানা-অজানা ব্যবসার কাজে লাগানো হয়।

কৃষি ঋণের ক্ষেত্রেও অভিন্ন পরিস্থিতি। গ্রামীণ পর্যায়ের ব্যাংক শাখাগুলোর কোন শাখা থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের ঋণের অধিকাংশ খোদ উৎপাদকের হাতে গেছে? আমি বেশ কয়েকটি শাখায় অনুসন্ধান করে দেখেছি স্থানীয় আড়তদার পাইকার এসব ব্যাংকের প্রধান ঋণ গ্রহীতা।

গ্রামাঞ্চল, মফস্বলের মাঝারি পাইকার মহাজন আড়তদার থেকে শুরু করে রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত বড় ব্যবসায়ী এবং আমলাদের জন্যে ব্যাংক ঋণের আয়তন ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে এবং এসব ঋণের মধ্যে কত কোটি টাকা সম্পূর্ণ অনাদায়ী, তার কোনো হিসাব নেই। হিসাব নেই হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ কী কাজে লাগছে। হিসাব নেই কত হাজার কোটি টাকা ইতোমধ্যেই বিদেশে চলে গেছে। যারা এই ঋণগ্রহীতা তাদের প্রধান ডিপোজিট দেশীয় ব্যাংকগুলোতে খুব কম। সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বড় বড় অংকের ডিপোজিটগুলো প্রত্যাহার করা শুরু হয়েছে। সেগুলো গিয়ে জমা হচ্ছে বহুজাতিক ব্যাংকগুলোতে। জনগণের জমা অর্থ দিয়ে এভাবেই ব্যবসায়িক পুঁজিকে স্ফীত করা হচ্ছে এবং একটি ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে তা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

এই ধরনের অর্থনৈতিক ঘটনাবলির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কী হবে তা খুব সাধারণ একজন লোকও বোঝেন। ব্যবসায়িক পুঁজির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্যে ব্যাংক ঋণ স্ফীত হচ্ছে। বাজারে বেশি টাকা আসছে। কিন্তু উৎপাদনমূলক খাত সেভাবে বিকশিত হচ্ছে না, বরং মুনাফার সর্বোচ্চ এবং অসঙ্গত হার বজায় থাকায় ব্যবসায়িক পুঁজি উৎপাদনের সকল স্টক ক্যাপিটালও খেয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশের রেলওয়ে, সড়ক পরিবহন, পানি, বিদ্যুৎ, শিল্প কারখানা, কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যতটা পুঁজি গঠিত হচ্ছে তার চাইতে বেশি তা সংগঠিত লুটপাটের মাধ্যমে ব্যবসায়িক পুঁজির মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ পুঁজি গঠনের হারের চাইতে পুঁজি খেয়ে ফেলার হার অনেক বেশি। এই কারণে বাংলাদেশের জাতীয় পুঁজি বর্তমানে নেতিবাচক। অর্থনীতির এই দেউলিয়াপনা এবং নৈরাজ্য বণিক পুঁজিকে আরও উদ্যমী এবং হিংস্র করে

তুলেছে। উৎপাদন নেই, বাজারে টাকার সরবরাহ বাড়ছে। দেখা দিচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। বড় ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, বড় আমলা এবং বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগে দ্রব্যমূল্যের গতি সবসময়ই ঊর্ধ্বগামী হয়ে আছে। অন্যদিকে, দেশের ফসলের যথাযথ দাম কৃষক ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কাছে পৌঁছুচ্ছে না। শ্রমিকসহ সীমিত আয়ের মানুষদের প্রকৃত আয়ও কমছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মুনাফা কমছে এবং এগুলোর ভবিষ্যৎ হয়ে পড়ছে অনিশ্চিত।

দেশের অর্থনীতির দুর্বলতা এবং জনগণের ওপর এর অসহনীয় চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত জানুয়ারি মাস থেকে ওয়েজ আনার্স স্কিমের অধীনে ডলার ও পাউন্ডের মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটি চিত্র হচ্ছে এরকম : জানুয়ারি মাসে প্রতি ডলার ও পাউন্ডের বিনিময় মূল্য যথাক্রমে ১৯ টাকা ২৫ পয়সা থেকে ১৯ টাকা ৩০ পয়সার মধ্যে এবং পাউন্ড ৪৫ টাকা থেকে ৫৮ পয়সা থেকে ৪৬ টাকা ৪২ টয়সা, ফেব্রুয়ারি মাসে ডলার ১৯ টাকা ৩৫ পয়সা থেকে ১৯ টাকা ৮০ পয়সা এবং পাউন্ড ৪৫ টাকা ৩৫ পয়সা থেকে ৪৩ টাকা ৯৬ পয়সা, মার্চ মাসে ডলার ২০ টাকা থেকে ২০ টাকা ৭৫ পয়সা এবং পাউন্ড ৪৩ টাকা ১৮ পয়সা থেকে ৪৬ টাকা ৫০ পয়সা, এপ্রিল মাসে ডলার ২০ টাকা ৮০ পয়সা থেকে ২২ টাকা এবং পাউন্ড ৪৬ টাকা ৭০ পয়সা থেকে ৪৬ টাকা ৮০ পয়সা, মে মাসে ডলার ২২ টাকা থেকে ৫ পয়সা থেকে ২০ টাকা ৯০ পয়সা এবং পাউন্ড ৪৭ টাকা ৩ পয়সা থেকে ৪৬ টাকা ৯১ পয়সা, জুন মাসে ডলার ২২ টাকা ৩০ পয়সা থেকে ২২ টাকা ৭৩ পয়সা এবং পাউন্ড ৪৫ টাকা ২৯ পয়সা থেকে ৪৪ টাকা ২৫ পয়সা, জুলাই মাসে ডলার ২২ টাকা ৪০ পয়সা থেকে ২২ টাকা ৯৫ পয়সা এবং পাউন্ড ৪২ টাকা ৫৯ পয়সা থেকে ৪২ টাকা ৫৪ পয়সা, আগস্ট মাসে ডলার ২৩ টাকা ২০ পয়সা থেকে ২৩ টাকা ৬৮ পয়সা এবং পাউন্ড ৪১ টাকা ৪৬ পয়সা থেকে ৪৩ টাকা ৬০ পয়সা, চলতি সেপ্টেম্বরে পহেলা তারিখ ডলার ২৩ টাকা ৭০ পয়সা ও পাউন্ড ৪৩ টাকা ৭৫ পয়সা এবং ৯ সেপ্টেম্বর ডলার ২৫ টাকা ৭৫ পয়সা এবং পাউন্ড ৪৬ টাকার বিনিময়ে মূল্য ওঠানামা করে।

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ও ক্রমশ বাড়ছেই। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র অনুযায়ী এপ্রিল, ১৯৮১ তে জীবন যাত্রার ব্যয় সূচক গড়পড়তা ৬৪৫.৫-এ এসে দাঁড়ায় (১৯৬৯-৭০ এ ছিল ১০০)। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকে বিদেশি সম্পদ বর্তমানে 'নেগেটিভ' পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০-'৮১ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) এর পরিমাণ ছিল-৫০৭.৮৬ কোটি টাকা।

শেষ

জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এতে সন্দেহ নেই। তবে এই ব্যাংক এবং জাতীয় অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিমূর্ত শক্তি হিসেবে দেখলে এর প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী তা বোঝা সম্ভব হবে না।

ব্যাংক, ভারী শিল্প জাতীয়করণ করাটাই জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের যথেষ্ট শর্ত নয়। যথেষ্ট শর্ত পূরণ তখনই হবে যখন রাষ্ট্রযন্ত্র জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের অনুকূল শক্তি হবে। এই অনুকূল শক্তি কীভাবে আসতে পারে সে প্রশ্ন ভিন্ন। কিন্তু এখানে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, ১৯৭২ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রতিকূল শক্তি হিসেবেই কাজ করেছে, যার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সকল ব্যাংক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কিছু ব্যক্তির কালো টাকার মালিক হওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাংকে জমাকৃত জনগণের টাকা পরজীবী শ্রেণীগুলোর বিশাল বিত্ত বানানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশকে রুদ্ধ না করে এই ব্যবসায়িক পুঁজির এরকম শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব ছিল না বলেই দ্বিতীয়টি ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমটি নৈরাজ্যের সম্মুখীন হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে অতিসম্প্রতি কর্মচারী ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মকর্তাদের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাগুলো হচ্ছে ব্যাংকের এতদিনকার গতিমুখের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। পূর্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে মুখ্যত যারা লাভবান হয়েছে তারাই আবার এখন বিভিন্ন প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে (দৈনিক পত্রিকাও তার মধ্যে একটি) প্রচার করছে জাতীয়করণের জন্যেই এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এভাবে একটি পরিবেশ তৈরি করে তারাই নিজেদের লুণ্ঠিত অর্থ ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিচ্ছে। অথবা বহুজাতিক বিদেশি ব্যাংকগুলোর ব্যবসার পথ সুগম করে দিচ্ছে। এরকম একটি অবস্থায় আমরা আশাবাদী না হলেও সরকার, অর্থমন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে পাঠকদের পক্ষ থেকে একটি দাবি উপস্থাপন করেই বিষয়টির সমাপ্তি টানতে পারি। দাবিটি হচ্ছে :

১৯৭২ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো (বিদেশের শাখাগুলোসহ) থেকে বিভিন্ন খাতে যে পরিমাণ ঋণ ওভারড্রাফট দেয়া হয়েছে সেগুলো কাদের দেয়া হয়েছে, কী জন্য, কী শর্তে, কী জামানতে দেয়া হয়েছে; বস্তুত কী কী কাজে তার ব্যবহার করা হয়েছে, তার কতটা অনাদায়ী রয়েছে; ব্যাংকগুলোর আমানতের অংশীদার কারা বর্তমানে আমানত প্রত্যাহার করছে, বিদেশি ব্যাংকগুলোর ব্যবসার পরিমাণ কী, কত হাজার টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও ব্যাখ্যাসহ একটি শ্বেতপত্র অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক।

বিচিত্রা, ২৩ অক্টোবর, ১৯৮১

ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে অন্তর্ভুক্ত ব্যাংক, বীমা, শিল্পকারখানা বেসরকারি খাতে কোন না কোন পদ্ধতিতেই দিয়ে দেয়া বর্তমান সামরিক সরকারের একটি অন্যতম প্রধান মিশন হিসেবে খুব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বেসামরিক এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে এ কাজটি ধারাবাহিকভাবে হয়ে আসছে। বর্তমান সরকার এ কাজে সর্বোচ্চ সক্রিয়তা ও জেহাদি উন্মাদনা প্রদর্শন করছে।

অর্থনীতিতে সরকারি বেসরকারি খাতের আনুপাতিক শক্তি, সরকারের পক্ষপাত এবং পৃষ্ঠপোষকতার ধরন, এক খাত থেকে অন্য খাতের পরিমাণগত ও গুণগত শক্তি বৃদ্ধির প্রবণতা ইত্যাদি সবই আমাদের মত একটি বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কনিষ্ঠ অংশীদার রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং সামাজিক অন্যান্য বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে। কাজেই বিচ্ছিন্নভাবে আমরা যদি ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণের বর্তমান উদ্যোগী প্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ করতে যাই তবুও নির্দিষ্ট সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত, শর্তাবলি আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে, যার ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিকভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রবণতাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণের কার্যকারণ বিশ্লেষণ হলেও উপরোক্ত কারণে তা সম্পর্কিত বিষয়গুলোকেও সংক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত করবে। বর্তমান প্রবন্ধ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোই প্রধানত আলোচনা করবে। প্রথমত, একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে (হোক সে অনুন্নত কিংবা অবিকশিত এবং বর্তমান সময়ে অপরিহার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদনির্ভর) রাষ্ট্রীয়করণ বিরাষ্ট্রীয়করণ বিষয়টি কীভাবে শাসকশ্রেণী দ্বারা বিবেচিত হয় তার একটি ধারণাত্মক বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের পরিপ্রেক্ষিত এবং ভূমিকা; তৃতীয়ত, বিরাষ্ট্রীয়করণের সামগ্রিক শর্তাবলি; এবং চতুর্থত, এসব দেশে রাষ্ট্রীয়করণ প্রশ্ন সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকা।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সম্পর্কিত ধারণা বিশ্লেষণ

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনেক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি হচ্ছে, এ ব্যবস্থায় উৎপাদন যন্ত্র এবং সম্পদের মালিকানা ক্রমশ সেই জনগোষ্ঠীর খুব ক্ষুদ্র একটি অংশের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে আরো যে দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হচ্ছে, এই কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় অর্থনীতিতে ক্রমেই একচেটিয়ার উদ্ভব হয়। বর্তমান বাংলাদেশে ব্যাংক-বীমা-শিল্প কলকারখানাগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণের পর কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানায় সমবেত হচ্ছে; উৎপাদন যন্ত্র এবং সম্পদ ক্রমেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কয়েক ব্যক্তির হাতে। শিল্প ব্যাংক বীমাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেরই একচেটিয়া আধিপত্য বৃদ্ধির লক্ষণ সুস্পষ্ট। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে এটি একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া।

ইউরোপ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন যন্ত্র বা সম্পদের ওপর বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্কের মাধ্যমে মুষ্টিমেয়ের একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টির পূর্বাবস্থা যেখানে ছিল অব্যাহতভাবে উপনিবেশগুলো থেকে বিপুলহারে আদিম সঞ্চয়ন এবং স্বদেশে তার বিনিয়োগ; এখানে তা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ, সরকারি আনুকূল্য এবং রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাংক থেকে বিপুল সম্পদ লাভের সুযোগ, অনুকূল সরকারি নীতির মাধ্যমে লুটপাটের বৈধ আবরণ সৃষ্টি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। আদিম সঞ্চয়ন এদেশে ঘটছে দেশের অভ্যন্তরেই এবং এর অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও শিল্প কারখানাসমূহ।

বর্তমানে যে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া চলছে তা এই আদিম সঞ্চয়নের আরেক পর্ব।

প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান বিরাষ্ট্রীয়করণ যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয় তবে ১৯৭২-এর রাষ্ট্রীয়করণকে কীভাবে মূল্যায়ন করা যায়? বাস্তবতা কি এরকম যে রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে? কিংবা আমরা কি সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের দিকে যাচ্ছি?

পুঁজিবাদের অধীনেও জাতীয়করণ হয় এটি আমরা পুরনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর (যেগুলো পুঁজিবাদের মডেল) দৃষ্টান্ত থেকেই জানি। তবে পুঁজিবাদের অধীনস্থ জাতীয়করণের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এক্ষেত্রে সেসব খাতই রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে থাকে যেগুলো মুনাফা সৃষ্টিযোগ্য নয়, হয় সেগুলো শূন্য মুনাফা খাত অথবা ভর্তুকিকৃত খাত এবং দ্বিতীয়ত এই রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রধান ভূমিকাই হচ্ছে বেসরকারি খাতকে সেবা করা। ব্যক্তি পুঁজির অধিক মুনাফার বৃদ্ধি, পুঁজির সংবর্ধন এবং তার অবাধ বিকাশের জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্র জনগণের করের অর্থে কিছু কিছু খাতকে ভর্তুকি দেয়। এগুলোর মধ্যে মূলধন শিল্প, গবেষণা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, অবকাঠামো ইত্যাদি থাকতে পারে (অবশ্য বলা বাহুল্য যে, এগুলোর কোন

কোনটি কখনো কখনো মুনাফা তৈরি করতে পারলে সেগুলোও ব্যক্তি মালিকানায় চলে আসে।)

অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে- সব ধরনের খাতই, মুনাফাযোগ্য খাতগুলো তো বটেই, এখানে সামাজিক মালিকানায় থাকে। দ্বিতীয়ত, এদের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে সামাজিক মালিকানাকে আরও ব্যাপক, গভীর ও জনগণের জন্যে নিজস্ব করে গড়ে তোলা। সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের জন্য সামগ্রিক অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতির উপাদানসমূহ, মূল্যবিধির কার্যকারিতা দূর করার কাজে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সামগ্রিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংস্থা, রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে স্পষ্ট নির্ধারক রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক খাতসমূহ এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে।

এই স্পষ্ট পার্থক্য মনে রেখেই আমরা বাংলাদেশের জাতীয়করণ এবং বিজাতীয়করণের প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করব। এখানে প্রাথমিক ধারণাটি হচ্ছে এই যে, ১৯৭২-এ বাংলাদেশের জাতীয়করণ যেহেতু ছিল বুর্জোয়া জাতীয়করণ, তা প্রথমে না হলেও অবশেষে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং বর্তমান জাতীয়করণের সামাজিক অর্থনৈতিক শর্তাবলি সৃষ্টিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, এই খাত ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ, সংবর্ধন, একচেটিয়া গোষ্ঠী সৃষ্টি, সম্পদ ও উৎপাদন যন্ত্রের উপর কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পেছনে সবচাইতে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এই ধারণার বাস্তব ভিত্তি অনুসন্ধান করব।

অর্থনীতিতে ব্যাংকের ভূমিকা

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যাংকের ভূমিকাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার বলে মনে করি। আধুনিক ব্যাংকের উদ্ভব এবং বিকাশ প্রত্যক্ষভাবে পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থনীতিতে বিস্তৃতভাবে ছড়ানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একীভূতকরণের মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য মূলধন গঠন, পুঁজির সঞ্চালন, পুঁজির সংবর্ধন, বৃহৎ পুঁজির মালিকদের জন্য সহজে আরো পুঁজি আয়ত্ত করবার সুযোগ সৃষ্টি, সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ এবং তার ক্ষুদ্রাংশ সুদের আকারে জনগণের মধ্যে বিতরণ এবং বৃহদাংশ পুঁজি সংবর্ধনে নিয়োজিত করা; পুঁজিপতিদের ঋণ দিয়ে তাদের বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা, যাতে তারা উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ করে ও তার একাংশ সুদ হিসেবে ব্যাংক প্রাপ্ত হয়, আর একটা

অংশ আবার জামানতকারীদের মধ্যে বিতরিত হয়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক পুঁজির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পুঁজিবাদ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে না, সুতরাং পুঁজির সঞ্চালনের মাধ্যমে ব্যাংকের ক্রিয়াকলাপও একটি দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, কিংবা ব্যাংক শুধুমাত্র একটি দেশের পুঁজি নিয়েই চলতে পারে না। বাংলাদেশের মতো দেশেও, বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী সেজন্যেই ব্যাংক পুঁজি খুব স্বাভাবিকভাবে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে, এবং সেভাবেই বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঞ্চালনের একটি একক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সে সময় শিল্পপতি ও ব্যাংক মালিকেরা হয়ে যায় অভিন্ন। যেমনটি এখন বাংলাদেশে হচ্ছে।

ব্যাংকের যে ভূমিকার কথা আমরা ওপরে আলোচনা করলাম, তা যে কোন পুঁজিবাদী (অবিকশিত, অনুন্নত, আধাবিকশিত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই) সমাজের জন্যই বাস্তব। তবে পুঁজিবাদের অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও আছে।[২]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও একই ভূমিকা পালন করলেও, যেহেতু শুধুমাত্র মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন সেগুলোর হয় না, সেহেতু তা কম মুনাফা অথচ অধিকতর সামাজিক গ্রহণযোগ্য খাতগুলোতেও গমন করতে পারে, ঝুঁকি নিতে পারে, সামাজিক অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হতে পারে, ক্ষুদ্র পুঁজির মালিকদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে, ধীরগতিতে দীর্ঘ মেয়াদে মুনাফাযোগ্য এলাকা অর্থাৎ প্রত্যন্ত এলাকায় শাখা খুলতে পারে, সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হতে পারে আবার খারাপ ঋণগ্রহীতাদেরও ঋণ দিতে পারে, সরকারের নীতি অনুযায়ী মুনাফা বা পরিশোধের সম্ভাবনা না থাকলেও ঋণ দিয়ে যেতে পারে ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যেগুলো কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ছিল সেগুলো এ কারণেই খুব দ্রুতগতিতে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত শাখা বিস্তার করেছে, কম মুনাফা খাতগুলোতে বিনিয়োগ করেছে, আবার হাজার হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী রেখেও প্রয়োজনীয় আইনগত উদ্যোগ গ্রহণে বিরত থেকেছে। তাদের এই ভূমিকা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যেমন অর্থসংস্থান নিশ্চিত করেছে, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুঁজি সম্মিলিত করে এসব ব্যাংক তা দিয়ে কোটিপতি সৃষ্টি করেছে, গ্রামাঞ্চলসহ সারাদেশ থেকে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পুঁজি সম্মিলিত করে শহরের কেন্দ্রীভূত বৃহৎ লুম্পেন পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

আমরা বাংলাদেশের বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়ার ধারা খেয়াল করলে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে দেখতে পারি যে, বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে মূলত ৭৩ থেকে, কিন্তু ব্যাংকের বিরাষ্ট্রীয়করণ শুরু হয়েছে অনেক পরে, '৮৩-তে। সময়ের এই ব্যবধান অর্থহীন কিংবা কিছু ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এর পেছনেও সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কারণ আছে। পরবর্তীতে আমরা এর উত্তর পাব।

৭২-এর জাতীয়করণের পরিপ্রেক্ষিত

১৯৭২ সালের জাতীয়করণ ছিল ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম চালিকা ১১ দফার একটি দাবির আংশিক বাস্তবায়ন। আংশিক এই কারণে যে, ঐ দাবিতে বিদেশি পুঁজিও জাতীয়করণ করার কথা বলা হয়েছিল। সিগারেট, চা, জুতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক পুঁজি ৭২-এর জাতীয়করণ নীতির আওতায় পড়েনি।

জাতীয়করণের দাবি সে সময় নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া সর্বজনস্বীকৃত। সে সময় পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন শিল্প কারখানা, ব্যাংক বীমার বৃহত্তর অংশ পরিত্যক্ত। জাতীয়করণ কর্মসূচি না নিলে সেগুলো ব্যক্তি মালিকানায় গ্রহণ করবার মতো কোনো পুঁজিপতি এদেশে ছিল না। সেটি করতে গেলে সরকারের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হতো, যা দেবার শক্তিও সে সময়কার সরকারের ছিল না।

জাতীয়করণ করবার পূর্ব পর্যন্ত এই দেশের শিল্পখাতে তৎকালীন শিল্প উন্নয়ন সংস্থার মালিকানা ছিল শতকরা ৩৪ ভাগ, পরিত্যক্ত ছিল শতকরা ৪৭ ভাগ, বাঙালি ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল শতকরা ১ ভাগ, বিদেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল শতকরা ১ ভাগ। ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ দেশে গঠিত ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ১০টিই ছিল পরিত্যক্ত, যার শাখা সংখ্যা ছিল ১১৭৫টি। জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যাংকগুলো মোট আমানতের শতকরা ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। অন্য দু'টি বাঙালি মালিকানাধীন ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করত শতকরা ১৭ দশমিক ৭ ভাগ আমানত। এছাড়া ছিল ৩টি বিদেশি ব্যাংক : গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, চার্টার্ড ব্যাংক এবং আমেরিকান এক্সপ্রেস। এরা নিয়ন্ত্রণ করত শতকরা ৮ দশমিক ৪ ভাগ আমানত।[৩]

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে জাতীয়করণের ঘোষণা থাকলেও বিদেশি পুঁজি জাতীয়করণের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে তেমন কোনো চাপ সৃষ্টি হয়নি। এগুলো বরাবরই জাতীয়করণের বাইরে ছিল।

জানা যায় যে, জাতীয়করণ বিষয়ে ঘোষণার আগে মন্ত্রিসভায় যথেষ্ট বিতর্ক হয়। বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৫ লাখ টাকা এবং তার বেশি মূল্যের

স্থায়ী পরিসম্পদ যেসব শিল্প, কারখানা, ব্যাংক, বীমার আছে সেগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে থাকবে। ২৬ শে মার্চ, ১৯৭২-এ ঘোষণা দেয়া হয়। এই ঘোষণা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত পরিত্যক্ত শিল্প কারখানাসহ বাংলাদেশের শতকরা ৯২ ভাগ শিল্প কারখানা পরিসম্পদ, ব্যাংক বীমা বাণিজ্যের বিপুল অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রধান ভিত্তি নির্মাণ করে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মধ্যে ছিল, পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজিপতিদের পরিত্যক্ত ১১১টি বৃহৎ শিল্প ইউনিট, বাঙালি মালিকানাধীন ৭৫টি পাট ও বস্ত্রকল, প্রাক্তন ই.পি.আই.ডি.সির মালিকানাধীন ৫৩টি বৃহৎ শিল্প ইউনিট, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ৪০০টি ক্ষুদ্র ইউনিট, বিদেশি ব্যাংক ছাড়া সকল ব্যাংক ও বীমা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য। বাঙালি মালিকানাধীন শিল্প ব্যাংক বীমার পুঁজি সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, ৬০ দশকে এখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শিল্পপতি সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার মধ্য দিয়েই এসব শিল্প গড়ে উঠেছিল। 'এই ধরনের সরকারি আনুকূল্যের ছত্রছায়ায় একজন বাঙালি যার কোন কাঁচা টাকা নেই অথচ উচ্চমহলের সঙ্গে ভালো মিল-মহব্বত আছে তার পক্ষে ২ কোটি টাকার সম্পত্তিসহ ২৫০টি তাঁতের একটি পাটকলের মালিক হওয়াও অসম্ভব ছিল না।'[৪]

বাঙালি মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ব্যাংক বীমা জাতীয়করণের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় বিতর্ক হয়। পরবর্তীকালে রফা হয় এভাবে যে, প্রাক্তন মালিকের জন্য ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করা হবে এবং এদেরকেই এসব শিল্প ব্যাংক, বীমা, পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হবে।

ছক-১

জাতীয়করণ পূর্ব সময়ে সম্পদের মালিকানা বিন্যাস শতাংশের পরিমাণ

	সম্পত্তির ধরন	বাঙালি	অবাঙালি পাকিস্তানি+ বিদেশি	রাষ্ট্রায়ত্ত
১.	আধুনিক শিল্পখাতে স্থায়ী পরিসম্পদ	১৮	৪৮	৩৪
২.	ব্যাংকের আমানত	১০	৮২	–
৩.	জীবন বীমা ব্যবসা	৩৩	৯০	–
৪.	পাট ব্যবসা (রপ্তানির অংশ)	৬৯/৭০	৩৭	৩০

উৎস : রেহমান সোবহান। *বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংকট*, পৃ. ১০৬

বাঙালি মালিকানাধীন দু'টি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তখাতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশিভাবে অনুভূত হয়েছিল এই কারণে যে, যুদ্ধের পর

এগুলোর কোন তরল সম্পদ ছিল না। সেই কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত না করলেও এগুলোর দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হতো।

আওয়ামী লীগ বৃহৎ বুর্জোয়াদের দল ছিল না। এদেশে সামরিক শাসন ও ৬০ দশকে আয়ুবী পৃষ্ঠপোষকতার ফলাফল হিসেবে যে হাতে গোনা কয়জন তুলনামূলকভাবে বড় পুঁজিপতির সৃষ্টি হয়েছিল তারা আয়ুবী সরকারের অনুগ্রহ বিস্তৃত হয়নি, তারা রাজনৈতিকভাবে প্রধানত সেই সরকারের সমর্থক ছিল। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ তৎকালীন রাজনৈতিক গতিপ্রবাহে নির্ধারক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং সেই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধির কারণে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই অংশ আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিতে থাকে; বড় আমলারও একই ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর এদের অধিকাংশ আবার পাকিস্তানি সরকারের অনুগত ও অংশীদারের ভূমিকায় ফিরে যায়। এসব কারণে এদের শিল্প কারখানা ব্যাংক জাতীয়করণ করতে আওয়ামী লীগের দলগত কোনো নৈতিক দায়বদ্ধতার শিকার হতে হয়নি; তবে শ্রেণীগত দায়বদ্ধতার কারণে এদেরকেই পরিচালকের ভূমিকায় নিয়োজিত করবার মত বিভিন্ন ধরনের ছাড় দেয়া হয়।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১-এর সর্বব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম যে সামাজিক মানসিক আবহাওয়া তৈরি করেছিল সেখানে সমাজতন্ত্রের একটি অঙ্গীকার ছিল অপরিহার্য। তাছাড়া আওয়ামী লীগের মধ্যে কেউ কেউ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কোন রকম ছাড় না দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এঁদের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকার জোরদারভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের ভাষ্যে পরিণত হয়। কিন্তু গ্রাম, শহর সর্বত্রই আওয়ামী লীগের সামগ্রিক গঠন সমাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তিই ছিল। এর নেতৃবৃন্দের ভূত, ভবিষ্যৎ নির্ভর করতো শ্রমিক-কৃষককে আরো বেশি শোষণ ও বঞ্চনার ওপর। আওয়ামী লীগের ক্ষুদ্র অংশ, খুব সম্ভবতঃ ইউটোপিয়ান, সমাজতন্ত্রীরা বেশি দিন টিকে থাকতে পারেন নি। এমনকি এদের অনেকে 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে' গঠিত বাকশালেও যোগ দিতে পারেননি।

শিল্প কারখানা জাতীয়করণের সঙ্গে 'সমাজতন্ত্র' সংযুক্ত করার কৃতিত্বের দাবিদার ছিল আর একটি দল, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। তাঁরা এই জাতীয়করণকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করেন এবং আওয়ামী লীগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করতে থাকেন। জাতীয়করণকৃত খাতের মাধ্যমে ব্যক্তিপুঁজি বিকাশের যে সক্রিয় তৎপরতা ক্ষমতাসীন দলের মধ্যেই সে সময় চলছিল, সর্বাত্মক সহযোগিতার কারণে তাকে যুক্তিযুক্ত করাও ছিল তাদের নীতি। অনুন্নত দেশে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অধনবাদী বিকাশের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তত্ত্বগত ভিত্তিই ছিল তাদের এই ভূমিকার মূল উৎস।

বিরাষ্ট্রীয়করণের সামাজিক অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত

যদিও বলা হয়ে থাকে যে, ১৯৭২ সালে ব্যাংক বীমা শিল্প কারখানা বাণিজ্য ইত্যাদি জাতীয়করণের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে ব্যক্তিপুঁজির বিকাশকে প্রতিহত করা, বলা হয় জাতীয়করণ বৃহৎ পুঁজিকে আঘাত করেই গড়ে উঠেছিল, কিন্তু বাস্তবে এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তাছাড়া বৃহৎ না হলেও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক পুঁজির যে বিতরণ এই দেশে ছিল তা যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় তার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার সচেষ্ট ছিল।[৫]

পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান প্রবণতাই হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়ায় পরিণত হওয়ার জন্য সব ধরনের সুযোগ গ্রহণ করা। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীগতভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত, পার্থক্য প্রধানত গুণগত নয়। এই শ্রেণীতে ব্যতিক্রম ক্ষুদ্র সচেতন একটি অংশ থাকে যারা নিজেদের শ্রেণীগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করে বৃহৎ বুর্জোয়ার প্রতি পেটি বুর্জোয়ার ঈর্ষাজনিত মনোভাবকে পরিণত করে বিপ্লবী চেতনায়।

আওয়ামী লীগ পেটি বুর্জোয়াদের সাধারণ ধারারই প্রতিনিধি ছিল। যে কারণে দলীয় ঐক্য, সংহতি ও শক্তি অটুট রাখবার জন্যে এবং শ্রেণীগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দলীয় কর্মীদের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যাদির পারমিট বিতরণ করতে হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-ব্যাংক বীমায় এদের প্রভাব ও আধিপত্যকে অনুমোদন করতে হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতে হয়েছে সমাজতন্ত্রের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়, কিন্তু অদক্ষ লোকদের; বেআইনি অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বাণিজ্য চলতে দিতে হয়েছে; এদের মাধ্যমেই লুটপাট কালোবাজারি ইত্যাদি তখন একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়। এসব কাজের মূলভিত্তি ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত খাত। এই খাত সমাজতন্ত্রাভিমুখী না হয়ে এভাবেই আদিম সঞ্চয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রধানত পরিত্যক্ত শিল্প ব্যাংক বীমা বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা ছাড়া অন্য কোনো খাতে 'সমাজতন্ত্রা'ভিমুখী কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি; ভূমি সংস্কার বলে যা করা হয়েছিল তা ছিল মূলত ১৯৫০-এর আইনকে পুনর্বহাল করা; ভূমি প্রশাসন আইনও পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে অসম্মতি, ক্ষমতাসীন দলের শ্রেণীগত চরিত্রে কোনো পরিবর্তন না আসা, সাম্রাজ্যবাদসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তির বিভিন্নমুখী চাপ ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এবং আদিম সঞ্চয়ের দুর্বার ক্রিয়া সব মিলিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পক্ষে সে সময় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। এই খাত খুবই নগ্ন এবং আদিম উপায়ে ব্যক্তি পুঁজি বিকাশের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে সিলিং বৃদ্ধিতে। জাতীয়করণ অধ্যাদেশ ঘোষণার সময় শিল্পখাতে সর্বোচ্চ সিলিং ধরা হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা। ১৯৭৪ সালের এর পরিমাণ দাঁড়িয়ে ৩ কোটি টাকায় করা হয়। অনেকে একে 'কৌশলগত প্রয়োজন' বললেও এর অর্থনৈতিক কারণ ছিল মুখ্যত এই যে, তখন আদিম সঞ্চায়নের মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের মতো অর্থনৈতিক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল; সে রকম ব্যক্তিপুঁজিপতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৫-এ সিলিং ১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। দ্রুতগতিতে দেশে তখন ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ ঘটছে।

পট পরিবর্তনের পূর্বে আরও কিছু ঘটনা ঘটে। প্রশাসনে যারা রাষ্ট্রদোহিতার কারণে চাকরি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল, তাদেরকে পুনর্বহাল করা হয়। এরা দক্ষভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালায়।[৬] বিপুল বিদেশি ঋণ গ্রহণ, বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সবুজ বাতি প্রদর্শন, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রতি আরও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে খুশি করবার নীতি ইত্যাদি দেশের অভ্যন্তরে তাদের সক্রিয় সমর্থকদের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অপরদিকে, ইত্তেফাকের মতো পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মাধ্যমে ব্যাপক লুটপাট তাদের প্রচারণা ও সক্রিয়তাকে সহায়তা করে। জনগণের মধ্যেও রাষ্ট্রায়ত্ত খাত এবং আওয়ামী লীগের 'ভয়াবহ সমাজতন্ত্রের' প্রতি ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, যাকে ব্যবহার করে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ।

ব্যক্তিপুঁজির বিকাশের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি সত্ত্বেও তার লোভী ও আরও দ্রুত বিকাশের পথে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ও আইন একসময়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শক্তির সংঘাতে এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয় ব্যক্তিপুঁজি বিকাশের পক্ষে। দুর্বল বাঁধ নির্মাণ করলে তাতে একসময় ফাটল ধরে এবং সে ফাটলকে উপলক্ষ করে যখন পুরো বাঁধ ভেঙে যায় তখন অর্গলমুক্ত স্রোতের মতো পানি সবকিছু ভাসিয়ে দিয়ে যায়। ১৯৭৫-এর নৃশংস পট পরিবর্তনে সে ঘটনাই ঘটে।

মুশতাক এবং জিয়া সরকার ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ, বিদেশি পুঁজির আগমন, বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন। এভাবে এতদিন পর্যন্ত নানাভাবে অর্জিত সম্পদের মালিকানা যাদের অবৈধ ছিল, তা বৈধ হয়। এরশাদের সামরিক জান্তা লুটপাটকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৭২-এ জাতীয়করণ হওয়ার পর থেকে বিস্তর লুটপাট, অদক্ষতা ও নানারকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যে খাতটি ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে ভালো ফল প্রদর্শন করে সেটি হচ্ছে ব্যাংক। অন্যদিকে, সম্পদ লুটপাট করে বৃহৎ পুঁজিপতির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মধ্যে এ খাতটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

১৯৭২ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো দ্রুত শাখা বিস্তার শুরু করে। এবং রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার ফলেই এগুলো গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়। গ্রাম পর্যন্ত প্রসারের ফলে প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একীভূত করা সম্ভব হয় ব্যাংকের পক্ষে; তাছাড়া আন্তর্জাতিক পুঁজিও এই ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়। যেগুলো একটি বিরাট তরল সম্পদ গঠন করে।

কালো টাকার মালিকদের স্বীকৃতি দিয়ে সিলিং বৃদ্ধির হার ১৯৭৪-এ শুরু হয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৭৪-এই ৪৬২টি শিল্প ইউনিট থেকে পুঁজি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ক্রেতা না পাওয়ায় মাত্র ৩৪টি ইউনিট থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়। বিশেষত ১৯৭৫ উত্তর সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি খাতের বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের আনুকূল্য, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান শুরু হয়। এগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে এদের নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় বিনিয়োগ, বিদেশ থেকে কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ আমদানি ইত্যাদি খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা করা। এই ঋণের ব্যবস্থা উঠতি পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক শক্তি আরও বৃদ্ধি করে এবং এই শক্তি আরও নতুন নতুন শিল্প কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের চাহিদা তৈরি করে। যার ফলে সিলিং উঠে যাবার পর বিরাষ্ট্রীয়করণের জোয়ার শুরু হয়। নব্য কোটিপতিরা নতুন শিল্প স্থাপনের চাইতে খুব সহজে প্রতিষ্ঠিত শিল্প পেয়ে যাওয়াতেই বেশি আগ্রহী।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার সঙ্গে সংযুক্তি, বিদেশি বাণিজ্যের ডিলার পারমিটধারী হওয়ার সুযোগ লাভ এবং সবশেষে আইনী উপায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মোটা টাকা হস্তগত করার সুযোগের মাধ্যমে এদেশে যে লুম্পেন কোটিপতিদের গোষ্ঠী তৈরি হয় তাদের 'সঙ্গত' লোভের চাহিদা পূরণের জন্যই শিল্প কারখানা পানির দামে তাদের কাছে বিক্রি করে দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রশ্ন আসে অনেক দেরীতে। বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া বেশ সংগঠিতভাবে শুরু হয় ১৯৭৬ থেকে। কিন্তু ১৯৮১ সালের আগে ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণের বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। প্রথম পূবালী এবং উত্তরা ব্যাংক প্রাক্তন মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার মাধ্যমে ব্যাংকের বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রশ্নটি প্রত্যক্ষভাবে সামনে আসে। বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদের এদেশীয় মুখপাত্ররা বেসরকারি খাতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি জোরেসোরে প্রচার করতে থাকে। বিশ্বব্যাংক আইএমএফ ১৯৭৪ সাল থেকে বেসরকারি খাতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দিয়ে দেবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করলেও নির্দিষ্টভাবে ব্যাংকের কথা তারা বলা শুরু করে ১৯৮১ সালের পর থেকে। ১৯৮৫- তে গঠিত হয়েছে 'রহিম কমিশন' যারা সোনালী ব্যাংক বাদে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার ব্যক্তিগত মালিকানায় দিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছেন।

১৯৮৪-৮৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শত শত কোটি টাকা কয়েকটি পরিবারের কাছে অনাদায়ী থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রতিবেদন সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। যারা ব্যাংকঋণ এভাবে অনাদায়ী রেখেছেন তাদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই তদন্তে দেখা গেছে, যে শিল্প কারখানার নামে তারা ঋণ নিয়েছেন সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই। দেশের মাত্র ৫টি ব্যবসায়িক গ্রুপ গড-ফাদারের মতো ব্যাংকগুলোকে ইচ্ছেমতো নিজেদের কাজে ব্যবহার করে। বাংলাদেশী ব্যাংকের বিদেশি শাখাগুলো থেকেও এরা ঋণ নিয়েছে। ব্যাংকের ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ সীমাহীন।

এদেরই বেশ কয়েকজন দু'টি বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ১৯৮২ সালে সিটি ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক লি.। তাছাড়া বিদেশিদের সঙ্গে যৌথভাবে এদেরই কয়েকজন প্রতিষ্ঠা করে আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লি. এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন আইএফআইসি। এক তথ্যে দেখা যায়, এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ৬টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাংকের ১৫ জন ডিরেক্টর নিজেদের বা তাদের ব্যবসার নামে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে ধার নিয়েছেন কয়েক শত কোটি টাকা। অথচ এই সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকের মোট মূলধনই হলো মাত্র ৪৮ কোটি টাকা[৭]; এদের কাছে শুধু শিল্প ব্যাংকের মেয়াদ উত্তীর্ণ পাওনা হচ্ছে ১৩১ কোটি টাকা[৮]।

বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংকগুলো যখন এদের কাছে কয়েক শত কোটি টাকা অনাদায়ী থাকায় অসুবিধার মধ্যে পতিত হয়েছে; যখন এগুলো নিয়ে বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে যখন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে আরও কোটি কোটি টাকা ঋণ নেবার সুযোগ নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবারের জন্যে সংকুচিত হয়ে গেছে, যখন ব্যাংকগুলোর পক্ষেই ঋণদান ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে আসছে, ঠিক সে সময়ই ব্যাপকভাবে এই ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে ব্যক্তিগত খাতে ছেড়ে দেবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে থাকাকালে বেসরকারি খাত অর্থাৎ উঠতি পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে যথাসম্ভব সার্ভিস দেয়া শেষ হওয়ার পর এসব ব্যাংকের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদকে হ্রাসকৃত মূল্যে হিসাব করে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া ব্যাংক ব্যবসায় খুব কম সময়ে বড় অঙ্কের মুনাফার সম্ভাবনাও তাদেরকে এদিকে তাড়িত করেছে।

সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের উদাত্ত ঘোষণা ছিল, একটি মাত্র ব্যাংক বাদে আর সব ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত খাতে ছেড়ে দেয়া হবে। সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এরশাদ থেকে শুরু করে লুণ্ঠন কোটিপতিদের প্রধান পাহারাদার সরকারি সকল মহল থেকে একটি কথাই প্রচার করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের লোকসান বহন করা সরকার এবং জনগণের জন্য ক্ষতিকর।

অথচ ব্যাংকগুলো কখনই লোকসান দেয়নি, উপরন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মুনাফা থেকে সরকারের রাজস্ব আয় যেভাবে সংগঠিত হতো, ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে গেলে তার সম্ভাবনা প্রায় থাকবেই না বলা চলে। একইসঙ্গে জনগণের অর্থ অনাদায়ী হাজার হাজার কোটি টাকা আদায় করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ বাস্তবতার পরও সরকার থেকে অর্থ যোগান দিয়ে বাকিতে, প্রকৃত মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ মূল্যে, এসব ব্যাংক চিহ্নিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।[৯]

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কার্যক্রম

১৯৭২-এ রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার সময়ে সারা দেশে এই ব্যাংকগুলোর মোট শাখার সংখ্যা ছিল ১১৬৯টি। ১৯৮৫-র প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই শাখাগুলোর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০০০-এ। শাখার এই বিস্তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটেছে গ্রামাঞ্চলে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বলেই কম মুনাফার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এগুলোর শাখা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত গ্রামে শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭৭৫ ভাগ, পক্ষান্তরে শহরের এই হার হচ্ছে শতকরা ২১০ ভাগ। বর্তমানে গ্রাম ও শহরের শাখাগুলোর অনুপাত ২ : ১। গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের বিস্তারের যে ভূমিকা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে দেখা গেছে তা যে বেসরকারি খাতে দেখা যাবে না, তা নিশ্চিত। ব্যক্তি মালিকানাধীন যে কয়টি ব্যাংক এখন কাজ করছে, সেগুলো শুধু মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের এলাকা বলে নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রাম ছাড়া অন্য কোন গ্রামের দিকে শাখা করেনি, সে সম্ভাবনাও নেই।

১৯৭২-এ বাণিজ্যিক ব্যাংকে মোট আমানত ছিল ৭০২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা, ১৯৮৪ তে তার পরিমাণ হচ্ছে ৬৯০২ কোটি ২৪ লাখ টাকা; বৃদ্ধির হার শতকরা ৮৮২ ভাগ। তবে ১৯৭২-৭৩-কে সূচক ধরে এই আমানতকে জাতীয় ডিফ্লেটরের মাধ্যমে প্রকৃত আমানত বের করলে অবশ্য এই হার অনেক কমে যায়, সেক্ষেত্রে প্রকৃত আমানত ১৯৮৩-৮৪ সালে দাঁড়ায় ১৬৯১ কোটি ৭২ লাখ টাকা; প্রবৃদ্ধির হার ৪৩ দশমিক ৪০। ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধির হার আমানতের হারের চাইতেও বেশি। ১৯৭২-৭৩ এ মোট অগ্রিমের অঙ্ক ছিল ৫৪৪ কোটি ২৫ লাখ টাকা, ১৯৮৪-৮৫-তে এসে তা দাঁড়ায় ৬৪৩৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১০৮২ ভাগ। প্রকৃত হার অবশ্য শতকরা ১৯০ ভাগ। এই ঋণের একটি বড় অংশ গেছে কয়েকটি পরিবারের হাতে। এই টাকা অনুৎপাদনশীল খাতেই বিনিয়োজিত হয়েছে বেশি। মোট ঋণের শতকরা ৪০ ভাগ দেয়া হয়েছে ব্যবসা খাতে। এর পরিমাণ হচ্ছে ১৭৯৬ কোটি টাকা।[১০] শিল্প এবং কৃষিখাতের নামে গৃহীত ঋণেরও (শতকরা ৪২ ভাগ) একটি বড় অংশ আবার ব্যবসাতেই বিনিয়োজিত হয়েছে, যেহেতু ব্যবসায় মুনাফার হার এবং নিরাপত্তা বেশি।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো যেহেতু শুধুমাত্র মুনাফার লক্ষ্য দ্বারাই পরিচালিত হয় না, সেহেতু সরকারি নীতি অনুযায়ী এসব ব্যাংক দুর্বল কিছু খাতেও ঋণ দিয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে। তাছাড়া এই ঋণদান প্রক্রিয়ার যে দুর্নীতি তার দ্বারাও এজেন্সিভোগী কিছু কর্মচারীসহ অনেকেই লাভবান হয়েছে। বর্তমানে দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয় যেভাবে হ্রাস পেয়েছে তাতে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত হিসেবে টিকে থাকার জন্য অনেকেই কোন না কোনভাবে ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর তরল পুঁজি এক্ষেত্রে দেশের জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট আয়ভোগীদের একটি অংশকে সামগ্রিক পতনের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত শাখা বিস্তারে দ্রুত বিকাশের ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুনাফাকে সর্বোচ্চ করবার জন্য নিম্নতম কর্মসংস্থানে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর যে প্রবণতা থাকে, তা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে অপেক্ষাকৃত কম থাকার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উদ্বৃত্ত বন্টন

১৯৭২ সালে দেশের সকল ব্যাংক বীমা শিল্পকারখানার সিংহভাগ নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত গঠিত হলেও এই খাতের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং সামগ্রিক বন্টন ব্যবস্থার কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। এই পূর্বপ্রস্তুতি না থাকা অবস্থায় যারা প্রধানত লাভবান হয় তারা হচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী এবং এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত লুটেরা ব্যক্তিবর্গ।

সে সময় দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত তার পণ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণের জন্য যথেষ্ট মাত্রায় নির্ভরশীল ছিল ডিলার, এজেন্সিধারীদের ওপর—যারা ছিল আবার প্রধানত ক্ষমতাসীন দলের আশ্রয়পুষ্ট। আমদানিকৃত কিংবা দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের দাম প্রথম দিকে বাজার দামের চাইতেও কম দামে নির্ধারণ করা হয়, এর ফলে এসব পণ্যের বিক্রয় মূল্য হিসেবে যা ফেরত আসে তাতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের লোকসানের অঙ্ক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায় যে, মধ্যস্বত্বভোগীরা সেসব পণ্য বাজার দামেই বিক্রয় করে মাঝখানের অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে স্ফীত হতে থাকে।[১১] এতে করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত এবং ভোক্তা ও প্রত্যক্ষ উৎপাদক দুপক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হন, লাভবান হন মাঝখানের ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রভাবশালী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সক্রিয় সরকারি আমলা মন্ত্রিবর্গ। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের একটি অংশ সরকার পেলেও ব্যাংকের মোট সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ

আত্মসাৎ করেছে এবং করছে লুটেরা পুঁজিপতিরা, যাদের কোটিপতি হওয়ার প্রধান ভিত্তিই হচ্ছে যোগাযোগ এবং চুক্তি।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের কার্যক্রমের শুরুতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, এর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারীদের আরও বেশি করে সংযুক্ত করার কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশীদারিত্ব থাকবে ইত্যাদি। কিন্তু এটি তিনি যে বলার জন্যেই বলেছিলেন, তা বোঝা যায় পরবর্তীকালে এ ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণের পরিবর্তে শ্রমিক-কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করায় তাঁর সরকারকে উদ্যোগী থাকতে দেখে।

উদ্বৃত্ত লুটপাটে সমাজের উঠতি পুঁজিপতিদের ক্ষ্যাপা সক্রিয়তা ও সাফল্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রকৃত আয়ও কমে যায়, অংশীদারিত্ব তো দূরের কথা। সে জন্যই 'প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত সংযোজিত মূল্য এবং উৎপাদন মূল্য উভয় বিচারেই শ্রমিক-কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। সম্ভবত এই প্রাথমিক ফলটুকু হচ্ছে জাতীয়করণ নীতির প্রথম দিককার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এরপর থেকে সত্যি সত্যিই শ্রমিক-কর্মচারীদের অবস্থার স্পষ্ট অবনতি পরিলক্ষিত হয়। বর্ধিত উৎপাদন খরচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দাম না বাড়ানোর ফলে একদিকে যেমন ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত ঘাটতিজনিত মুনাফাটা পকেটস্থ করে তেমনি অন্যদিকে ক্ষতির বোঝাটা গিয়ে পড়ল শ্রমিক-কর্মচারীদের ঘাড়ে।'[১২]

যদিও জাতীয়করণ করবার সময় থেকে সরকারি মহল তুমুলভাবে সমাজতন্ত্রের কথা বলছিল তবুও দেখা গেল শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবিত্ত কর্মচারীরা দ্রুত তাদের অংশীদারিত্ব হারাচ্ছেন, অন্যদিকে শিল্প ব্যাংক বীমা বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে থাকা সত্ত্বেও শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে বণিক পুঁজির।[১৩] এই লুটেরা স্ফীতির কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করল রাষ্ট্রায়ত্ত খাত। এই খাত সম্পর্কে জনমনে অনাস্থা সৃষ্টি হলো। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে রক্ষা ও তার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় জনসমর্থন এবং অর্থনৈতিক শক্তি হ্রাস পেল, অন্যদিকে নব্য কোটিপতিরা ক্রমেই সময় ও শ্রমের তুলনায় অত্যধিক সম্পদের মালিকানা লাভ করে সৃষ্টি করল একচেটিয়া অর্থনৈতিক বলয়। তাদের চাহিদার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো অর্থনীতিতে। ব্যক্তিপুঁজির বিকাশকে খর্ব করবার পরিবর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ব্যবহৃত হলো ব্যক্তিপুঁজির বিকাশকে ত্বরান্বিত করায়। এই একচেটিয়া গোষ্ঠীর চাহিদার আধিপত্যই পরবর্তীকালে বিরাষ্ট্রীয়করণের ভিত্তি তৈরি করল।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রবল ও ধারাবাহিক সমর্থক রেহমান সোবহানও এসত্য উচ্চারণে দ্বিধা করেননি যে... 'শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের প্রকৃত মজুরির অবনতি রোধে জাতীয়করণ পরবর্তী পর্যায়ে সফল হয়নি। বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণী তাদের সকল জঙ্গিত্ব এবং প্রাথমিক রাজনৈতিক শক্তি সত্ত্বেও তাদের জীবনযাত্রার মান

অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়নি। এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের হাতে উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকেও তারা প্রতিহত করতে পারে নি। এ থেকে মনে হয় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রসার সবসময়ই শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি ঘটায় না। শুধু এইটুকু বড়জোর বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা চূড়ান্ত এবং আপেক্ষিক উভয় দিক থেকেই আরো নিম্নগামী হয়, যেহেতু সেই ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তের সিংহভাগ অবধারিতভাবে ব্যক্তিগত পকেটে চলে যায়।'[১৪]

বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শ্রমিক-কর্মচারীরা ব্যাপক বিরাষ্ট্রীয়করণের ফলে আজ দ্বিতীয় এবং অধিকতর অনিশ্চিত অবস্থায় পতিত হয়েছেন। মজুরি এবং আয়ের ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে; চাকরি ছাঁটাইয়ের অনিশ্চয়তাই খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। যেসব শিল্প কারখানা, ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে, তার সর্বত্রই সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে, ছাঁটাই শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাত এবং সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকা

১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়ার পর, সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে যারা জাতীয়করণ কর্মসূচিসহ আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিকে সমর্থন করেন তারা হচ্ছেন সিপিবিসহ মস্কোপন্থি কয়েকটি বামপন্থি দল। আওয়ামী লীগের জাতীয়করণ কর্মসূচি এবং মুখে হলেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় সিপিবি তাকে সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ পুঁজিবিরোধী জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি শক্তি হিসেবে ধরে নিয়েছিল এবং স্ট্যালিন উত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি প্রচারিত অনুন্নত দেশে অধনবাদী বিকাশ এবং শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এর তত্ত্বগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে, এ ধারণা অনুযায়ী সক্রিয় ভূমিকা রাখছিল।

কিন্তু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের শ্রেণীচরিত্র, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশকে ক্রমশই ঘনিষ্ঠ করছিল। বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রভাবও দিনে দিনে বাড়ছিল; দেশের অভ্যন্তরে '৭১-এর চিহ্নিত শত্রুদের ক্ষমা প্রদর্শন, তাদের অনেককে সমাজে ও প্রশাসনে পুনর্বাসন ইত্যাদি প্রক্রিয়াও সে সময়েই শুরু হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের তুলনায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের আয়তনও বাড়ছিল। দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অস্থিরতা, ত্রাস, নৈরাজ্য ইত্যাদি সবকিছু মিলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আওয়ামী লীগের পক্ষে 'গণতান্ত্রিক' মুখোশ পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জারি হয়েছিল জরুরি অবস্থা, বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিকাশ, তার আধিপত্য বৃদ্ধি, ব্যক্তির হাতে কালো পুঁজির অবাধ সঞ্চয়ন যে

অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এর সঙ্গে আওয়ামী লীগের শাসনমালের ওপর জনগণের অশ্রদ্ধা ও বিক্ষোভ সম্মিলিতভাবে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তাতে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা বৃহৎ পুঁজির শক্তিসমূহের পক্ষে রাজনৈতিক যন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পূর্ণভাবে দখল করা খুব সহজ হয়ে ওঠে এবং তার ফলেই ঘটে '৭৫-এর পটপরিবর্তন।

সিপিবি যখন আওয়ামী লীগকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে সে সময় যারা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত লুটপাট, শোষণ, ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন তাদের অনেকেই আবার জাতীয়করণ কর্মসূচি সম্পর্কেও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সক্রিয় ভূমিকা নিতে সক্ষম হননি। তার ফলে কর্মসূচি হিসেবে জাতীয়করণ কর্মসূচি একটি অগ্রসর কর্মসূচি হিসেবে তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট সমর্থন পায় নি।

বর্তমানে বিরাষ্ট্রীয়করণের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা কোন সুনির্দিষ্ট ভিত্তি থেকে কথা বলবো সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। কেননা আমরা যদি মনে করি, ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ যে জাতীয়করণ করেছিল সেটা রাজনৈতিকভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে উপযোগী ছিল, তাহলে আমাদের দাবি হবে একটাই–রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে পুনরায় তার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। আর যদি মনে করি যেহেতু বুর্জোয়া পার্টি জাতীয়করণ করেছিল সুতরাং এই কর্মসূচি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, তা হলে আমাদের উচিত হবে নীরবে অথবা সরবে বিরাষ্ট্রীয়করণকে সমর্থন করা। আর যদি সমাজতন্ত্রী হিসেবে আমাদের ভিন্ন কোন ভিত্তি থাকে সেটাও পরিষ্কার করতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অধনবাদী বিকাশ তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের প্রথম অবস্থানেই যেতে হয়। কিন্তু দেখা গেছে, শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও যেমন মিশর, ভারত, ইথিওপিয়া, সুদান, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশে কথিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুর্জোয়া শক্তির (বর্তমান অবস্থায় বুর্জোয়াদের কোনো অংশের পক্ষেই শ্রেণীগতভাবে একটানা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করা সম্ভব-এ প্রমাণ পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি) নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে বিপুল পরিমাণ সহযোগিতা দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে হয় নেতৃত্বের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের রদবদল ঘটেছে, নয়তো তাদের নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। কোন না কোনভাবে ব্যক্তিপুঁজির বিকাশের কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ব্যবহৃত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত শক্তিশালী হওয়ার পর তা ব্যক্তিগত খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

দ্বিতীয় যে ধারা তা বিলোপবাদ-নৈরাজ্যবাদী ধারা, যা কোন না কোনভাবে লুটেরা শোষকদের এবং সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করবার শামিল। এই ধারায় সংযুক্ত অনেকে রুশ ভারত আওয়ামী লীগ বিরোধিতার ধুয়া তুলে সামরিক জান্তার নির্লজ্জ দালালে পরিণত হয়েছে, আবার অনেকে সবকিছুই ভুল করেছি বলে নিষ্ক্রিয় অবস্থানে চলে গেছে। এই অবস্থায় সমাজতন্ত্রীরা কী করতে পারে?

স্পষ্টতই বাংলাদেশে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামরিক শাসনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। শুধু বিরাষ্ট্রীয়করণ নয়, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল সকল পদক্ষেপের সঙ্গেই সামরিক শাসনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। বুর্জোয়া অর্থনীতি ও রাজনীতি যখন সংকটে পতিত হয় তখন তার সর্বশেষ রক্ষাকবচ, সবচেয়ে সংগঠিত অংশ সামরিক বাহিনী এই ব্যবস্থাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে। বুর্জোয়া ব্যবস্থা যতদিন গণতান্ত্রিক অধিকার বলবৎ রেখে চলতে পারে, ততদিন এই অবস্থা আসে না। এই অবস্থার সমাপ্তি ঘটলে আবরণ খসে পড়ে। দমননীতি গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মাধ্যমে এই পতনোম্মুখ অনিশ্চয়তার শিকার বুর্জোয়া শ্রেণীকে রক্ষা করবার জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে সামরিক বাহিনী। কিন্তু তাতে বুর্জোয়া শ্রেণীর অনিশ্চয়তার স্থায়ী কোন সমাধান হয় না।

বাংলাদেশের সামরিক-বেসামরিক বুর্জোয়া শ্রেণী এই অনিশ্চয়তার কারণেই অস্থির, অসংযমী এবং লুটপাটে ক্ষিপ্র। তাদের ক্ষিপ্র লুটপাটের আরও অনেক শিকারের একটি হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত।

বিরাষ্ট্রীয়করণের পক্ষে সরকার যত ধরনের যুক্তি দেয় তার বেশিরভাগই যে ভুয়া কিংবা প্রতারণামূলক এ ব্যাপারে সকলেই নিঃসন্দেহ, এমনকি সরকার নিজেও। নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যেও সবক্ষেত্রে মুনাফাকেন্দ্রিক তৎপরতা এই অর্থনীতিতে উপযোগী নয়। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে পরিচালনা করার প্রধান শক্তি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক শাসন।

একটি কথা এখানে বিশেষভাবে বলে রাখা দরকার যে, চলতি বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করার সময় বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ সংকটের সঙ্গে তাকে সম্পর্কিত করে বিশ্লেষণ না করলে মনে হবে যে, এই শ্রেণীর অন্য কোনো অংশ আবার রাষ্ট্রায়ত্ত খাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক কিংবা সক্ষম। সিপিবির তত্ত্বগত অবস্থান তাই বলে। যা একেবারেই অবাস্তব। কেননা ক্ষমতাবহির্ভূত বুর্জোয়ারাও একইভাবে এর দ্বারা উপকৃত ও স্ফীত হচ্ছে– যে কারণে ২১ মে'র চুক্তিতে তারা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করেছে। বেসরকারি খাতে ব্যাংক বীমা শিল্পকারখানার মালিকানায় তাদের অংশও কম নয়, এমনকি যারা একসময় রাষ্ট্রায়ত্ত খাত প্রতিষ্ঠা করেছিল তারাও এই শ্রেণীর একটি অংশ। এই কারণে ১৯৭২-এ যে জাতীয়করণ হয়েছিল ততটুকু করাও ভবিষ্যতে এদের কারও পক্ষে আর সম্ভব নয়। এখন এ ধরনের উদ্যোগ নিতে পারবে শুধু বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তি। বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ থেকে সামগ্রিকভাবেই এর বিরোধিতা সৃষ্টি হবে, কেননা বৃহৎ বুর্জোয়ারা যেখানে '৭২-এ অনুপস্থিত ছিল সেখানে তারা এখন যথেষ্ট সংগঠিত।

ভবিষ্যতের রাষ্ট্রায়ত্ত খাত হবে তাই আরও অগ্রসর উপাদানে সমৃদ্ধ। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বে এই খাত সমাজতন্ত্র অগ্রসর করে নেয়ার অন্যতম শক্তি হিসেবে দাঁড়াবে, যে শক্তি পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যদুস্ত করবে। আমাদের তাই বর্তমান বিরাষ্ট্রীয়করণের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের চিত্র জনগণের সামনে, শ্রমিক-কর্মচারীদের সামনে স্বচ্ছ করতে হবে। পেছন দিকে ফিরে যাওয়ার প্রচার হবে প্রতারণার শামিল, তাই বিরাষ্ট্রীয়করণ বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনকে সংযুক্ত করে এগিয়ে নিতে হবে।

ছক-২ : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মুনাফা (কোটি টাকা)

বছর	নিট মুনাফা
১৯৭২	০.৬৩
১৯৭৩	০.৩৮
১৯৭৪	৬.৪১
১৯৭৫	১০.৯৯
১৯৭৬	৮.১০
১৯৭৭	১০.৮২
১৯৭৮	৯.৯০
১৯৭৯	১৪.১৩
১৯৮০	১৩.৩৪
১৯৮১	৮.৭৬
১৯৮২	২৬.১৯
১৯৮৩	৩২.১৬

সূত্র : ইকনমিক ট্রেন্ডস, বাংলাদেশ ব্যাংক, জুন-১৯৮৫।

ছক-৩ : বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর সংস্থাসমূহের নিট মুনাফা।

সেক্টর	সংস্থা	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৯-৮০	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩
১.	বিজেএমসি	-৩৩.৪০	১০৬.২০	-৬৫.৫০	২৩.১০
২.	বিটিএমসি	২৩.৬০	-৩৫.১০	-৬৮.১০	১১.০০
৩.	বিএসএফআইসি	৬.০০	৪.০০	৪৬.৯০	৪৪.৫০
৪.	বিএসইসি	৪.৩০	১৪.৭০	-১২.০০	-২৬.৬০
৫.	বিসিআইসি	-০.৪০	-২.৩০	৭.৯০	৩৯.৬০
৬.	বিএফআইডিসি	০.৪০	.১০	১.২০	৩.৩০

১৯৮২-৮৩-এর হিসাব থেকে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত পাট ও বস্ত্রকলগুলো বাদ দেয়া হয়েছে।

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংক দলিল, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪।

ছক-৪ : বিভিন্ন খাতে দেয়া ঋণের তুলনামূলক চিত্র (৩১.৯.৮৪ পর্যন্ত)।
(শতকরা হার)

অর্থনৈতিক কাজ	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক	ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক
১. কৃষি, মৎস্য ও বন	১৯.৮৭	১.১১
২. খনি	০.৫০	—
৩. শিল্প (চলতি অর্থসংস্থান বাদে)	২২.৩০	১৯.৪০
৪. নির্মাণ	২.৬৬	৩.৫২
৫. বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অন্যান্য	০.৫৯	০.৩১
৬. পরিবহন, গুদাম এবং যোগাযোগ	২.১৬	১.৪১
৭. ব্যবসা-বাণিজ্য	৩৯.৮৭	৭০.৮২
৮. বিভিন্ন অর্থকারী প্রতিষ্ঠান	০.২৮	০.০৯
৯. বিভিন্ন চলতি অর্থসংস্থান	২.৭৮	২.২৩
১০. বিভিন্নমুখী সেবা	৮.৯৪	১.১০

সূত্র : শিডিউলড্ ব্যাংকস স্ট্যাটিসটিকস, বাংলাদেশ ব্যাংক, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৪।

পাদটীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আছে, এসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে বিক্রি করে দেয়া অথবা প্রাক্তন মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া অথবা উল্লেখযোগ্য অংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা।

২. অনেক বিশেষজ্ঞ মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেও এই পার্থক্যকে মৌলিক বলে ধরে নেন। প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য তার মৌলিক ঐক্যের অধীনস্ত। মৌলিক ঐক্যের অধীনস্ত বলেই পুঁজিবাদের অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোই ব্যক্তিমালিকানার বিকাশে সহায়ক হয়।

৩. দেখুন রেহমান সোবহান মুজফফর আহমদ : *পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ইন এন ইন্টারমিডিয়েট রিজিম*, বি আই ডি এস, ১৯৭৬।

৪. রেহমান সোবহান, *বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট*, ঢাকা, ১৯৮২ পৃ. ৮৩

৫. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো জাতীয়করণের ব্যাপারে সরকারি কোন উদ্যোগ বা আগ্রহ না দেখে বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানির শ্রমিক কর্মচারীরা নিজেরাই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে প্রশাসন দখলের চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগ সরকার সে সময় বিদেশি পুঁজির নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
– বিটিসি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার, ডিসেম্বর, ১৯৮১

৬. ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকা নাম প্রকাশ করে এবং না-করে উচ্চপর্যায়ের কয়েকজন আমলার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। সেখানে তাদের কেউ কেউ স্পষ্ট করেই বলেছেন, কীভাবে তারা সে সময়কার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেছেন।

৭. একতা, ১৩ এপ্রিল, ১৯৮৪

৮. বিচিত্রা, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

৯. বিভিন্ন হিসাব থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প কলকারখানাগুলোর সিংহভাগ এখন কোনরকম লোকসান দিচ্ছে না। বিস্তর সুবিধাভোগের সুযোগ থাকার পরও এই খাত প্রতি বছর প্রচুর অর্থ সরকারকে দিচ্ছে।

সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন যে কারও বোঝার কথা যে, এই খাত যত বেশি হারে বিরাষ্ট্রীয়করণ হবে, সরকারের রাজস্ব আয়ও তত বেশি হারে কমবে। কেননা বিরাষ্ট্রীয়করণ করতে গিয়ে সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে, বিক্রি করে পুরো টাকাও পাচ্ছে না। লুটপাটের পরও প্রাপ্ত মুনাফার পুরো অংশ যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল সেখানে তার একটি অংশও কর হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কেননা লাভজনক শিল্পকারখানা ব্যক্তিমালিকানায় দেওয়ার পর থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এগুলোতে লোকসান দেখাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে লাভ-লোকসান এখানে মূল যুক্তি নয়। এদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর অসংযমী ব্যাপক লুটপাটকে বৈধকরণ করবার জন্যই এই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। সামরিক শাসনের দমনমূলক ব্যবস্থার উৎস এখানেই।

১০. এসব তথ্যের জন্য দেখুন বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ বুলেটিন, এপ্রিল, ১৯৮৫। শিডিউল্ড ব্যাংকস স্ট্যাটিসটিক্স, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ইকনমিকস ট্রেন্ডস, মার্চ, ১৯৮৫।

১১. এই বছর পাটের দাম সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা খেয়াল করলে অভিন্ন প্রক্রিয়া দেখা যাবে। প্রথমে পাটের কোনো ন্যূনতম দাম ধরা হয়নি। যেখানে পাটের উৎপাদন ব্যয় মণপ্রতি প্রায় ৩০০ টাকা, সেখানে ফড়িয়ারা বাজারের ওপর আধিপত্য এবং বিধিনিষেধের অনুপস্থিতির সুযোগে উৎপাদকের কাছ থেকে ৫০ টাকা মণ দরেও পাট কিনেছে। যখন পাটচাষীদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীদের কাছে পাট চলে এসেছে তখন সরকার পাটের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ করেছে ২০০ টাকা। সরকার নির্ধারিত এ ন্যূনতম দামে এখন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোকে পাট কিনতে হচ্ছে, যে পাট সরবরাহ করবে পাট ব্যবসায়ীরা, উৎপাদকরা নয়।

১২. রেহমান সোবহান-*বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট*, পৃ. ১৩০।

১৩. এদেশের বণিক পুঁজির শ্রীবৃদ্ধির তাত্ত্বিক এবং তথ্যগত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন ডা. সইফ-উদ-দাহার। ১৯৭৪-এ প্রকাশিত *সংস্কৃতি* এবং সে সময়ের সাপ্তাহিক '*হলিডে*'র কয়েকটি সংখ্যায় তাঁর লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

১৪. রেহমান সোবহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, নভেম্বর ১৯৮৫। *সংস্কৃতি*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬।

বাজেটের রাজনৈতিক অর্থনীতি

প্রতি বছরই বাজেট ঘোষণার পর বাজেট সম্পর্কিত আলোচনা-সমালোচনা হয়। অনেক সংশোধনী, সুপারিশ উপস্থিত হয়। আমি এখানে এই বাজেটের সামাজিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থিত করছি।

এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, ঘোষিত বাজেট অনুযায়ীই অর্থনীতি চলবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এ সত্যটুকু উপলব্ধি করি। যেসব দ্রব্যের ওপর বাজেটে কর হ্রাস করা হয় সেগুলোর দাম কমে না, যেগুলোর ওপর যে হারে কর বৃদ্ধি করা হয় সেগুলোর দাম তার চাইতে অনেক বেশি বেড়ে যায়। জাতীয় শিল্প সংরক্ষণের জন্যে প্রকাশ্যে ঘোষিত আমদানি নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চাপে গোপনে বাতিল হয়। বিভিন্ন বরাদ্দ মূল বাজেট থেকে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যায়। শিল্প স্থাপনের জন্যে বছরের পর বছর ক্রমবর্ধমান সুবিধা একচেটিয়া বণিক গোষ্ঠীর বিত্তের কেন্দ্রীভবন ও সম্পদ পাচারে সাহায্য করে।

স্বাধীনতার পর গত ১৪ বছরে মোট ১৪টি বাজেট প্রণীত হয়েছে। সংসদের ভিতরে কিংবা বাইরে নির্বাচিত সরকার কিংবা সামরিক জান্তা এসব বাজেট ঘোষণা করেছে। সরকার ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও অর্থনীতির গতিতে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সবগুলো বাজেটের মধ্যেই একটা ঐক্যসূত্র আছে। প্রতিটি বাজেটই বিশেষণের বাগাড়ম্বর নিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হলেও নীট ফলাফলে সেগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়নি।

১৯৭২-এ 'পুনর্গঠন ও পুনঃনির্মাণ বাজেট' দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপর ক্রমান্বয়ে 'উন্নয়ন ও পুনঃনির্মাণ বাজেট', 'সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের অভিমুখে বাজেট', 'দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতিরোধ বাজেট', 'গ্রাম-বাংলার অবহেলিত মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন বাজেট,' 'গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নতির বাজেট', 'সুষম বাজেট', 'আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপমূলক বাজেট', 'কৃচ্ছতা ও শৃঙ্খলার বাজেট', 'বাস্তবায়নের বাজেট' ইত্যাদি শিরোনামে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী, উপদেষ্টা বা সামরিক আইন প্রশাসক যারা আগে বাজেট ঘোষণা করেছেন তাঁরা তাঁদের বাগাড়ম্বরের ফলাফল দেখেও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত না; পূর্ববর্তী বাজেটের ব্যাপারে তাঁরাও সমালোচনামুখর থেকে নিজেদের পুনর্বাসিত করার জন্যে সদা সচেষ্ট।

এই বছরের বাজেট

১৯৮৬-৮৭ সালের বাজেটে ৩৭২ কোটি টাকার নতুন কর ধার্যসহ রাজস্ব খাতে ৪৪৬৮ কোটি টাকা আয় ও ৩৭৪০ কোটি টাকা ব্যয় ধরে ৭২৮ কোটি টাকা রাজস্ব উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে।

এ বছরে উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ হচ্ছে ৪৭৬৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে তথাকথিত বিদেশি সাহায্যের পরিমাণ ৩৭৭৯ কোটি টাকা। রাজস্ব আয়ের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ও আবগারি শুল্ক থেকে আয় হবে ২৩৪৮ কোটি টাকা; যার প্রায় ৬০ শতাংশ আসবে বিদেশি সাহায্য নির্ভর আমদানি থেকে।

যেসব দ্রব্য ও সার্ভিসের চার্জ, কর বা শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : লবণ, খাবার তেল, নারকেল তেল, মশার কয়েল, মধ্যমানের সিগারেট, বিদেশ ভ্রমণ, সিনেমার ক্যাপাসিটি ট্যাক্স, স্থাবর সম্পদ, মোটরযানসংক্রান্ত ফিস, গ্যাসের মূল্য, টেলিফোন চার্জ। খাদ্যসহ অন্যান্য খাতে ভর্তুকি ১৯০ কোটি টাকা থেকে ১২১ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। যেসব দ্রব্য ও সার্ভিসের চার্জ, কর বা শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে সেগুলো হলো : ভালো সিগারেট, ভিসিআর, সুতা, কাঁচা তামাক, কাঁচা তুলা, কাপড়, বিপি শীট, বাস, ট্রাক ইত্যাদি।

এই বছর বাজেটে প্রায় প্রতি বছরের নিয়ম অনুযায়ী বিদেশি সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বছর মোট বিদেশি সাহায্য ৩৭৭৯ কোটি টাকার মধ্যে কঠোর শর্তযুক্ত প্রকল্প সাহায্য ২৩৩১ কোটি টাকা। এরপরই আছে পণ্য সাহায্য ১৩৩৫ কোটি টাকা এবং খাদ্য সাহায্য ১১৩ কোটি টাকা। অর্থ উপদেষ্টার ভাষায়, 'সাহায্যের পরিমাণ ও চরিত্র ক্রমেই কঠোরতর শর্তযুক্ত হচ্ছে।... গত তিন বছরে আমাদের মোট বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তিতে ঋণের পরিমাণ শতকরা ৫০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রায় ৭০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ... সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশ ও তাদের প্রভাবে পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে যে ধরনের শর্তাবলি আরোপ করছে তা দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যে মোটেও সুখব্যঞ্জক নয়।' এই অ-সুখকর কাজটি তবুও তাদের করতে হচ্ছে, গভীর থেকে গভীরতর মাত্রায়।

বাজেট আলোচনা করতে গেলে একটি দিক বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে যে, এই বাজেটের অর্থনৈতিক কার্যকরিতা কিংবা অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কতদূর। দেশীয় অর্থনীতি বিকাশে (পুঁজিবাদীই হোক না কেন) কোন স্বাধীন ও কার্যকর নীতিকে এটি খারাপ করতে পারে কি না। কেননা যদি এটাই বাস্তব হয় যে, যে বাজেট নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা শুধু একটি খোলস এবং জাতীয় অর্থনীতি বিকাশে এর ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা নেই, তা হলে শুধু বাজেট নিয়ে আলোচনার কোন অর্থ থাকে না।

বর্তমান বাজেট পাঠ করলে দেখা যায় যে, এই বাজেট কার্যকরীকরণের জন্যে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ ঠিক ঠিকমতো বজায় থাকতে হবে :

১. আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোল এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি চলবে না।
২. আন্তর্জাতিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা থাকতে হবে।
৩. আমদানি মূল্য বৃদ্ধি ও রপ্তানি মূল্য হ্রাস চলবে না।
৪. বিদেশি সাহায্য পুরোটা আসতে হবে এবং আসার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়া চলবে না।
৫. যেসব শিল্পপণ্য ও যন্ত্রাংশের ওপর কর কমানো হয়েছে সেসব খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে হবে।
৬. কালো টাকার মালিকদের সততার সঙ্গে নিজেদের কালো টাকার পরিমাণ ঘোষণা করতে হবে।
৭. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় লুম্পেন বুর্জোয়াদের থেকে নতুন কোন বাড়তি চাপ আসা চলবে না।
৮. দেশের জনগণ দরিদ্রতা, অপুষ্টি, নির্যাতন সত্ত্বেও শান্ত থাকবেন।

এসব শর্ত পূরণ হয়েও যদি বাজেট অনুযায়ী অর্থনীতি শতকরা ১০০ ভাগ পরিচালিত হয় তা হলেও কি আনন্দ, স্বস্তি কিংবা অর্থনৈতিক বিকাশের কোনো সম্ভাবনা আছে? এই দিকটিই বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার।

এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কারও দ্বিমত নেই যে, অন্যান্য বাজেটের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে বিদেশি সাহায্য নির্ভর, এইড কনসোর্টিয়াম ও আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক নির্দেশ অনুযায়ীই এই বাজেট প্রণীত হয়েছে। বিদেশি সাহায্যের ওপর এই নির্ভরশীলতা বুর্জোয়া তত্ত্ব দ্বারা বৈধকৃত। কেননা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর 'missing component' পুঁজির সংকট মোকাবেলা করতেই হবে, দুষ্টচক্র ভাঙ্গতে গেলে বিরাট পুঁজি বিনিয়োগ দরকার হবে। এই পুঁজি দেশে অপ্রতুল বলে শিল্পোন্নত দেশ থেকে ধার হিসেবে নিয়ে আসতে হবে। এসব তত্ত্ব অনুযায়ী এই সাহায্য সঞ্চয় বৃদ্ধি করবে এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমাবে; এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে মূলধন গঠন প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হবে।

বাংলাদেশে ১৯৭২ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিদেশি সাহায্য এসেছে। প্রতি বছরই বিদেশি সাহায্যের পরিমাণ বাড়ছে। অভিজ্ঞতা থেকেও পরিষ্কার যে, বিদেশি সাহায্যের নিয়মই হচ্ছে তা আরও বেশি সাহায্যের চাহিদা তৈরি করে। কিন্তু সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের কী ঘটল? ১৯৬৯-'৭০ সালে সঞ্চয় ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৯ ভাগ। ১৪ বছরে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিদেশি সাহায্য আসার পর এই সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪ ভাগ। আমদানি-রপ্তানি ঘাটতি গত ১৪ বছরে বিদেশি সাহায্যের প্রায় সমান।

১৯৮৫-'৮৬ সালের বাণিজ্য ঘাটতি পূর্ববর্তী নিয়মেই আগের বছরের চাইতে বেশি, প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা।

তাহলে বিদেশি সাহায্যের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করা কিংবা মূলধন সংগঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা কোথায়? এই বাস্তবতা পরিষ্কার হলেও বিদেশি সাহায্যের যৌক্তিকতা শাসক শ্রেণীর কাছে ফুরিয়ে যায় না। এই অর্থনীতির শেকড় দুর্বল, ওপরে সুতো বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। দেশীয় অর্থনীতির ক্রিয়া থেকে এই অর্থনৈতিক কার্যক্রম রস গ্রহণ করতে অক্ষম। বর্তমান বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের যাবতীয় উপাদান : প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, গবেষণা, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই আন্তর্জাতিক পুঁজি দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও সমর্থিত। এই পুঁজি ছাড়া এদেশের বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদন তো দূরের কথা, রক্ষাই অসম্ভব। এরকম একটি পরিস্থিতিতে অর্থনীতির পরিকল্পনা কিংবা বার্ষিক বাজেট ঘোষণায় সরকারের ভূমিকা অসহায় ও একান্ত বাধ্যগত কর্মচারীর মতো।

আন্তর্জাতিক পুঁজির দেশীয় মিত্রশক্তি যারা, তাদেরও সম্পদ আহরণ কেন্দ্রীভবনের জন্যে পুঁজিবাদী শোষণ প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল থাকার বাস্তবতা নেই। তারা লুটপাটকেই সবচাইতে সহজ, বাস্তবানুগ পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। এরকম একটি লুটপাটের অর্থনীতিতে নৈরাজ্য, দিকনির্দেশনাহীনতা, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া আর কী উপস্থিত থাকতে পারে? এবং বাগাড়ম্বর ছাড়া অর্থ উপদেষ্টারই বা কী বলার থাকতে পারে?

বেসরকারি খাতের ওপর ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বারোপ, এই খাতের জন্যে ক্রমবর্ধমান হারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান গত কয়েক বছরেই সরকারি নীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বছরের বাজেটেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে আমরা দেখি যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগ হিসাব করা হয়েছে ৬৮৭১ কোটি টাকা, এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ঋণই হচ্ছে ৪,৭০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৯ ভাগ। বাকি ৩১ ভাগ তাদের নিজস্ব বলে কথিত, কিন্তু সেটিও যে সত্য থেকে অনেক দূরে সে ব্যাপারটি সকলেই জানেন।

গত ১০ বছরে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুলভাবে এবং এই বর্ধিত ঋণের অধিকাংশই গেছে বেসরকারি খাতে। সদ্য সমাপ্ত বছরে মোট ব্যাংক ঋণের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই বেসরকারি খাতে গেছে। বেসরকারি খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ক্রমবর্ধমান হারে ঋণ প্রদান, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিস্তৃতভাবে ছড়ানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একীভূতকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন গঠন, পুঁজির সঞ্চালন-সংবর্ধন, বৃহৎ পুঁজির মালিকদের জন্যে সহজে আরও পুঁজি আয়ত্ত করবার সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি নানাভাবে সম্পর্কিত কর্মপ্রক্রিয়ার অংশ। পুঁজিবাদের

অধীনে রাষ্ট্রীয় এই আনুকূল্য একটি দেশে পুঁজিবাদী উন্নয়নে যথেষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। কিন্তু এই উন্নয়ন ততক্ষণ পর্যন্তই অর্থনৈতিক বিকাশ কিংবা সুনির্দিষ্টভাবে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে সহায়তা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল বিকাশের শর্তাবলি বিরাজ করে।

শাসক শ্রেণীর লুটেরা চরিত্র, আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির শ্রমবিভাজন নীতিতে শিল্পায়নের বিরুদ্ধ-ক্ষেত্র হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থিতি ইত্যাদি কারণে এদেশে শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে, তার স্থায়িত্বের গ্যারান্টি সমাজে উপস্থিত নেই। তাছাড়া সংস্কারহীন কৃষি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এই অবস্থাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

এই সামগ্রিক অবস্থার কারণে বেসরকারি খাতের প্রতি রাষ্ট্রীয় যে আনুকূল্য এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে যে ঋণ সম্প্রসারণ করা হয়েছে তার অধিকাংশ অর্থনৈতিক নিয়মেই অধিকতর মুনাফাপ্রদানকারী ব্যবসা খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ পণ্য সঞ্চালন, বিদেশি চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানি, বিদেশি যোগান অনুযায়ী আমদানি, ইন্ডেন্টিং ইত্যাদি কাজেই ব্যয়িত হয়েছে। আর এসবের মধ্য দিয়ে যে ধরনের খাত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন দরকার তাই সংঘটিত হয়েছে। অন্যান্য খাতের তুলনায় পরিবহন ও গার্মেন্টসের অধিকতর বিকাশ এই বাস্তবতারই একটি প্রকাশ।

সর্বোপরি, বিদ্যমান ব্যবস্থার সংকটের কারণে এদেশের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তাবোধ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এই শ্রেণীর মধ্যে খুব দ্রুত বিপুল মুনাফা অর্জন করে তা দিয়ে জমি, বাড়ি জাতীয় স্থাবর সম্পদ ক্রয় এবং বিশেষ করে তা বিদেশে পাচার করবার তাগিদই প্রধান। সে কারণে দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সংস্কার, প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার, চূড়ান্ত দারিদ্র্যের যথাযথ হ্রাস ঘটানোর মাধ্যমে জনশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও এর অপচয় হ্রাস, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, ক্রয়ক্ষমতার বিস্তার ইত্যাদি শর্তসমূহ পূরণের জন্যে এই পুঁজির জোর তাগিদ নেই। কিন্তু একটি অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল বিকাশের জন্যই, এসব শর্তপূরণ অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমান অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তারকারী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত লুটেরা পুঁজির সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বর্তমান রাষ্ট্রের দেয়া বাজেট কিংবা পরিকল্পনায় তাই এসব বিষয়কে কার্যকরভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় না। ৮৬-৮৭ সালের বাজেট এরই আরেকটি প্রতিফলন।

অপ্রস্তুত ভিত্তির ওপর জাতীয়করণ যেভাবে সরকারি খাত লুটপাটের মাধ্যমে সম্পদ পুঁজিভবন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করেছিল, এখন এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে বেসরকারি খাত। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত লুটপাটের মাধ্যমে শিল্পায়ন না হলেও বিত্তায়নের বিকাশ হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন সংযোগ-সুবিধার মাধ্যমে খুবই কম দামে শিল্প

কলকারখানা কিনে তার বিপরীতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে বিপুল ঋণ গ্রহণ, ঋণের টাকা ব্যবসা কিংবা বিদেশে পাচার বা দেশে-বিদেশে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, একইসঙ্গে শিল্পে লেঅফ ঘোষণা, যন্ত্রপাতি বিক্রি ইত্যাদি কার্যক্রম বর্তমান ক্ষমতাবানদের 'উৎপাদনী কর্মসূচির' অন্তর্গত। এই তথাকথিত পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে অব্যাহত সমর্থন দান, তাদের কালো টাকাকে সাদা করবার বিভিন্ন পথ অনুসন্ধান এই বছরের বাজেটেরও বিশেষ অংশ। যদিও বাজেটে তাঁদের বকেয়া ঋণ পরিশোধের আবেদনও জানানো হয়েছে, কিন্তু এই আহ্বান যেন অনুরাগেরই অঙ্গ।

অর্থ উপদেষ্টার বক্তব্য অনুযায়ী বকেয়া ঋণ এখন প্রায় ২০০০ কোটি টাকায় উঠেছে। এই অর্থ দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত আছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ অবস্থার পরও অর্থ উপদেষ্টা বলছেন, ৩-৪ বছর ধরে ঋণনীতিকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত ও বাস্তবমুখী করা হয়েছে। এই বছরের বাজেটে ১৯৮৩ সালে প্রণীত ঋণ গ্রহীতাদের সুযোগ-সুবিধা, ঋণের একাংশ মওকুফ, উদার ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ও শর্তাদি পুনর্নির্ধারণ, ঋণের একাংশ সমমূলধনে রূপান্তরিত করে প্রকল্পের দায়ভার লাঘবকরণ, দন্ডসুদ ও সুদের একাংশ মওকুফ ইত্যাদি অব্যাহত রাখা হয়েছে। এর সঙ্গে এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে (যাকে বিনিয়োগ ঋণ বলা হচ্ছে) সুদের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা হয়েছে।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানই এখন তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে আছে যেগুলো রপ্তানির জন্যে প্রধানত নিয়োজিত। প্রধানত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস এর অন্যতম অংশ। আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রয়োজন দ্বারা এই উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত। এই দেশের সরকারসমূহ শিল্প কৃষিসহ সবকিছুকেই রপ্তানিমুখী করে শেষ রক্ষা করতে তৎপর। কিন্তু আমদানি রপ্তানি ব্যবধানে ফাঁক সেখানেও নিরাপত্তা দেয়নি। অর্থ উপদেষ্টা অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, 'যদিও এ বছর আমাদের রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগের মতো বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু রপ্তানি মূল্যেও গড়ে শতকরা ১৯ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। কাঁচা পাট ও চায়ের মূল্য এ বছর পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগের মতো বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু রপ্তানি মূল্যও গড়ে শতকরা ১৯ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। কাঁচা পাট ও চায়ের মূল্য এ বছর পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৪৫ ভাগের বেশি হ্রাস পায়। পাটজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায় শতকরা ৫ ভাগ। আর সার্বিকভাবে বৈদেশিক আমদানি-রপ্তানির শর্তে অবনতি হয় শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস আমাদের অর্থনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এই খাতে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে বটে, কিন্তু পাশাপাশি কৃত্রিম আঁশের মূল্য হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে

কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি আয় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।' সার্বিকভাবে দেখতে গেলে এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া প্রতিকূল হবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এর পরও ভর্তুকি দিয়ে হলেও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারি নীতি অনমনীয়। কেননা এই নীতি নির্ধারিত ও প্রদত্ত।

এই বছরের বাজেটেও সেজন্যে বলা হচ্ছে, প্রচলিত রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য হ্রাসের কথা চিন্তা বিবেচনা করে এই ধরনের রপ্তানির জন্যে চলতি মূলধন হিসেবে যে ব্যাংক ঋণ দেয়া হবে তার সুদের হার শতকরা ১২ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৯ ভাগে নির্ধারিত করা হবে। শিল্প উৎপাদন গত বছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩ ভাগ হ্রাস পেলেও কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি সামগ্রিক বিকাশের অংশ না হওয়ায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চাইতেও এই বৃদ্ধি বেশি হওয়া সত্ত্বেও তার কর্মসংস্থানের বিকাশ ঘটাতে পারেনি, গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ঠেকাতে পারে নি। শতকরা ২০ ভাগেরও কম জমি সেচ সুবিধার আওতায় থাকা সত্ত্বেও, ব্যাপক কৃষক জনগণের পুঁজি সংকট অত্যন্ত প্রকট থাকা সত্ত্বেও, বাজেট বক্তৃতা অনুযায়ী এই বছর সার বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়েছে, সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণের সীমিত অগ্রগতি হয়েছে এবং কৃষিঋণ বিতরণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, শিল্পঋণের মতোই কৃষিখাতও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কিছু ব্যক্তির হাতে এবং অধিকাংশের গন্তব্যও শিল্পঋণের মতোই ব্যবসাতে। এবং এই পুঁজির দাপটে উৎপাদকরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, ভবিষ্যৎ উৎপাদন সম্ভাবনা কীভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে, তা গত বছরের পাটের ঘটনা থেকেই পরিষ্কার।

শিল্প, কৃষিসহ উৎপাদনশীল খাতের এই ধরনের নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও দিকনির্দেশহীনতা, স্বাভাবিকভাবেই স্থায়ী ও স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না, সে কারণে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বকে ঠেকা দেয়ার জন্যে বহু বছর থেকেই কৃত্রিম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর জন্যে প্রশাসনের অপ্রয়োজনীয় আয়তন বৃদ্ধি একটি অন্যতম পথ। প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি সেজন্যে অবিরাম প্রক্রিয়া। এবারের বাজেটেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এ বছর বাজেটে উপজেলা পরিষদকে শত শত কোটি টাকা দেয়া হচ্ছে ও হবে এই ঘোষণাও এর সঙ্গে অনেকখানি সম্পর্কিত। প্রশাসনিক ব্যয় ১৯৭২-'৭৩ সালে ছিল জিডিপির শতকরা ৬.০২, এ বছর তা আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে রাজস্ব খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৭২ সালের তুলনায় ৭ গুণ।

অর্থ উপদেষ্টা বলেছেন, 'সামগ্রিকভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারের চাইতে এগিয়ে রয়েছে।' এই সত্যভাষণটি সরকারের পক্ষ থেকে আগে কখনই সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় নি। কারণ সম্ভবত জনসংখ্যা সমস্যাকেই

প্রধান সমস্যা দেখিয়ে অন্যান্য মৌলিক সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা। অর্থ উপদেষ্টা আরও বলেছেন, দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় গড়ে জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে এগিয়ে ছিল। কিন্তু এই প্রবৃদ্ধি সমাজে বৈষম্য দূরীভূত করতে সক্ষম হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। বস্তুতপক্ষে কোন কোন পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দারিদ্র্যসীমার নিচে দেশের জনগণের যে অংশ রয়েছে তার পরিমাণ হয়তো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। 'কোন কোন পরিসংখ্যান'ও নয়, এমনকি 'হয়তো'ও নয়-সকল বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান দেখেই নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ১৪ বছরের বাজেটের সাফল্যেই চূড়ান্ত দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অপুষ্টি, অশিক্ষা নিরঙ্কুশ হারে বেড়েছে, কর্মসংস্থান বাড়েনি, প্রকৃত আয় কমেছে। দারিদ্র্য বৃদ্ধির ব্যাপকতায় অপুষ্টি, অসুস্থতা অনাহারে অকাল মৃত্যুও বেড়েছে, যার আর এক দিক হচ্ছে কর্মক্ষম জনশক্তির ব্যাপক অপচয়। এক্ষেত্রে অর্থ উপদেষ্টা চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসরণ করে মিথ্যা ভাষণ দিয়েছেন, 'বিগত এক দশকেরও অধিক সময়কাল ধরে অনাহারে বাংলাদেশে কোন প্রাণহানী হয়নি।'

দারিদ্র্য বৃদ্ধির সকল শর্ত অর্থনীতিতে বিদ্যমান রেখে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যেসব কর্মসূচিকে বর্তমানে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে সেগুলো হলো : কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, সাহায্য সংস্থার কার্যক্রম, গ্রামীণ ব্যাংক কর্মসূচি। এবারের বাজেটও এসব খাতের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এসব প্রচেষ্টায় যে আয় বিতরণ হয়, যে কর্মসংস্থান হয় তা নিতান্তই অস্থায়ী এবং এর গন্ডিও অত্যন্ত সীমিত যদিও এর বিপরীতে বিপুল প্রশাসনিক ব্যয় বহন করতে হয়। এসব প্রচেষ্টা তাই দারিদ্র্য বৃদ্ধিকে কোনভাবেই প্রতিরোধ করতে পারে না, যদিও এসব কার্যক্রমে মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র একটি অংশের কর্মসংস্থান হয়। অর্থনৈতিক বিচারে যে কর্মসংস্থান অবশ্যই কৃত্রিম।

বাংলাদেশে গত ১৪ বছরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আয় বৃদ্ধির প্রকৃতিগত কারণেও তা অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও সম্পদ সংগ্রহের সীমা বাড়াতে পারেনি। গত ১৪ বছর আমরা আয় বৃদ্ধির প্রবণতা ও গতি বিশ্লেষণ করলে দেখব যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়ের বৃদ্ধি অধিকতর হারে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশের হাতে এই কেন্দ্রীভূত আয়ের এক অংশ পাচার হয় অন্য অংশ স্থাবর সম্পদে পরিণত হয়, ক্ষুদ্র অংশ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ তৎপরতার মধ্যে নিয়োজিত থাকে। অন্যান্য বছরের মতো এই বছরেও সরকারের বাজেটে উল্লিখিত রাজস্বনীতিতে কেন্দ্রীভূত এই বিপুল আয়ের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে আনুপাতিক হারে রাজস্ব সংগ্রহের কোনো কার্যকর নীতি সংযোজিত হয়নি। এবারের বাজেটে 'কালো' টাকা থেকে আয়কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, 'অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত আয় যাতে ব্যক্তি, শ্রেণীর আয়করদাতা কর্তৃক ১৯৮৬-৮৭ সালের

আয়কর রিপোর্টে ঘোষিত আয় জিজ্ঞাসাবাদ না করে গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকবে' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা যে রাজস্ব সংগ্রহে কোন উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে না তা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট কর আদায় করা হয়েছে ১১,১৫৪ কোটি টাকা; এর মধ্যে আয়কর বা প্রত্যক্ষ কর হচ্ছে শুধুমাত্র ১,৫৬২ কোটি টাকা। এই বছরের বাজেটেও পরোক্ষ কর হচ্ছে মোট করের ৮৯ ভাগ, বর্ধিত করের অধিকাংশই পরোক্ষ। প্রয়োজনীয় খাতে ভর্তুকি হ্রাসের অব্যাহত নীতি এবং পরোক্ষ করের আধিপত্য, সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠী, ক্রয়ক্ষমতা এবং ব্যয় পরবর্তী সঞ্চয়ক্ষমতা সংকুচিত করেছে। উল্লেখ্য যে, ভর্তুকি হ্রাসের ফলে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৫ সময়কালে রেশন চালের দাম বেড়েছে ৫৬৪ ভাগ, ইউরিয়া সার ৪৪১ ভাগ, কেরোসিন ১৮২৮ ভাগ, প্রাকৃতিক গ্যাস ৭৮৪ ভাগ। রাজস্ব সংগ্রহের এই নীতিতে ব্যাপক জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের মাধ্যমে তাদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে, রাজস্ব সংগ্রহ দুর্বল হওয়ার ফলে বিদেশি সাহায্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এই নীতি আয় কেন্দ্রীভবনকেও ত্বরান্বিত করছে। বিদেশি সাহায্যের এই বৃদ্ধি আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধি করতে শাসকশ্রেণী আরেক কারণে বাধ্য। সেটি হচ্ছে যে, আমদানি-রপ্তানির শুল্ক সরকারের আয়ের মেরুদণ্ড। উল্লেখ্য যে, ৮৬-৮৭ সালে মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৩১ ভাগ বিদেশি ঋণের আসল ও সুদ হিসেবে পরিশোধ বাবদ ব্যয় করতে হবে।

রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন বছরে যে বরাদ্দ ধরা হয় তার মধ্যে অনেক রকম ফাঁক থাকে। যেমন– এ বছরের বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ বছর শিক্ষাখাতে বরাদ্দ প্রতিরক্ষা খাত থেকেও বেশি করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ উপদেষ্টা নিজেই বলছেন, প্রতিরক্ষা বরাদ্দে খাদ্য ভর্তুকি ধরা হয়নি। কিন্তু সবাই জানেন যে, এখাতে খাদ্য ভর্তুকি সর্বোচ্চ, শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ভর্তুকি দামে সেখানে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও এই খাতের জন্য অপ্রকাশ্য বাজেট বরাদ্দ তো আছেই। তাছাড়া মোটাদাগে খাতওয়ারি বরাদ্দ দেখেই তা উৎপাদনশীলতা বিকাশে সহায়তা করবে, এটা বলা যাবে না। এই বরাদ্দ বিদেশি সাহায্যের গতিমুখ অনুযায়ী অনেকখানি নির্ধারিত হয়, বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী নয়। এরপরও উল্লেখ করা উচিত যে, এই বছরের রাজস্ব বাজেটে কৃষি পেয়েছে ৩ শতাংশ, শিল্প পেয়েছে ২ শতাংশ এবং প্রতিরক্ষা পেয়েছে ১৭.৬২ শতাংশ। খাতওয়ারি অগ্রাধিকার চরিত্র এ থেকে স্পষ্ট। এই বছর উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ প্রকৃত মূল্যে আগের বছরের চাইতে কমেছে।

স্বাধীনতার পর গত ১৪ বছরে সবসময় দ্রব্যমূল্য হ্রাসকে অন্যতম নীতি ঘোষণা করা হলেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০ গুণ, জীবনযাত্রার ব্যয় সূচক ১০০০- কে স্পর্শ করতে যাচ্ছে। জীবনযাত্রার এই ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাপক জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, একচেটিয়া বণিক পুঁজিকে স্ফীত করেছে। কিন্তু

ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের হার সকল জনগোষ্ঠীর জন্যে সমান নয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনকাঠামো পর্যালোচনা করে দেখেছি, ১৯৭১-৭২ এর তুলনায় বর্তমানে একজন অধ্যাপকের প্রকৃত আয় দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৩.২৪, সহযোগী অধ্যাপকের প্রকৃত আয় হচ্ছে শতকরা ৫১.১১, সহকারী অধ্যাপকের হচ্ছে শতকরা ৪৯.৬৯ এবং প্রভাষকের হচ্ছে শতকরা ৩৯.০৪। অর্থাৎ অবস্থানের ক্রমানুযায়ী প্রকৃত আয়ও কমেছে। সহজেই বোধগম্য ব্যাপক জনগোষ্ঠী যারা এরও নিম্নবর্তী স্তরে আছেন তাদের প্রকৃত আয় কতটা হ্রাস পেয়েছে।

অর্থ উপদেষ্টা আমাদের বিনীতভাবে জানিয়েছেন যে, সদ্যসমাপ্ত বছরের দ্রব্যমূল্য বেড়েছে শতকরা ১০ ভাগ (অনেকেই তা মেনে নিতে রাজি নন)। আরও জানিয়েছেন যে, আগামী বছর দ্রব্যমূল্য বড়জোর শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে তিনি অবাঞ্ছিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ইতোমধ্যে দেখা যাচ্ছে যেসব দ্রব্যের দাম কমার কথা সেগুলো কমেনি, যেগুলো বাড়ার কথা নয় সেগুলো বেড়েছে, সরকারের এখানে কিছু করণীয় নেই! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ ও সম্পদ অপচয় রোধ করার জন্য তিনি শুধু দু'টি কামনা রেখেছেন : প্রথমটি হলো, 'যে কোন নতুন বাজেটকে উপলক্ষ করে বাজারে অযৌক্তিকভাবে মূল্য বৃদ্ধির যে প্রবণতা দেখা যায় তাকে আপনারা সচেতনভাবে ও সক্রিয়ভাবে প্রতিহত করুন। কারণ নতুন বাজেটে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যাতে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।' দ্বিতীয়টি হলো যে, 'বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ও সম্পদ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় হবে, যাতে তার প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয় তার প্রতি সকল নাগরিক সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।' এই প্রতিহত করা বলতে তিনি যদি বুঝিয়ে থাকেন মালীবাগ বাজারের এক বিক্রেতাকে প্রহার আর সম্পদ সদ্ব্যবহার বলতে যদি বুঝিয়ে থাকেন রাস্তায় পড়ে থাকা সরকারি ইট যথাস্থানে তুলে রাখা, তা হলে আমাদের বলার বিশেষ কিছু নেই।

প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা রোধ করতে গেলে একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও তাদের কর্তাদেরকেই প্রতিরোধ করতে হয়, যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি সামরিক-বেসামরিক কর্তা এমনকি মন্ত্রীরাও আসতে পারেন। আর সম্পদ সদ্ব্যবহার করতে গেলে প্রথমত বর্তমান রাষ্ট্রীয় নীতির অন্তর্নিহিত অপচয়মূলক শক্তিকেই প্রতিরোধ করতে হয়। নিদেনপক্ষে যেসব ব্যক্তি এর সঙ্গে জড়িত থাকেন তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে হয়, তারাও উপরোক্ত শক্তিবর্গ। রাষ্ট্রের সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কি জনগণের এই প্রতিরোধ অভিযান অনুমোদন করবেন?

সন্দেহ নেই আগের বছরগুলোর মতো এ বছরের বাজেটও অবশ্যই গণমুখী, তা গণের দিকে ধাবিত, কিন্তু তা উলঙ্গ শত্রু হিসেবেই। সামগ্রিকভাবে একটি ভগ্নপ্রায় অর্থনীতিতে ব্যাপক জনগণের অব্যাহত দারিদ্র্য বৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্পখাতে

নৈরাজ্য সৃষ্টি ও বৃদ্ধি, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, সম্পদের লুটপাট ও কেন্দ্রীভবন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধোগতি, বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি, সম্পদ ও দক্ষ জনশক্তি অপচয় ইত্যাদি যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসেবে চালু রয়েছে বর্তমান বাজেট তাকেই ১৯৮৬-'৮৭ অর্থবছরে অব্যাহত রাখার জন্যে বৈধতার আবরণে অনেক প্রতিশ্রুতি পরস্পর বিরোধিতার খোলসে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে।

কিন্তু এটি উপস্থিত করেও অর্থ উপদেষ্টা যখন বলছেন, '১৯৮৬-৮৭ সালের বাজেটের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো এই বাজেট জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহায়ক হবে; কৃষিখাতকে সকল কর্মসূচি ও নীতিমালায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে; মূল্য পরিস্থিতিকে নিম্নমুখী রাখতে ও বাজেট বিশেষভাবে সাহায্য করবে; শিল্পখাতে জাতীয় উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করতে এ বাজেট বিশেষভাবে সহায়ক হবে; ও এই বাজেটের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে একটি অর্থবহ কার্যক্রমের সূচনা করা হয়েছে' তখন তাকে প্রলাপ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? তবে এখানে এই সত্যটুকুও বলে নেয়া দরকার যে, এই প্রলাপ ব্যক্তিগতভাবে অর্থ উপদেষ্টার নয়, এটি সংকটজর্জরিত, অনিশ্চয়তা ও দিকহীনতায় অস্থির দিশেহারা বর্তমান শাসকশ্রেণীর প্রলাপের ও প্রতারণার সরব উচ্চারণ।

(১০ জুলাই, ১৯৮৬- অর্থনীতি সমিতির সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ এবং *পূর্ণাশা* আগস্ট ও নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত)।

২০০০ সালে বাংলাদেশ

অংক কষে একজন ইউরোপীয়ান সমাজবিজ্ঞানী কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছেন যে, ২০০০ সালে ইউরোপের মজুরদের মজুরি হবে ২০ হাজার ডলার। সে হিসেব আমাদের এখানে একজন মজুরের নিম্নতম মজুরি ২০০০ সালে দাঁড়াবে ৩৬০০ টাকা, যার মজুরি এখন ৩০০ টাকা।

এরকম হিসেব খুব সহজ। গত কয়েক বছরে যে হারে বৃদ্ধি ঘটছে তা হিসেবে করলেই এরকম অংক ঘোষণা করা যায়। কিন্তু সেই সাথে যদি টাকার ক্রয়ক্ষমতা হিসাব না করা হয় তাহলে কিছুই বোঝা যায় না। বোঝা যায় না ঐ ৩৬০০ টাকার মূল্য কতোটা, তা কী ৩০০ টাকার বেশি না কম। সম্পর্কিত ঘটনাগুলো বিচার না করে এরকম হিসাব করার দৃষ্টান্ত অনেক।

আমাদের পরিকল্পনা দলিলগুলোতে এরকম হিসাবের মারপ্যাঁচ আছে। টার্গেট একটা ঠিক করে তাতে পৌছানোর জন্যে, যেমন ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ করা, সে অনুযায়ী টাকার অংক, উপকরণ আমদানি এবং কর্মসংস্থান বিভিন্ন জায়গায় 'ফিট' করা হয়। দেখা যায় সব ঠিকঠাক। পাঁচ বছর কিংবা দশ বছর পর অমুক অমুক খাতে এত এত টাকা বরাদ্দ করে, এই এই হারে প্রবৃদ্ধি ঘটলে আমরা অমুক টার্গেট এ এসে পৌছাবো, এইভাবে সব হিসেব হয় এবং যথারীতি তার খুব কমই অবশিষ্ট থাকে।

২০০০ সালে বাংলাদেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে চিন্তা বর্তমান অবস্থা থেকে সরলভাবে করতে গেলে প্রায় এরকম অবস্থাই দাঁড়ায়। আজকে যে তরুণ-তরুণী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে কিংবা মজুরি বৃত্তি করছে কোথাও না কোথাও, কিংবা যে পরিবার নতুন যাত্রা শুরু করেছে তারা হয়তো চিন্তা করেন আগামী ১৭ বছর পর তাদের চেহারা কী হবে। কিন্তু বাস্তবত সে অনুযায়ী কোনো পরিকল্পনা তারা নিতে পারেন না। হয়তো এতটুকু ভাবতে পারেন যে, তাদের চেহারায় একটু বয়সের ছাপ পড়বে।

মধ্যপ্রাচ্যের দৌলতে কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ঋণের উদার দানে যারা এখন বিত্তবান তারাও জানেন না, ১৭ বছর পর তাদের এই ধনসম্পদের কী অবস্থা হবে। তুলনামূলক নিরাপত্তার আশায় তারা তাদের সম্পদ বিদেশে কিংবা বিদেশি ব্যাংকে জমা রাখেন।

কিছু সম্ভাবনা : মাসের বেতনে কয় সের চাল?

বহু যুগ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি প্রবণতা দেখা যায়, সেটি হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের সাথে শ্রমমূল্যের বিরোধ। অর্থাৎ মাঝেমধ্যে খুব সাময়িকভাবে এর অন্যথা হতেও দেখা যাচ্ছে, যে হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তার চাইতে কম হারে শ্রমের দাম তথা মজুরি (কিংবা আরও ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়) বাড়ছে। এর ফলে যতদিন যাচ্ছে বেশিরভাগ মানুষের আপেক্ষিক ক্রয়ক্ষমতা কমে আসছে।

গত ১০ বছরে টাকার অংকে মজুরি বেড়েছে ৪ গুণ কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে ৮ গুণ। এই একই হার অব্যাহত থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ মজুরি বর্তমানের তুলনায় আরও ৬৪ গুণ বাড়বে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়বে ৫২৮ গুণ।

১৫০০ টাকা মাথাপিছু আয় ধরলে বর্তমানেই যেখানে শতকরা ৯৫ জন দারিদ্র্য সীমার নিচে তখন তারা কোথায় দাঁড়াবেন, কোন চিহ্ন কি থাকবে?

জনসংখ্যা বর্তমানে ৯ কোটি। হিসেব করে বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন ২০০০ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৪ কোটি। বর্তমান জনসংখ্যার জন্যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন। ১৪ কোটি মানুষের জন্যে খাদ্যশস্য তখন প্রয়োজন হবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন। এই বাড়তি ৯০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য তখন উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা বাংলাদেশের পানি, জমি ও মানুষের সম্মিলিত শক্তির আছে, কিন্তু বর্তমান হার বজায় থাকলে সেখানে পৌছানো কি সম্ভব?

বাংলাদেশের মাথাপিছু বিদেশি ঋণ এখন প্রায় ১৫০০ টাকা, বিদেশি ঋণ গ্রহণের যে হার বজায় রয়েছে তাতে ২০০০ সালে মাথাপিছু বিদেশি ঋণ দাঁড়াবে ৪৫০০ টাকা। আর এর ঋণ সুদ হিসেবে প্রতি বছর যা দিতে হয় তা দেবার জন্যে কর বৃদ্ধি ঘটবে কত গুণ?

গত দশ বছরে আমদানি-রপ্তানি ঘাটতি হয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকার ওপর। এই ঘাটতির পরিমাণ এই সময়ে প্রাপ্ত বিদেশি ঋণ থেকেও বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে গরিব দেশের পণ্যের দামের আর বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পণ্যের দামের বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। এই হার বাড়তে থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ এই ঘাটতি কমপক্ষে তিনগুণ হবে।

১৯৭২-৭৩-এ যে আমদানি পণ্যের দাম ছিল ১৮০ এখন তার দাম ৫০০০, কিন্তু যে রপ্তানি পণ্যের দাম তখন ছিল ১০০০ এখন তা ১৫০। এই অবস্থা চলতে থাকলে ২০০০ সালে ঐ পণ্যের দাম দাঁড়াবে ১০,০০০ টাকার ওপরে এবং রপ্তানি পণ্যের দাম হবে বড়জোর ৩০০ টাকা। অর্থাৎ ১৯৭২-'৭৩-এ ১ মণ পাট দিয়ে যতটুকু গম কেনা যেতো ততটুকু গম কিনবার জন্যে ২০০০ সালে আমাদের কমপক্ষে ৩৩ মণ পাট বিক্রি করতে হবে।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এখন ধরা হয় শতকরা ৪৪ জন। গ্রামাঞ্চলে উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার ধরেও বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন কৃষিখাতে বেকার সংখ্যা ১৯৮৫ নাগাদ দাঁড়াবে ৯০ লক্ষ। ভূমিহীন এখন সরকারি হিসেবেই আছে শতকরা ৫০ জন। আর কার্যক্ষেত্রে যারা জমি বন্ধকী দিয়ে রেখেছেন তারাও তো ভূমিহীন, সে হিসেবে ভূমিহীনের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। জমি হারানোর যে প্রক্রিয়া চলছে তাতে ভূমিহীনের হারই প্রায় ৮০ ভাগে এসে দাঁড়াবে। শিল্প কলকারখানার বিকাশের হার এবং কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদির ফলে শ্রম নিয়োগ হ্রাসের কথা বিবেচনা করলে তখন জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ বেকার থাকবেন? কল্পনা করাও কঠিন।

৭১-৭২-এ বাংলাদেশের কোটিপতির সংখ্যা ছিল ২ জন, এখন বলা হয় তাদের সংখ্যা ২০০। এই হার অব্যাহত থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ হাজার খানেক কোটিপতির দেখা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোটিপতি লালন-পালনের জন্যে ব্যাপক দরিদ্র জনগণ তখন কি বেঁচে থাকবেন?

পঞ্চম গ্রেডে একজন কর্মচারী ১৯৭০ সালে গড়পড়তা বেতন পেতেন ৭০০ টাকা, ৮০ সালে, খুব বেশি করে ধরলেও সেই গ্রেডের কর্মচারীর বেতন হয়েছে ১৪০০ টাকা। এই একই হার বলবৎ থাকলে ২০০০ সালে সেই গ্রেডের একজন কর্মচারীর বেতন হবে ৫৬০০ টাকা। '৭০ সালে এক মণ চালের দাম ছিল ৩০ টাকা, ৮০ সালে সেই চালের দাম হয়েছে ২৪০ টাকা। দামবৃদ্ধির হিসেবে ২০০০ সালে চালের মণপ্রতি দাম হবে ১৫,৩৬০ টাকা। একই গ্রেডের যে কর্মচারী ৭০ সালে তার বেতন দিয়ে কিনতে পেতেন ২৩ মণ চাল, সে গ্রেডের একজন কর্মচারী ২০০০ সালে তার মাসের পুরো বেতন দিয়ে কিনতে পারবেন ১৪ সের চাল। একটি পরিবারের শুধুমাত্র চালের প্রয়োজন মেটাতে গেলে যা ৫ দিন চলবে। লবণ, মরিচ, পেঁয়াজের কথা বাদই থাকলো।

যে পণ্য ইতোমধ্যেই এখন বিলাসিতার পর্যায়ে পৌঁছেছে তা হচ্ছে ডিম। ডিমের হালি ৭০ সালে ছিল আটআনা, এখন হচ্ছে ছয় টাকা। এভাবে চললে ২০০০ সালে প্রতিটি ডিমের দাম ১০০ টাকার বেশি পড়বে। মাসের পুরো বেতন দিয়ে তখন ১২ হালি ডিম কেনা যাবে। একটি টেলিভিশন কিনবার জন্যে এখন ৪ মাসের বেতন লাগে তখন লাগবে আড়াই বছরের বেতন।

গরুর মাংসের সের সে হিসেবে ২০০০ সালে দাঁড়াবে ২০০০ টাকায়। একজন সাংবাদিক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী মাসের পুরো বেতন দিয়ে আড়াইসের মাংস কিনতে পারবেন। কিংবা মাসের পুরো বেতন দিয়ে ১০টি কবিতার বই কিনে তাকে ঘরে ফিরতে হবে। এই পর্যায়ের আয়ভোগী ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এর চেয়েও অনেক কম আয়ের ব্যক্তিদের সংখ্যাই এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদেরকে তখন একসের চাল কিনে সারামাস ৫ জনের পরিবার নিয়ে চলতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, গত দশ বছরে মজুরি বেড়েছে গড়পড়তা ৪ গুণ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে গড়পড়তা ৭ গুণ। এই ব্যবধান পূরণ হচ্ছে কীভাবে? সবাই অভিযোগ করেন দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা উপরি আয় এখন সমাজের চোখে গ্রহণযোগ্য অপরাধ। সামাজিক মূল্যবোধ এবং প্রচলিত নৈতিক মানদণ্ডে উপরি পাওনা এখন যোগ্যতা ও দক্ষতার ফসল। ওপরের ব্যবধান তাই মেটানোর জন্যে যারা 'উপরি পাওনা' জোগাড় করতে পারছে তারা সামলে নিতে পারছে। কিন্তু ২০০০ সালে যখন পুরো বেতন দিয়ে কয় সের চাল কিনতে হবে তখন এই বাড়তি এত উপরি আয় কে জোগাবে?

দৈনিক মাথাপিছু ন্যূনতম ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা হচ্ছে ২২৫০। এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ হচ্ছে গড়পড়তা ১৮০০। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের যে চিত্র আমরা দেখছি তাতে এর পরিমাণ যতটা কমবে তাতে জনপদ বিরান হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

ব্যাংক ঋণ গত দশ বছরে বেড়েছে প্রায় ৪০ গুণ, এই হার অব্যাহত থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ ৮০ হাজার কোটি টাকার মতো ব্যাংক ঋণ বাজারে থাকবে। গত দশ বছরের ঋণের মধ্যে থেকে এখনও অনাদায়ী আছে ৪০০ কোটি টাকার মতো, তখন অনাদায়ী থাকবে কত?

কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে কলকারখানা করে তা আবার লোহার দরে বেচে ব্যবসায় লগ্নী করার ঘটনাও আছে এখন, আছে শিল্পের টাকায় শত শত একর জমি কিনে হাউজিং ব্যবসা করার ঘটনা। এই ধারা চললে ২০০০ সালে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো অস্তিত্ব থাকবে? হাউজিং ব্যবসার বিস্তৃতি কতটা ঘটবে?

স্বাধীনতার পর থেকে গত দশ বছরে দেশ ত্যাগ করে বিদেশি চাকরির জন্যে যারা গেছেন তাদের সংখ্যা '৭২-এর তুলনায় ১০ গুণেরও বেশি বেড়েছে। এই হিসেব বিবেচনা করলে দেখা যায় ২০০০ সালে নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ব্যক্তি বিদেশে চাকরি করবেন।

শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে এদেশে নগরায়ন হয়নি। যার ফলে গ্রাম থেকে মাইগ্রেশন হয়েছে তার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ভালো কিছু হয়নি। মাইগ্রেশনের বর্তমান হার বজায় থাকলে শহরগুলোতে ২০০০ সালে বর্তমান সংখ্যার ২ গুণেরও বেশি জনসংখ্যা হওয়ার কথা।

তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের সংখ্যা, বিভাগ, পরিদফতরের সংখ্যা এই হার বজায় রেখে কততে দাঁড়িয়ে কিছু কর্মসংস্থান করবে সেটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই ভালো বলতে পারবেন।

গত দশ বছরে ক্ষমতাসীন বাহিনীগুলোর হাতে গুপ্তহত্যা হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার, সে হিসেবে ২০০০ সাল নাগাদ এর সংখ্যা ১ লাখে পৌঁছানোর কথা।

দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করেছে গত দশ বছরে প্রায় ৭ লাখ, ২০০০ সাল নাগাদ দুর্ভিক্ষে মৃত্যু কোটির কাছাকাছি পৌঁছানোর সম্ভাবনা।

তাহলে সব মিলিয়ে যে চিত্রটি আমাদের সামনে আসছে তা এক অসম্ভব চিত্র বলেই মনে হয়। এগুলো গেল কিছু পরিসংখ্যানের হিসাব। সামাজিক চিত্র তখন কী দাঁড়াবে তাঁর হিসেব করা যায় না তবে ভেবে দেখা যায়।

টিভি সিরিজ 'আয়না'-র গ্রাম ভেঙে শহর হওয়ার কাহিনী, সিরিজে তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া-সংঘাত দেখাতে গিয়ে ময়না নামে এক মেয়ের চরিত্র আনা হয়েছে। গত সপ্তাহে ময়না তার সকল প্রতিরোধ ক্ষমতা হারানোর অবস্থায় দাঁড়িয়েছে– তার পালক তাকে বেচে দিচ্ছে, তার ভালোবাসা তার কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়েছে। সে একা মুখোমুখি হয়েছে প্রবল প্রতাপ আর বিরুদ্ধতার। ময়না তখন বার বার হেরে যায়। বাংলাদেশে এদের সংখ্যার কোন জরিপ নেই। ২০০০ সাল নাগাদ অর্থনীতির যে চরিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে তাতে এদের সংখ্যা অনেক হওয়ার কথা। তখন এই ময়নার মতো পিতৃপরিচয়হীন মেয়েরা কি কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি না করেই এই পথ বেছে নেবে? কপট ঘৃণায় যারা মুখ ঘুরিয়ে নেয় তাদের চারপাশেই তো তখন 'পতিতার' ভিড় থাকার কথা।

দেশ থেকে বাইরে নারী পাচারের ঘটনা এই দেশে বিরল ছিল। এখন দেশের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র থেকে এই পাচার সংঘটিত হচ্ছে। এর সংখ্যা তখন কত দাঁড়াবে? আর নারী হত্যা?

ধামরাইয়ের কারিগর এখন ২ টাকায় তার যে পণ্য বিক্রি করে তা ঢাকায় বিক্রি হয় ২০ টাকায়। এই চিত্র তখন কী দাঁড়াবে?

পেশার রূপান্তর এখন খুব দ্রুত ঘটছে সমাজে। কৃষক খুব দ্রুত রিকশাচালক হয়ে যাচ্ছে। তাঁতী হয়ে যাচ্ছে যোগালী। কারিগর হয়ে যাচ্ছে কাপড়ের ব্যবসার দোকানের কর্মচারী। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া কতদূর যাবে?

বর্গাচাষী কি একই নিয়মে জমি বর্গা নেবে– আর নিজেকে বর্গা দেবে?

বছরের পর বছর ঘুরেও চাকরি না পাওয়ার ক্ষোভে যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পুড়িয়ে ফেলছে এরকম ঘটনা এখনই ঘটছে– তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা কী হবে?

ভায়োলেন্সের চেহারা এখনই বিকট। তখন তার রূপ কোন পর্যায়ে যেতে পারে? রাহাজানি, চুরি, ছিনতাই, প্রতারণা ইত্যাদির হার বিবেচনা করলেও কীরকম চিত্র আমরা পাই?

পাঠকেরা একটু চিন্তা করলেই বোধহয় একমত হবেন যে, অর্থনীতির প্রাক্কলন পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে বিচার করলে ২০০০ সালে যে দেশটি আমরা পাই, তার সাথে কল্পিত নরকের বিশেষ দূরত্ব নেই।

বিপরীত স্রোত

অভিযুক্ত একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট প্রতিদিন কত করে ঘুষ খাচ্ছে, সে হিসেব করতে থাকলে কয়েক বছরে তার লাখপতি হওয়ার কথা। কিন্তু এমনও ঘটনা ঘটে যে, তারই মক্কেলদের হাতে ধারাশায়ী হয়ে হাসপাতালে গিয়ে তাকে একদিনে কয়েক মাসের আয় বের করে দিতে হয়।

ঘটনা তাই চিরদিন সমতলে চলে না। তাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। মার খেতে খেতে একজন প্রজা-কৃষকও জমিদারকে জুতা পেটা করে এবং একজন 'অবলা' নারীও অপমানিত হতে হতে একপর্যায়ে কুড়াল বসায় প্রবল প্রতাপশালী প্রতিপক্ষের ঘাড়ে।

কাজেই সব ঘটনার বিকাশকে শুধু একভাবে দেখলে আমাদের আর পরের দিনের সূর্য দেখবার ইচ্ছে হবে না। কিন্তু পরের দিনের সূর্য আমরা দেখি। জেনারেশনের পর জেনারেশন দেখে। এক ধরনের বিশ্বাস এবং আশাবাদিতার উৎস বাস্তবে থাকে বলেই সবাই সুন্দরতর ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকে এবং তার জন্য সচেষ্ট হয়।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

গত দশ বছরে বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি অনেক ক্ষেত্রেই পাল্টেছে, পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আকাঙ্ক্ষা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি।

মহিলা পুলিশ, মহিলা আনসার বাহিনী আগে মানুষ কল্পনা করতে পারতো না। এখন কোমরে পিস্তল নিয়ে মহিলা পুলিশ হেঁটে গেলে কেউ অবাক হয় না। রাস্তা নির্মাণ, মাটিকাটা কিংবা অফিসের চাকরি সর্বত্রই মেয়েদের অংশগ্রহণ এখন তুলনায় অনেক বেশি।

খুব কম পরিবারই আগে বিদেশে চাকরির কথা ভাবতো। এখন অধিকাংশই ভাবে। ভাবে এবং চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা আগে সর্বোচ্চ মর্যাদা পেতো সমাজে, এখন মর্যাদা পায় বিদেশের যে কোন ধরনের একটা চাকরি।

যে কোন ধরনের ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ সংঘর্ষে এখন আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার সবার কাছেই পরিচিত। সশস্ত্র যুদ্ধের কথাও এখন আর এদেশের মানুষের কাছে গল্পের ব্যাপার নয়। তাদেরই করা একটা বাস্তব ঘটনা।

অনেক ধরনের জড়তাই এদেশের মানুষ নেড়ে ফেলেছে গত ১০ বছরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড়তা মুক্তির একটি শুভ দিক আছে। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতা সেভাবে বাড়েনি। যার ফলে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা, বাস্তবে এবং চিন্তায় পার্থক্য এখনও অত্যন্ত প্রকট। বাইরে নদী ভাঙছে, বন্যা হচ্ছে, খরা

হচ্ছে; ভেতরে মানুষকে নিজের ওপর করে তুলছে আস্থাহীন। ২০০০ সালে এ অবস্থার কতটা মোড় পরিবর্তন ঘটবে?

নদীর ভাঙন তখন কতটা বাড়বে? কিংবা চরের মারামারি কোন পর্যায়ে যাবে? লাঙলের ফাল কি বদলাবে? জমির ফসল তখন বছরে কতবার বন্যা, খরা আর পোকায় নষ্ট হবে? কিংবা তা কি উৎপাদকের ঘরে যাবে? জমিতে পানি আনার জন্যে তখন কৃষককে জমি বন্ধক রাখতে হবে? শ্রমিক ঘুম বন্ধ করে দিয়ে ২৪ ঘন্টা খাটবে, ১ বেলা খাবার জন্যে? বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা ব্যক্তি না খেয়ে কবিতা পড়ে প্রফুল্ল থাকবে? কোটিপতি কি প্রতিদিন ইউরোপের শহর থেকে একবার এসে দেখে যাবে তার চারণক্ষেত্র? প্রশ্নগুলো আসে।

একইহারে চললে সম্ভাব্য দ্রব্যমূল্য (টাকায়)

পণ্য	১৯৭০	১৯৮০	২০০০
চাল (মণ)	৩০	২৪০	১৫,৩৬০
মাংস (সের)	২	২০	২,০০০
ডিম (১ হালি)	৮ আনা	৬	৮৬৪
টেলিভিশন	১,০০০	৬,০০০	২,১৬,০০০
মজুরি	৭০০	১,৪০০	৫,৬০০

মানুষ যন্ত্রচালিত পুতুল নয়, তার নিজস্ব সত্তা আছে এবং প্রকৃতির সাথে এটাও সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের বিকাশ সংঘটিত হয়েছে। এই সম্পর্ক মানুষের সাথে প্রকৃতির, মানুষের সাথে সমাজ সংগঠনের। এ সংগঠনের চরিত্র শান্ত নয়। ক্রমাগত বিকাশের মধ্য দিয়ে এই সংগঠনের রূপ পাল্টাচ্ছে। কাজেই প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় সব শর্ত স্থির ধরে হিসাব করলে কিছুই বোঝা যায় না। হয় পরিকল্পনাবিদদের মত, রাষ্ট্রনায়কদের নির্দেশ অনুযায়ী, পাঁচ বছরে সব সমস্যা মেটানোর হিসাব সেখানে উপস্থিত হয় কিংবা দেখতে হয় ভয়াবহ ভবিষ্যৎ।

আগামি ২০ বছরে বাংলাদেশ, এই জনপদের মানুষেরা কেমন থাকবেন তা নির্ণয়ের দায়িত্ব এই অঞ্চলের মানুষেরই। পরিবর্তনশীল সকল শর্তাবলির মূল উৎস তারাই।

এ বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৯৭১ সালের ৯ মাসে বাংলাদেশে পাক বাহিনী মানুষ হত্যা করেছিল ৩০ লক্ষ। অন্যান্য নির্যাতনের কথা বাদ দিলেও শুধু এই হিসেবেই চলতে থাকলে কয়েক বছরে বাংলাদেশ জনশূন্য হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। বর্বর পাক বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে লেজ গুটিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে মানুষ মরেছেন ৬ লক্ষ এবং প্রথম ৩ বছরে রাজনৈতিক কর্মী খুন হয়েছেন প্রায় ২৫ হাজার। ত্রাস এবং নৈরাজ্যের কথা বাদ

দিলেও এই অবস্থা সেভাবে চলতে থাকলেও এ দেশের অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়। কিন্তু তা হয়নি। একদলীয় শাসন করে, অনেক বাহিনী গঠন করবার পরও, সেই ধারা টেকেনি।

ষাট দশক থেকে চললেও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ গভীর ও অগভীর নলকূপের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। ১৯৭০ থেকে '৮২ সাল পর্যন্ত অগভীর নলকূপের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১১ গুণ। সে হিসেবে ২০০০ সালে অগভীর নলকূপের সংখ্যা এদেশে ১০ লাখেরও ওপরে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা যায়নি। যাওয়ার উপায়ও নেই। গত মাসে উত্তরাঞ্চলের সরকারি বিশেষজ্ঞরাই জানিয়েছেন সেখানে আর শতকরা ৫ ভাগ নলকূপ বেশি বসালেই অন্য নলকূপগুলোও পানি পাবে না।

সুতরাং সব ঘটনারই একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এবং এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকেই সব ঘটনার দিক নির্ণীত হয়। বাংলাদেশও ২০০০ সালে কোন পর্যায়ে পৌছবে, কী ধরনের জীবনযাপন করবেন এদেশের মানুষ, তা নির্ভর করে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘাত এবং তার ফলাফলের ওপর। ঘটনা প্রতিক্রিয়াহীন চলতে থাকলে এক নারকীয় ভবিষ্যতকেই আমাদের বরণ করে নিতে হবে।

বিচিত্রা, ১৩ মে ১৯৮৩

২০০০ সাল : আরও কয়েকটি কথা

২০০০ সালে বাংলাদেশের কী অবস্থা হতে পারে তা অনুমান করতে গিয়ে বর্ষ শেষ সংখ্যায় কিছু গড়পড়তা হিসাব দেওয়া হয়েছিল। এই হিসাবগুলো থেকে যে চিত্রটি বেরিয়ে এসেছে তা দেখে অনেক পাঠকই আঁৎকে উঠেছেন। অনেকে এগিয়ে গিয়ে সূক্ষ্মতর পদ্ধতিতে হিসেব করতে চেষ্টা করেছেন–যে কয়টির কথা জেনেছি তাতে ফলাফলের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি–কিছুটা হেরফের হয়েছে মাত্র। এখানে বলে রাখা ভালো, ঘটনা যদি প্রতিক্রিয়াহীনভাবে চলতে থাকে এবং সব শর্তগুলো যদি স্থির থাকে তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবনতির হারেও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি দেখা যাবে। তাতে করে যে চিত্র সে লেখায় উপস্থিত করা হয়েছে, তার থেকেও ভয়ঙ্কর চিত্র বাস্তবে সৃষ্টি হবে।

বিষয়টি শুধু হিসাবের নয়-সাময়িকভাবে আঁৎকে উঠে আবার গতানুগতিক জীবনে ফিরে যাবারও নয়; বিষয়টি উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী ক্রিয়াশীল হওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আম গাছ যখন পড়ে যেতে থাকে, গাছের সাথে মাটির যোগসূত্র যখন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়, তখন একমাত্র অন্ধ ছাড়া কে ঐ গাছে আম খাবার লোভে উঠতে যায়?

দুই

পরিস্থিতির এই অবনতিশীল অবস্থায় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখবার জন্যে বিদ্যমান রাষ্ট্র এবং সমাজের মুখপাত্রদের মুখে অনেক রকম কথা শোনা যায়। এসব কথায় মোহগ্রস্ত হন শুধু নিরক্ষর জনগণই নন, অনেক 'বুদ্ধিদীপ্ত' মানুষও।

চীনের একটি উপকথা আছে। সেখানে একটি অঞ্চলের মানুষ ড্রাগন দেবতা-র পূজা করতো। দিনের পর দিন বছরের পর বছর তাদের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে অবশেষে সে 'দেবতা' ড্রাগন তার প্রকৃত রূপ নিয়ে একবার পূজক ব্যক্তিদের সামনে হাজির হয়েছিল। নানারকম অনুষ্ঠান-অলঙ্কার নিয়ে যারা এতদিন ধরে 'ড্রাগন' পূজা করেছে তারাই ড্রাগনের আসল রূপ দেখে পড়ি কী মরি করে দৌড়ে পালিয়েছিল। বহু বছর ধরে যে কর্তারা নানারকম কথার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন এক সময়ে তাদের অবস্থাও এই পূজারীদের মতো হতে বাধ্য।

তিন

সমাজ সংগঠনের গুণগত পরিবর্তন একসময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে তারই অভ্যন্তরীণ শর্তসমূহের চাপে। এসব চাপ উপলব্ধি করা আর সে অনুযায়ী ক্রিয়াশীল হওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব এসে বর্তায়, সব যুগে সব সমাজেই, সমাজের বুদ্ধিজীবীদের ওপর। শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, গবেষকসহ বুদ্ধিবৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই অর্থাৎ এই বুদ্ধিজীবীরাই সচেতন অংশ হিসেবে আম গাছ পড়ে যাবার লক্ষণ আগে থেকে বুঝতে পারেন এবং সে অনুযায়ী আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তনের, নতুন শক্তি সংগঠিত করার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাদের পক্ষেই সম্ভব হয় যাদের মানুষ হিসেবে ন্যূনতম সম্মানবোধ থাকে। কেননা যে ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে সম্মান করতেও কুণ্ঠিত, তার পক্ষে অন্যদেরকেও অপমান এবং বিভ্রান্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ থাকে না।

যে সাংবাদিক নিজেকে 'বেশ্যা' বলতে কুণ্ঠিত হন না, যে লেখক নিজেকে 'ভাড়াটে' বলতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন না, যে শিক্ষক বলেন 'নোটবই মেরে দিয়েই চালাচ্ছি' কিংবা যে গবেষক গবেষণার ফলাফল পয়সাদাতার খুশির জন্যে ইচ্ছামতো রদবদল করেন তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানবোধ থাকার কথা নয় এবং তারা নিজেদের সম্পর্কে যা বলেন, তারা আসলেও তার থেকে নিকৃষ্ট ছাড়া আর কিছু নন।

কিন্তু এরাই সমষ্টি নন।

চার

যে সমাজে মুখোমুখি, পরস্পরবিরোধী স্বার্থ নিয়ে জনগোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে থাকে সেখানে বুদ্ধিজীবীরা অখণ্ড থাকে কী করে? স্বয়ং 'সৃষ্টিকর্তা'ও তো সেখানে খণ্ডিত হয়ে যায়।

একজন চোরাচালানি যখন খোদাকে স্মরণ করে, তখন সে খোদার কাছে চোরাচালানের নিশ্চয়তা চায়; একজন জোতদার যখন খোদাকে স্মরণ করে, তখন সে আরও বেশি জমি বানাবার সুযোগ চায় খোদার কাছে; একজন ব্যবসায়ী যখন খোদার কথা স্মরণ করে, তখন সে তার কাছে জিনিসপত্রের দাম আরও অনেক বেশি বাড়ানোর অছিলা কামনা করে; ক্ষমতাবান অত্যাচারী যখন খোদার কথা স্মরণ করে, সে তখন অত্যাচার আর কপটতা বজায় রাখার জন্যে আরও বেশি সুযোগ ও ক্ষমতা কামনা করে।

অন্যদিকে, যে শ্রমিক মুহূর্তে মুহূর্তে খোদাকে ডাকে সে জিনিসপত্রের দাম কমাতে বলে, মজুরি বাড়াতে বলে, গরিব কৃষক বন্ধকি জমি উদ্ধারের পথ দেখাতে বলে, ভূমিহীন কাজ চায়, অত্যাচারিত নারী-পুরুষ অত্যাচারিতের বিরুদ্ধে খোদাকে ডেকে ফরিয়াদ জানায়।

খোদা এখানে একবার অত্যাচারী, মুনাফালোভী, শোষকদের বন্ধু; আর একবার অত্যাচারিত দরিদ্র শোষিতদের বন্ধু। তাই তার অস্তিত্বও এরকম সমাজে, শ্রেণীগোষ্ঠী নির্বিশেষে, অভিন্ন নয়।

সেক্ষেত্রে এরকম অবস্থায় সবকিছুর উর্ধ্বে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোন শক্তি থাকতে পারে?

পাঁচ

সমাজের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে এমন মানুষের সংখ্যাই গরিষ্ঠ, যারা মনে করেন সুপারিশ দিয়ে, কিছু ঠিকঠাক করে অবস্থার উন্নতি সম্ভব।

এরকম গল্প আছে যে, হঠাৎ একদিন নিজের মোষকে হাসতে দেখে হতবাক কৃষক তার ভাইকে ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করায় ভাই বলেছিল–সাতদিন আগে মোষের গায়ে কাতুকুতু দিয়েছিলাম। সেই কাতুকুত বোধহয় চামড়া ভেদ করে পৌছতে পৌছতে সাতদিন লেগেছে। এখন তাই এ হাসি। মোষের চামড়ার অনুভূতিশক্তি সেরকম হলে তা সাতদিন পরে পৌছাতে পারে এবং মোষটির যদি তা উপলব্ধি করার মতো ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে তবে তা কয়দিন পরেও হেসে উঠতে পারে।

কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের যদি চরিত্রই এরকম হয় যে, তা হাসবার উপযোগীই নয়, তার সব রকম গঠন প্রকৃতিই হচ্ছে ভিন্ন রকম, তাহলে হাজার কাতুকুতু দিয়েও তাকে হাসানো যাবে না। হাসি দেখতে চাইলে তাকে পাল্টাতে হবে, সে রকম গঠন প্রকৃতির যন্ত্র বানাতে হবে।

ছয়

কর্তৃত্ব অনেক সময় নিজের স্বার্থেই বাস্তবতাকে চাপা দিয়ে রাখতে চায়। সময় যেতে থাকে-ঘটনার বিকাশ, প্রকৃতির বিকাশ অপ্রকাশিত থাকে।

কিন্তু অপ্রকাশিত থাকলেই বাস্তবতার গতি স্তব্ধ হয়ে যায় না। চামড়ার নিচে আস্তে আস্তে একরকম বসন্ত রোগ যেভাবে শরীর ক্ষয়ে নিয়ে নিতে থাকে, সে রকম বাস্তবতার চাপা বিকাশও একধরনের চরম পরিণতির দিকে এগুতে থাকে। কী রকম পরিণতির দিকে আমরা ক্রমশ এগিয়ে ২০০০ সালের দিকে যাচ্ছি তা বুঝতে হলে তাই অপ্রকাশিত বাস্তবতার দিকেই মনোযোগ দিতে হবে বেশি করে।

২০ মে, ১৯৮৩

বন্যার স্থায়ী সমাধান কি অসম্ভব?

বন্যার পানি নামছে। বন্যাদুর্গত অঞ্চলের লোকজন আবার ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। যাদের জমি জমা সহায়-সম্পদ আছে তারা তাদের জীবন নতুন করে শুরুর পরিকল্পনা করছেন। যাদের বন্যার আগেও কিছু ছিল না, তাদের নতুন করে ভাবার কিছু নেই। কিন্তু তাদের একমাত্র সম্পদ খুপড়ি গেছে; বাসনপত্র, কাপড়, হাঁস-মুরগি বা গাছপালার মতো সহায়-সম্পদ আর ফিরে পাবার উপায় নেই।

নতুন করে তাদের আগের অবস্থাতে ফিরে যেতে হলে নিজেদের আগে টিকে থাকতে হবে। সেটাও এখন অনিশ্চিত। যারা দরিদ্র কৃষক, তাদের জীবন ও সামাজিক নড় বড়ে অবস্থান এবারের বন্যায় ধ্বসে গেছে। বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলার জন্যে তাদেরকে শেষ সম্বল একমাত্র ভরসা জমিটুকু বিক্রি করতে হবে। জমি যে ঠিক দামে বিক্রি হবে, বিক্রির পর তার নতুন জীবন যে স্থিতিশীল হবে সেটা নিয়ে আশ্বস্ত হওয়ারও কোনো উপায় নেই।

এই বছরের বন্যায় প্রায় দুই কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ৪৭টি জেলার ৩১৯টি উপজেলার ১ হাজার ৪৬০ বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ২৩ লাখ একর জমির ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে। ১৫ লাখ একর জমির ফসল আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে। ১৫ লাখ ঘরবাড়ি আংশিক বা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২১ হাজার গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটেছে। বন্যার আক্রমণেই এ পর্যন্ত মারা গেছেন প্রায় ৬'শ মানুষ। বন্যা পরবর্তী অসুস্থতা ও খাদ্যাভাবে আরো অনেক মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।

অবকাঠামোগত ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে বিস্তর। ২৩৪৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২২৮টি সেতু ও কালভার্ট আংশিক বা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়েছে। রেললাইনেরও বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। সারা দেশে বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২২৫০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার।

বন্যা তাই একদিকে সামগ্রিক অর্থনীতিকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তেমনি কোটি কোটি মানুষকে ঠেলে দিয়েছে অধিকতর অনিশ্চিত জীবনের দিকে। যারা বন্যায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হননি, তারাও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, যাতায়াতের অব্যবস্থা ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

গত তিন দশকে বন্যায় সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ বর্তমান বাজার দরে ৩০ হাজার কোটি টাকা।

বন্যায় সকল শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটা একটা প্রচারণা। দেশের ১০ কোটি মানুষের মধ্যে ৮ কোটি মানুষই দারিদ্র্য সীমায় অথবা তার নিচে বসবাস করেন। বন্যা তাঁদের বর্তমান কাজের সুযোগ কেড়ে নিয়েছে, ভবিষ্যতের শ্রমশক্তিকে দুর্বল করেছে। যাদের কিছু সম্পদ ছিল তারা নিঃস্ব হয়ে বেকার সর্বহারার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। দারিদ্র্যের ভয়াবহতার সুযোগে সম্পদ এদের হাত থেকে সম্পদশালীদের হাতে যাচ্ছে। চোরাচালান, কালোবাজারী, মজুদদারীর মাধ্যমে স্ফীতকায় হচ্ছে একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা। বন্যার সুযোগে তথাকথিত বিদেশি সাহায্যের আগমন কমিশন ভোগী এজেন্টদের আরও স্ফীত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

উৎপাদন ব্যবস্থাকে বন্যা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাতে শাসক শ্রেণীর জন্যেও তা সুখকর হওয়ার কথা নয়। অর্থনীতি বস্তুসম্পদ, শ্রমসম্পদের এরকম পাইকারি অপচয় অনুমোদন করে না। তাহলে এদেশে বন্যার স্থায়ী প্রতিকার হচ্ছে না কেন? প্রশ্ন উঠেছে, এর প্রতিকার কি আদৌ সম্ভব নয়, এটা কি বাংলাদেশের ক্ষমতার বাইরে?

বন্যা বাংলাদেশে আজ নতুন নয়। ব্রিটিশ আমল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ বন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করছেন। এই বন্যা তাণ্ডব রূপ নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষকে বিপর্যস্ত করেছে অনেকবার। ১৯১৭, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭৪, ১৯৮০, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালগুলো হচ্ছে এই পর্যন্ত বড় বড় বন্যার বছর। এসব বন্যায় মানুষের দুর্ভোগ ছাড়াও বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। প্রতিটি বন্যা ও পরবর্তী আকাল কিছু লোককে কোটিপতি করেছে, কিন্তু অর্থনীতির উৎপাদনশীল ভিত্তিকে বার বার ধ্বসিয়ে দিয়েছে।

এরপরও আমার লক্ষ্য করি, এদেশে কখনই কার্যকরভাবে বন্যা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। '৫০-এর দশকে বিদেশি বিশেষজ্ঞ দিয়ে যে স্টাডি করা হয়, তার পরিণতিতে তৈরি হয় ওয়াপদা, বেশ কিছু বাঁধ। তৈরি হয়েছে এমন কিছু ব্যয়বহুল প্রকল্প (গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের মতো) যেগুলো বছরের পর বছর বিদেশি সাহায্যের বিপুল চাহিদা তৈরি করছে কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন আংশিক কাজও এগুলো দ্বারা হচ্ছে না। উপরন্তু ৫০ দশকের ক্রুগ মিশনের প্রেসক্রিপশন যে ঠিক নয়, পরবর্তীতে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এমনকি পরীক্ষা-নিরীক্ষারও কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। ইদানীং আবারও বিদেশি সাহায্যের আওতায় বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা তোলা হচ্ছে, যা

ঘটলেও ক্রুগ মিশন থেকে ভিন্ন কিছু হওয়ার যুক্তি নেই। কেননা এসব কনসালট্যান্সি সবই কখনই কোন স্থায়ী স্থিতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসে না, বরং বিদেশি সাহায্যের অঙ্গীকৃত স্টাডি দ্বারা এমন কিছু পরনির্ভর প্রকল্প তৈরি হয় যাতে এসবের মাধ্যমে আরও বেশি বেশি 'বিদেশি সাহায্য' আসার ব্যবস্থা হয়। এতে কমিশন এজেন্টদের লাভ হয়। কাজের কাজ কিছুই হয় না।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, কেন বাংলাদেশের শোষক-শাসক শ্রেণী এদিকে অগ্রসর হয় না? বলা হয়, টাকার অভাব। টাকার কতটা অভাব সেটা নিরূপণের জন্যে কোন স্টাডি কি হচ্ছে? কিভাবে কতটা কম খরচে দেশের সম্পদ মবিলাইজ করে এ কাজটি করা সম্ভব সে বিষয়ে কোন তথ্য কি সরকারের কাছে আছে? নেই। সব কথাই অনুমান করে বলা হয়। বলা হয় না শুধু প্রচারও চালানো হয় যে, বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, কেননা তা অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য।

পৃথিবীর যেসব দেশ বর্তমানে 'উন্নত' পুঁজিবাদী, তাদের উন্নয়নের শুরুতে বুর্জোয়া শ্রেণী অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশও তাদের তাগিদেই হয়েছিল। উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের জন্যেই তারা এ কাজ করেছে। বাংলাদেশের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে এ প্রবণতা দেখা যায় না কেন? দু'টি মৌলিক পার্থক্য আছে; প্রথমত, এই বুর্জোয়া শ্রেণী স্বাধীন নয়, এদের অস্তিত্ব বিকাশ সবই সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও আনকূল্যের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণীর মুনাফা সর্বোচ্চকরণের সাথে উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের সম্পর্ক। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পথে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব, যে জন্যে তাদের মূল ভূমিকা হচ্ছে বৈধ বা অবৈধ ব্যবসা ও সাম্রাজ্যবাদের কমিশন এজেন্সি।

এক বিষচক্রের মধ্যে শাসক শ্রেণীও বাস করছে। তাদের বর্তমান অবস্থান ও ভূমিকার জন্যে অর্থনীতিতে সৃষ্টি হচ্ছে নৈরাজ্য এবং সে নৈরাজ্যের জন্যে তারা নিরাপত্তা বোধ করে না। নিরাপত্তা বোধ করে না বলে স্থায়ী সমাধানের দিকে তাদের আগ্রহ কম। এই অনাগ্রহ অন্যদিকে শোষণমূলক ব্যবস্থাকেই শেকড়হীন করে তোলে।

স্থায়ী ও স্থিতিশীল বিনিয়োগের পথে না গিয়ে কমিশন এজেন্সি অথবা বৈধ অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে দ্রুত মুনাফা অর্জন ও তার পাচার যেখানে শাসক শ্রেণীর মূল লক্ষ্য, সেখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তাদের কোন মনোযোগ থাকার কথা নয়, বরং বন্যা বা দুর্ভিক্ষ হলে যে বিদেশি সাহায্য আসে সে সাহায্য শ্রেণীগত শরীরে নতুন রক্ত সঞ্চালন করে। উপরন্তু বাঁধ ও সেচসহ এমন অনেক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা নদীর প্রবাহ রোধ করে বন্যার তীব্রতা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে বন্যা প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেগুলোর বাস্তবায়নে অর্থ দরকার এটা ঠিক। আবার বহু ক্ষতিকর প্রকল্প করবার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তা না করলেও বন্যা সমস্যার সমাধানে কিছু কাজ হয়। একইসাথে এটাও ঠিক যে, বিপুল জনশক্তির কার্যকর ব্যবহার সফলভাবে পুঁজির বিকল্প হতে পারে। কিন্তু এই বিপুল জনশক্তির ব্যবহার কখন সম্ভব? তখনই সম্ভব যখন জনগণ এই কাজের ওপর এবং এর সাফল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবেন।

বলা হয়, টাকার অভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা সম্ভব নয়। অথচ এটা স্বীকৃত সত্য যে, দেশে এখনই ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি 'কালো টাকা' রয়েছে। বিদেশি পত্রিকা থেকে আমরা জানি, জেনারেল রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে অনেক রথী মহারথীর বিদেশি ব্যাংক একাউন্টে শত-সহস্র কোটি টাকা জমা হচ্ছে। যে শাসক শ্রেণী দেশের রক্ত নিংড়ে বাইরে পাচারে লাভবান হয়, তাদের পক্ষে বন্যার স্থায়ী সমাধান বরং ক্ষতিকর। তাতে তাদের মুনাফা কমে যায়, তাদের মূল রক্ষক ও প্রতিপালক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এটি অনুমোদন করতে পারে না।

সেজন্যে বাংলাদেশের স্থায়ী বন্যা সমাধানের জন্যে এই শাসক শ্রেণীর উচ্ছেদ ছাড়া অগ্রসর হওয়ার চিন্তা অবাস্তব।

প্রস্তুতি, ২ সেপ্টেম্বর-১৯৮৭

তরুণের গন্তব্য কোথায়?

১. মেয়েটির বাবার মাসিক আয় এক হাজার টাকার কিছু ওপরে। নিম্ন মধ্যবিত্তের টিপিক্যাল চেহারাটি তার মধ্যে পরিষ্কার। বিবর্ণ বেশভূষা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত মলিনতা, একরাশ ক্লান্তি। বাবাকে পাশে নিয়ে মেয়েটি কখনও হাঁটে না। বাবা তার জন্যে বিরাট লজ্জা। নিজের অবস্থান অস্বীকার করার জন্যে কথা বলার সময় তাকে খুব সতর্ক থাকতে হয়। তার সামনেই আর একধাপ, আর এক সিঁড়ি। ওখানে পৌছাতে তাকে জানতে হয় এখানকার পোশাকে নতুন সংযোজনটি কি। ইংরেজি শব্দ-কষ্টার্জিত শুদ্ধ বাংলার সাথে যোগ না করলে দাম থাকে না। সেজন্যে ইংরেজি চর্চাও তাকে করতে হচ্ছে। ইংরেজির ভূত এখনও তাকে ছেড়ে যায় নি। টেলিভিশনের পামেলা স্টাইলের চুল ছাঁটছে অনেকে, তাকে তা আয়ত্ত করতে হয় আয়নায় বসে নিজের হাতেই। শুধু নিজেকে ঠিকঠাক রাখলেই তার চলে না। ছোট বোনকেও 'রেডি' করতে হয়, যাতে হঠাৎ করে সে ধরা পড়ে না যায়। নিজেকে বোনকে বদলে নিলেও বাবাকে বদলানো যায় না। এক স্থায়ী ক্ষতের মতো বাবার অবস্থান, তার সাথে ঘুরতে থাকে। সেজন্যে বন্ধুদের কাছে তাকে বলতে হয় বাবার মাথা খারাপ।

কদ্দুর যাবে এই মেয়ে? কদ্দুর সে যেতে পারবে? ধাপের পরই আর এক ধাপ, তারও পরে আরও ধাপ।

২. ছেলেটি ভাবতে পারে না তার কোন সাধ অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। ক্লাস করা তার কাছে সময়ের অপচয় মাত্র। যে কোন সময় সে সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, প্যারিস, নিউইয়র্ক, দিল্লি বেড়াতে যেতে পারে। রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা তার বাবার সাথে নানাভাবে সম্পর্কিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সূত্রেও পাওয়া এত ক্ষমতা সে কোথায় খাটাবে। তার কাজ বিশেষ নেই। সবাই তার পেছনে ঘুরবে- এই তার প্রত্যাশা। কিন্তু যখন একটি মেয়ে তার বয়সী, তাকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা দেখায় তখন তার ক্ষমতা প্রদর্শনের একটা সুযোগ এসে যায়। টাকা এবং ক্ষমতা নিয়ে সে ঘুরছে হুমকি দেখাচ্ছে। মেয়েটির ভাই নেই-পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে শক্ত বন্ধু নেই। কী ঘটবে এরপর? নতুন খবর হবে কিছু? ছেলেটার যে অহংকার তার পরিবার তার পকেটে পকেটে জমিয়ে দিয়েছে তার প্রকাশ আর কতভাবে ঘটবে? ছেলেটির বাবা নতুন ক্ষমতাবান। ছেলেটিও পেয়েছে তার স্বাদ।

৩. বাবা মধ্যপ্রাচ্যে থাকেন। প্রতি মাসে প্রচুর টাকা পাবার স্থায়ী উৎস পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে বাবার চাকরির ঐশ্বর্য আর এখানে একজন উচ্চ শিক্ষিত চাকুরের দারিদ্র্য তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে পড়াশোনার তার কোন প্রয়োজন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম থাকা ভালো। সুবিধা হয়। আছে তার নাম। ঐ পর্যন্তই। যে টাকা আসছে বাবার কাছ থেকে তা খরচ করতে হবে। তার জীবনযাপন, চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই এই টাকা নতুন করে গড়ে দিয়েছে। এই ছেলেটি কি বিভ্রান্ত? না এ সমাজের নবাগত? এরকম নবাগত এখন অনেক। টাকা দিচ্ছে নতুন সিঁড়ির সন্ধান। সবারই যেন ঠাঁই বদল হচ্ছে। এ পরিবারের সাথে নিকট অন্যদের দূরত্ব বাড়ছে।

৪. যে ছেলে পর পর দু'বার ইন্টারমিডিয়েট ফেল করেছিল, পরীক্ষায় পাস তার দ্বারা হবে না এরকম নিশ্চয়তা যে সৃষ্টি করতে পেরেছিল, মামা যাকে বলেছিলেন এরপর থেকে পরীক্ষার রেজাল্ট 'চিত্রালী' কিংবা 'পূর্বাণী' থেকে খুঁজে নিতে সেই ছেলে ক'দিন আগে জার্মান বউ নিয়ে চার পাঁচ বছর পর দেশে ফিরেছে। জার্মানিতে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা তার হয়ে গেছে। সবাই আসছে তাকে দেখতে বিস্ময়ের সাথে। এখন প্রচুর টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা তার আছে। অন্তত বাংলাদেশে এসে। পরিবারটি পুরনো মূল্যবোধ, চেতনায় বা পারিবারিক সমন্বয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে থমকে গেছে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ বাবা ঠিকভাবেই দিতে পারেন। বাবার সেরকম জমিজমা, ব্যবসা ইত্যাদি গ্রামে আছে। কিন্তু গ্রামে যাওয়া যায় না। গ্রামের পুরনো বন্ধু-বান্ধবরা দুনিয়ার কোনকিছুই জানে না। টিভি সিরিজ কিংবা খেলাধুলা কিংবা বিদেশের জীবনযাপন ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বললে তারা শুধু শোনে। কিন্তু বাড়িতে না গেলে বাবা টাকা দিতে চান না ঠিকমতো। মাঝামাঝি সমাধান হিসেবে ছেলে বাবাকে তার প্রেস্টিজ সম্পর্কে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে ঢাকা থেকে ক'দিন আগে ব্যাটারিচালিত টিভি কিনে নিয়ে গেল। গ্রামের প্রতিযোগিতার জন্যে এক মাসের মধ্যে সেখানে আর একটি পরিবারের টিভি গেল।

মফস্বল শহরের ধুমধাম চলচ্চিত্র যে গ্রামীণ তরুণদের ফ্যাশন, আধুনিকতা ইত্যাদিকে নির্ধারণ করত তাদের চিন্তা-ভাবনার দৌড় এখন হয়তো আরও বাড়লো। জমি বেচে মধ্যপ্রাচ্যে যাবার তাড়না সে গ্রামে কি আরও বাড়বে এখন? কিংবা বন্ধকী জমি নিজের নামে নিয়ে আসার তাড়া বাবার সাথে সাথে নিজেও ব্যবসায় নেমে যাবার তাড়া কি ঐ গ্রামের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের স্পর্শ করবে?

৬. ছেলেটি গত বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। এক মেয়েকে নিয়ে ঐ ছেলের গ্রুপের সাথে অন্য একটি গ্রুপের গন্ডগোল। গণ্ডগোলের উৎস হচ্ছে এই গ্রুপের একটি ছেলে ঐ মেয়েকে ভালোবাসতো। মেয়েটি ছিল নিম্নবিত্ত ঘরের। বাবার রোজগার ছিল খুব কম। সামাজিক সম্মান বাঁচানোর মতো প্রতিরোধ ক্ষমতাও তার ছিল না। অল্পবয়সী স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে নিজের

ইচ্ছামতো গড়ে তোলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পাড়ার কিশোর তরুণদের কয়েকজন এ সুযোগ ছাড়েনি। এরা মেয়েকে নিজেদের রক্ষিতা বানিয়ে ফেলেছিল। মেয়ের ইচ্ছা অনিচ্ছা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ইস্যু। আগের গ্রুপের ছেলেদের সাথে এই ছেলেদের এই প্রশ্নেই বিরোধ। অল্প বয়সী কিশোরদের মধ্যে এ বিরোধ ক্রমেই উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং একপর্যায়ে এই গ্রুপের ছেলে খুনের হুমকি দেয় এবং খুন হয় কলেজে ক'দিন আগে ভর্তি হওয়া একটি ছেলে। যখন এই ছেলেরা খুনের হুমকি দেয় তখন তা কথার কথা থাকে না, আসলেই তারা মিন করে। প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের কাছে এখন অনেক গুরুত্ববহ। জীবন সে তুলনায় তাদের কাছে মূল্যহীন।

৭. পাস করেছে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, গ্রামের ছেলে। গ্রামে ফিরছে না। তার সাথে গ্রামের পরিবারের আর মেলে না। গ্রামে গেলে সে সবার অতিথি হয়ে যায়। এখন তাকে খুঁজতে হয় নাগরিক অস্তিত্ব। অথচ পিতা সর্বস্বান্ত হয়েছে একে পড়াতে গিয়ে। ছেলেটি জানে এখন চাকরি দিয়ে পুরো গ্রামীণ পরিবারকে নাগরিক করা সম্ভব নয়। অতএব এ গ্যাপ আর মিটবে না। তাকে শ্রেণী উত্তরণ ঘটাতে হবে।

এগুলো কয়েকটি চিত্র, বর্তমানের। চিঠিপত্র ও অনুসন্ধান থেকে পাওয়া। কিন্তু শুধু এগুলো থেকেই নতুন জেনারেশন, বর্তমানের কিশোর-তরুণদের সম্পর্কে কোন উপসংহারে যাওয়া যাবে না। ওপরের ঘটনাবলি থেকে আমরা শুধু একটি উপাদানকে পাচ্ছি, সেটি হচ্ছে ক্ষমতার স্তর ও অবস্থানের নির্ণায়ক টাকা। কিন্তু এর অনুষঙ্গ আরও আছে এবং এর প্রকাশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অনেক উৎস আছে-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গতি-প্রকৃতির অনেক মাত্রা আছে। সেগুলোও আমাদের বিচার করতে হবে। এখানে আমাদের বিষয় জেনারেশন গ্যাপ।

বর্তমানে এই জেনারেশন দেখে অনেকে বলেন, এরা একটু অন্যরকম। উচ্চাভিলাস যাদের পূর্ব পুরুষদের মতো না, অথচ উচ্চাভিলাস ও জীবনযাপনের সাথে পূর্ববর্তী জেনারেশনের সংগতিও নেই।

এরা কোন জেনারেশন? এদেরকে কি আমরা মার্কিন মুল্লুকের ষাট দশকের হিপ্পী কিংবা ইউরোপের এ্যাংগরি জেনারেশনের সাথে তুলনা করতে পারি? হতাশা থেকে জন্ম হয়েছিল এই নেতিবাচক আন্দোলন। যা ৬০ দশকের শেষে এসে পৃথিবীময় রূপ নিয়েছিল তরুণের বিদ্রোহ হিসেবে। আমাদের দেশে কি ঘটছে তেমনি কোনো তারুণ্যের অভ্যুদয়?

'৬০-এর হিপ্পি এবং এ্যাংরি জেনারেশন

ষাট দশকের মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিপ্পি নামে কথিত জেনারেশনের যে উত্থান দেখা গিয়েছিল দশকের শেষে তার রূপান্তর ঘটে। নৈর্ব্যক্তিক ক্ষয় থেকে তা রাগী তরুণে রূপান্তরিত হয়। এখন তাও স্তিমিত এবং আর তেমন কোন সাড়াশব্দ নেই। এই ষাট দশকের ইউরোপের তরুণদের বাঁধ ভাঙা জোয়ারের

মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। তা থেকেই তাদের নাম হয়েছিল এ্যাংগরি জেনারেশন। এ দুই ক্ষেত্রেই তরুণ মানে ছিল প্রধানত ছাত্র। আর তৎকালীন পূর্ব বাংলা, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দুর্বল রাষ্ট্রেও দেখা গিয়েছিল তরুণদের বিপুল শক্তির প্রকাশ। এই শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সংগ্রামে, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এখানে চেগুয়েভারা, দুবরে ও চারু মজুমদার হয়ে ওঠেন সংগ্রামের এক একটি প্রতীক।

প্রাথমিক হিপ্পি দর্শন অস্বীকার করেছিল সব পার্থিব আকর্ষণকে। পার্থিব জীবন, পার্থিব জীবনের সব মোহ থেকে মুক্ত হয়ে অরণ্যে চলে যাবার প্রবণতাই ছিল এর মধ্যে প্রধান। প্রযুক্তিগতভাবে উচ্চ বিকশিত একটি রাষ্ট্রের তরুণরা কেন সে সময় অরণ্যে চলে যেতে চেয়েছিল? এই যেতে চাওয়া শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে সময়কার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-লেখক কবিও এদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হার্ভার্ড ক্যাম্পাসে গাঁজা ভাঙ ইত্যাদির নিয়মিত আসর হতো। জ্যাক কেরুয়া গিনসবার্গ প্রভৃতি কবি ছিলেন এসবের উচ্চ কণ্ঠের তাত্ত্বিক ও মুখপাত্র।

সময়টা ছিল ভিয়েতনামে মার্কিনী গণহত্যা, আগ্রাসন ইত্যাদি বীভৎসতার। ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনগণ তীব্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করায় সে সময় মার্কিন সৈন্যবাহিনীর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ চালাতে সরকার আইন অনুসারে তরুণ যুবকদের মধ্য থেকে বাধ্যতামূলকভাবে জিআই সংগ্রহ করতে থাকে। পরিবারে পরিবারে দেখা দেয় সঙ্কট, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বজায় রাখার শিকার হন মার্কিন জনগণ, বহু পরিবার তাদের তরুণ-যুবক সদস্যকে হারায় চিরদিনের জন্যে। প্রত্যক্ষ যুদ্ধবিরোধী মনোভাব একসময় বিক্ষোভে রূপ নেয়। যুদ্ধবিরোধী এই বিক্ষোভই ছাত্র-তরুণদের এক ব্যাপক অংশের মধ্যে হিপ্পিজম-এর জন্ম দেয়। এ সময় মার্কিন জনগণ দুই জেনারেশনে ভাগ হয়। একদল জনসনের 'গ্রেট জেনারেশন' তাদের স্লোগান 'ব্যাড অর গুড, ইট ইজ আমেরিকা'।

গাঁজাখোর হলে যুদ্ধে পাঠাবে না, যুদ্ধের জন্যে এরকম নেশাখোর আনফিট-এই ধারণা থেকে গাঁজা ড্রাগসের প্রতাপ বাড়তে থাকে। যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ একসময় বিদ্যমান সব আইন-কানুন, নিয়ম বিধি, শৃঙ্খলা সবকিছুর বিরুদ্ধে যায়। নৈরাজ্যিক সব চিন্তা-ভাবনা এবং আচার-আচরণ শুধু পোশাক-আশাক নয়, সংগীত, নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা সবকিছুকেই স্পর্শ করে। এদের ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয় ফ্লাওয়ার বেবি হিসেবে। 'ফ্যাড-ফ্যাশন' হিসেবে এক অংশের কাছে মার্কসবাদ গৃহীত হয়। রেভুলিউশন ইন দ্য রেভুলিউশন তখন বেস্টসেলর। এ চেতনা অন্যান্য দেশের তরুণদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। ফ্রান্সে ছাত্রদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাই ইউরোপের ছাত্রদেরকে সব বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চকিত করে তোলে। ইংল্যান্ডে আভিজাত্যের ফরমালিটিজকে ছাত্ররা ঝাঁটাপেটা করতে থাকে।

পোশাক, কথাবার্তা, গান, উপন্যাস, নাটকের সংলাপ ইত্যাদিকে আভিজাত্যের কৃত্রিমতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার এক প্রায় অপ্রতিরোধ্য অভিযান চালায় তরুণরা। স্যুটের বন্ধন তাদের জন্যেই আজ অনেক শিথিল। সব বিধি-ব্যবস্থাই অস্বীকার করার জন্যে তারা উন্মাদ হয়ে ওঠে। নাম হয় তাদের 'এ্যাংগরি জেনারেশন'।

জাপানে দেখা দেয় ব্রেড আর্মির নড়াচড়া। উন্নত দেশে 'উইমেন লিব' যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তাতে তরুণ নারীদেরই সক্রিয় ভূমিকা ছিল প্রধান। যৌন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই তাদের এই চিৎকার উঠেছিল। তারা পূর্ব জেনারেশনের নারীসুলভ নমনীয়তা-রমণীয়তাকে অস্বীকার করে।

একচেটিয়া পুঁজির বিপুল স্ফীতি উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বে শুধু অর্থনৈতিক নয় সামাজিক ক্ষেত্রেও সৃষ্টি করছে সঙ্কট। পুঁজির স্ফীতির প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদকে ভিয়েতনামে বোমা ফেলতে হয়েছে, বাংলাদেশে গণহত্যায় সাহায্য করতে হয়েছে, এঙ্গোলা, নিকারাগুয়া, সালভেদরে যেতে হচ্ছে আগ্রাসনে। পুঁজির এই ভূমিকা মানুষের মানবিক বিকাশকেও দমিয়ে রাখে। এই যাবতকালের সর্বোচ্চ বিকাশপ্রাপ্ত সভ্যতার নাগরিকরা হয়ে থাকে পুঁজির দাস, মুখ বাধা সুশ্রী মানুষ। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা প্রকট হয়।

এই অসহায়ত্বের বিরুদ্ধে মার্কিন মুল্লুকে আর ইউরোপে তরুণরা বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহের কোন ইতিবাচক চরিত্র ছিল না। তাদের কাছে তখন সমাধান ছিল সভ্যতার সকল চিহ্নকে অস্বীকার করে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া, সমাধান ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নিজেদের অস্তিত্বকে প্রকাশ করা। চিৎকার করে বল আমরা আছি, আমরা মানুষ, আমরা মানি না এত বাঁধন। সমাধান ছিল। ছিঁড়ে খুড়ে বেরিয়ে দৌড়ে কোন অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ছোটা। তরুণদের এই উন্মাদনার মধ্যে সবচেয়ে বড় যা ছিল তা হলো প্রচলিত সকল মূল্যবোধকে অস্বীকার করা। এই অস্বীকার করার মধ্যে অনেক অসংগতি ছিল, কিন্তু তা প্রকাশ করেছিল পুঁজিবাদের অমানবিকতার বিরুদ্ধে মানবিক অনুভূতিকে। এই বিদ্রোহ নাড়িয়ে দিয়েছিল রাষ্ট্র এবং সমাজের স্থিতাবস্থাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে যে কারণে ভিয়েতনামে পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছিল, তার মধ্যে এটাও ছিল একটি। এই বিদ্রোহে যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। ইউরোপে অনেক সংস্কার লাটে উঠেছিল। ঘটনার এসব পরিণতি তরুণদের উন্মাদনাও কমিয়ে দিয়েছিল।

বাংলাদেশের বর্তমান তরুণদের কথিত 'এমবিশনের' সাথে কি এরকম বিদ্রোহের সম্পর্ক আছে কোন? এটাও কি দুই জেনারেশনের চেতনার সংঘাত থেকে ঘটছে?

প্রশ্ন : জেনারেশন গ্যাপ

নতুনের সাথে পুরনোর যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী তারই আর এক রূপ হচ্ছে 'জেনারেশন গ্যাপ'। প্রবীণরা এক সময়ে যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে নিজেদের লিবারেল

ভাবেন, কিংবা আসলেই উদারনৈতিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তাদের সেই অবস্থানই আরেক সময়ে এসে রক্ষণশীলতায় পর্যবসিত হয়। নবীণদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তা-ভাবনার সাথে তা মেলে না। সময় নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি করে, সে প্রয়োজন পূরণের জন্যে যে ভূমিকা নিতে হয় তা নিতে পারেন না বলে প্রবীণদের অধিকাংশ পিছিয়ে পড়েন। তরুণরা এগিয়ে আসে সে প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এবং অপরিহার্য একটি সংঘাত সৃষ্টি হয় দুই জেনারেশনের মধ্যে। সংঘাত থেকে আসে উত্তেজনা, সে উত্তেজনা শুধু ইউরোপ আমেরিকাতেই নয়, আমাদের দেশেও আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি। এ সংঘাত আরও সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক বিভিন্ন উপক্রমণের মধ্যে; সৃষ্টি হয় মতাদর্শগত উত্তরণের মধ্যে।

এমন এক সময় ছিল যখন (বিশ দশকের দিকে এর একটা পরিণতি দেখা যায়) ইংরেজি ভাষা শিক্ষা নিয়ে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। ফারসি শেখার গর্ব নিয়ে তারা পিছিয়ে ছিলেন, তাদের বোকামিকে অস্বীকার করে তরুণরা এগিয়ে এসেছিলেন ইংরেজি শেখার জন্যে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির ছত্রছায়ায় ততদিনে এখানে মধ্যবিত্ত সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুসলমানরা দেরিতে হলেও তাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্যে সচেষ্ট হয়।

সরকারি চাকরিসহ নাগরিক উচ্চপদের বিভিন্ন পেশায় দেখা গেল এদের। এই জেনারেশনের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পুরনো সংঘাত কমে যায়। তিরিশের দশকে বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, মার্কসীয় মতাদর্শের প্রচার ইত্যাদির প্রভাব বৃদ্ধি তরুণদের আর একটি ধারা সৃষ্টি করল যাদের সাথে সংঘাত দেখা গেল সাম্প্রদায়িক ব্রিটিশ অনুগত চিন্তার সাথে। এই সংঘাতের কোন সফল পরিণতি আসেনি। তরুণদের মধ্যে ব্যাপক অংশও এতে যোগ দেয়নি। 'পাকিস্তান' জাতীয় একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা তখন মুসলমান তরুণদেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তুলেছে।

'৪০-এর দশকে যুদ্ধ, মহামারি, দুর্ভিক্ষের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো। পূর্ব বাংলা তখন নগরায়নের স্পর্শ তেমন পায়নি। ঢাকায় হাতে গোনা কয়েকটি গাড়ি। পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য হাত মেপে নেওয়া যায়। এ মোড় থেকে ও মোড় গেলে দু'জনের দেখা হয়। গ্রামের মুষ্টিমেয় যে ক'জন মুসলিম তরুণ-যুবক শিক্ষিত হয়েছিল, তারাই তখন পূর্ব বাংলার প্রশাসনের কর্ণধার হয়ে বসেছে। পাকিস্তানের স্বাধীনতা জন্ম দেয় নতুন এক গোষ্ঠী-গ্রামের জীবনধারাকে ছিন্ন করে যারা উঠে এসেছে। নতুন এক সামাজিক স্তর সৃষ্টি হয় এদের মাধ্যমে। এক নতুন জেনারেশন।

জেনারেশন গ্যাপের সামাজিক সংঘাত দেখা গেল এরপরই। সংঘাতের উৎস ছিল জাতিগত উৎস অনুসন্ধান। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের তরুণরা নিজেদের জাতিগত পরিচয়ে মোহমুক্ত স্লোগান তুললো। জাতিগত নিপীড়নের জন্যে ভাষার চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ঘটলো। বাংলা বনাম উর্দু এই বিরোধ হলো গ্যাপের প্রতীক। প্রবীণরা পাকিস্তানের অস্তিত্ব, ইসলামী চেহারা রাখবার মোহ, নিজেদের সাম্প্রদায়িক চেতনা ইত্যাদি দিয়ে তরুণদের ভাষা বুঝতে পারলো না।

দেখা গেল বাবা উর্দু শেখার জন্যে চাপ দিচ্ছেন, ছেলে অস্বীকার করছে। ছেলে নিজের নাম সংশোধন করার কথা ভাবছে। বাংলার জন্যে বন্দুকের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে সময় অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে উনিশ-বিশ বছরের তরুণরা অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো- নেতৃত্বেও তারাও চলে এল। পাকিস্তানের তাহজিব তমুদ্দুন মার্কা পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি প্রকাশিত হলো সুস্থ প্রগতিশীল বাংলা সাময়িকী একটি বা দু'টি, একেবারে তরুণদের। এখানকার সাহিত্য-সংগীত, নামকরণ ইত্যাদিতেও এর একটা বিরাট প্রভাব দেখা গেল। এ সংঘাত পুরো পাকিস্তান আমল ধরেই ছিল।

ষাট দশকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়, সত্যিকার অর্থে প্রথম এই অঞ্চলে মধ্যবিত্তের একটা বিকাশ ঘটে। এই মধ্যবিত্ত ভীষণভাবে পাকিস্তান এবং আয়ুব খানের অনুগত ছিল কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নগরায়ন কিছুটা ঘটলো। গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর বাড়লো। বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বাড়লো। মুক্ত চিন্তাও তরুণদের মধ্যে প্রসারিত হলো। যার ফলে ৫০ দশকের সংঘাত আরও উচ্চতর রূপ নিয়ে দেখা দিল এই দশকে। আয়ুবী এবং পাকিস্তানি মোহে আক্রান্ত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের অংশ একদিকে দাঁড়ালো-অন্যদিকে জড়ো হলো ছাত্র-তরুণ এবং নিম্নবিত্ত জনগণের বিভিন্ন অংশ। জাতিগত আত্মানুসন্ধানের পাশাপাশি তরুণদের মুক্ত চিন্তার বিকাশের মধ্য থেকে সমাজ পরিবর্তনের শ্লোগান উঠলো। এই পর্যায়ে দেখা দিল এক ধরনের জেনারেশন গ্যাপ। লিয়াকত জিন্না ক্যাপ কিংবা শেরওয়ানী পরিহিত বাবারা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ছেলেকে চিনতে পারলেন না। এক পর্যায়ে কেউ কেউ পোশাক পাল্টে ছেলের সাথেই যোগ দিলেন। এখানেই ঘটলো উনসত্তরের অভ্যুদয়।

১৯৭১ সাল

'৭১-এর যুদ্ধ পুরনো শাসন, প্রথা, চিন্তা, আত্মসমর্পণ আর আপোষের চিন্তা, বিভ্রান্তি মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে তরুণদের উত্তরণ ঘটালো নতুনভাবে। এখানে খেয়াল করলে দেখা যাবে ৫০-এর দশকে যে তরুণ বাবার সাথে যুদ্ধ করে নিজের চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছে 'তিনিই' ৭১-এ তার তরুণ ছেলের চিন্তাধারা হজম করতে চেষ্টা করছেন, দ্বিধাবিভক্তভাবে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তরুণদের মধ্যে যে অস্থিরতা, উত্তেজনা, সংঘাত দেখা গেল তা তাদের কাছে ছিল অজানা। কিন্তু নিশ্চিত এক বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অস্ত্র তখন তরুণদের হাতে ছিল। অস্ত্রের সঠিক ব্যবহারের কথা তারা জানতো না। তারা দেখলো নেতাদের, কর্তাব্যক্তিদের ভণ্ডামি, স্বৈরাচার, ত্রাস আর লুটপাটের চেহারা। তরুণদের একটি অংশ বিদ্রোহী হলো, কারও কারও কাছে সিরাজ শিকদার হয়ে উঠলেন নায়ক। আরেক অংশ

হয়ে গেল কর্তাদের হাতিয়ার। এই 'হাতিয়ার' তরুণরা পরবর্তীতে অনেকে শেষ হয়ে গেছে। অনেক তরুণ নতুন কর্তায় রূপান্তরিত হয়েছে।

রাষ্ট্র ধারণ করলো না মুক্তিযোদ্ধাদের। রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ অবয়বে মুক্তিযুদ্ধ থাকলো না। নেতারা হলেন বহিরাগত। সমাজও ধারণা করলো না। মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে গেলেন বিচ্ছিন্ন নতুন এক জেনারেশন। সৃষ্টি হলো তাদের নিজস্ব চেতনার নতুন বৃত্ত। কেউ মুখ লুকিয়ে নিলেন। কেউ বেরিয়ে এলেন, ক্ষিপ্ত, বিদ্রোহী।

১৯৭১-এর পর অন্যদিকে নতুন জোয়ার এল। মতিঝিলের ফাঁকা অট্টালিকায় লালবাহিনী নীলবাহিনী তৈরি করে নতুন তরুণরা ঢুকলো। পরবর্তীতে তারাই হয়ে উঠলো নতুন বণিক শ্রেণী। রাষ্ট্র সহায়তা করলো এই লুটপাটে। সৃষ্টি হলো নতুন কোটিপতি। জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর সুযোগ বাড়লো অনেক। আয়ের এবং ব্যয়ের। বাইরের বিশ্ব নিকটতর হলো। বিদেশ যাত্রা নতুন এক মাত্রা সৃষ্টি করলো। বিত্ত ভেঙে দিতে থাকলো পুরনো সব মূল্যবোধ।

পাকিস্তানি 'বনেদী' ধনীরা যেভাবে '৪৭ সালে সৃষ্টি হয়েছিল, এখানে প্রায় একই কায়দায় আরেক 'বনেদী' ধনী সৃষ্টি হলো। দুই পর্যায়েই জেনারেশন আসলে পূরণ করলো শূন্যতা-সৃষ্টি হলো না কিছু। এত বড় যুদ্ধেও এত বড় সংঘাতেও নবতর প্রেক্ষিত দেখা গেল না, রূপ বদল হলো শুধু।

উৎসের সন্ধান

উনিশ শতকের তরুণদের নিজেদের শেকড় সম্পর্কে উদাস দেখে সেই সময়কার সুলভ পত্রিকা লিখেছিল '... বিদ্যার্থীরা যতদিন বিদ্যালয়ে পাঠাবস্থায় অবস্থিতি করেন, ততদিন তাহাদিগের ভাবভঙ্গিতে এমত বোধহয়, যেন তাহাদিগের দ্বারা এদেশের সকল অসুখ অন্তর্হিত হবে। ... কিন্তু কী আশ্চর্য! পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলেই তাহাদিগকে অনেকেরি সে সমস্ত বাসনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়! তাহারা কেবল কিয়ৎকাল কিঞ্চিৎ বিষয়কর্ম মাত্র নির্বাহ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আলস্য ও দুরাচরণের দাস হইয়া অবশিষ্ট সমুদয় অমূল্য সময়কে নষ্ট করেন। ... কেহ কেহ ভার্যাসঙ্গ ও স্বোদর পূরণ করিয়াই কালহরণ করেন। কেহ কেহ আবার অহোরাত্র কেবল অপরিমিত পানভোজন ও বেশ্যা বিলাসাদি মহাঅনিষ্টকর, অসার আমোদে কালক্ষয় করিয়া থাকেন। (অনেক বিদ্বান ব্যক্তি দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ধনোপার্জনের দিকে ধাবিত হন। অনেক নবীন বিদ্যান যুবক ইংরেজদের মনে করেন তাদের মডেল)। ... হায়! এদেশের দশা আর কতকাল এইরূপ থাকিবে। কতকালে বিদ্বান ব্যক্তিরা বিদ্যানরূপ ব্যবহার করিবেন! কি দারুণ দুষ্কৃতি এ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে!'

যে তরুণদের কথা এখানে বলা হয়েছে তারা ছিল জমিদার এবং ইংরেজ সোহাগে লালিত রাজ কর্মচারীদের পুত্র। তারা সে সময়কার সুবিধাভোগীদের

প্রতিনিধিত্ব করতো। ইংরেজ শাসন শোষণের সাথে যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তীতে ইংরেজ আমলেই তরুণদের উল্লেখযোগ্য অংশ এদের বিপরীত চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। পাকিস্তান আমলেও তাদের দেখা গেছে। বাংলাদেশেও দেখেছি বিদ্রোহী তরুণদের। পাশাপাশি দুই বিপরীত চিত্র। ইংরেজ আশ্রিত বিত্তবানদের উত্তরসূরী হয়েছে আয়ুব আশ্রিত বিত্তবানেরা। তাদের উত্তরসূরী হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী বিত্তবানরা। এই বিত্ত অর্জনের সাথে দেশীয় অর্থনৈতিক বিকাশের সম্পর্ক ছিল না। আন্তর্জাতিক পুঁজির শোষণের ছোট তরফের অংশীদার হিসেবে এসব বিত্তবানরা গড়ে উঠেছে এবং এই বিত্তের একটা ব্যাপক প্রভাব পড়ছে তাদের সন্তানদের ওপর। বিত্তবানরা নিজেদের পরিচিত করে শাসকশ্রেণীর অংশীদার হিসেবে।

সাধারণ যে প্রবণতা আমরা স্বাধীনতাপূর্বকালে দেখেছি তা হচ্ছে, বিত্ত তখন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে গঠন করতো ঠিকই; কিন্তু এরপরও সেখানে ছিল জাতিগত নিপীড়নের ইস্যু, ছিল সামন্ত মূল্যবোধের প্রাধান্য। যে ইস্যুগুলো নিয়ে তরুণদের সাথে সৃষ্টি হয়েছে প্রবীণদের সংঘর্ষ। যতদিনে নতুনরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ততদিনে তারা নতুন রক্ষণশীল জেনারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশেষ করে গত কয়েক বছরে এ ঘটনার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

বিত্তের সন্ধানে তরুণ

সিএসপি হওয়া কিংবা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাস করা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে বৃত্তি নিয়ে বিদেশ যাওয়া এগুলো ছিল আগের দিনের কয়েক বছর আগে পর্যন্তও আভিজাত্য অর্জনের, সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের এক একটি চেষ্টার নাম। এছাড়া অন্য কোন সুযোগও তখন মধ্যবিত্তের সামনে ছিল না। এ ধারণাগুলো এখন সেকেলে। কয়েক বছর একটানা অধ্যয়ন করে, লেগে থেকে, পরিশ্রম করে তারপর প্রতিষ্ঠা অর্জনের 'মোহ' এখন নেই। প্রমাণিত সত্য এখন সবার সামনে প্রতিষ্ঠিত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা কিংবা শিক্ষক হলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যে ব্যবসায় টাকা খাটানো কিংবা চালাও দুর্নীতির কোন বিকল্প নেই। এই যখন অবস্থা তখন কেন আগেই সে রকম কাজে নেমে পড়া নয়?

ম্যাট্রিক পাস করেছে, ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমদিকে পড়ছে এই বয়সসীমার ছেলেদের একটি অংশের মনোযোগ এখন প্রতিষ্ঠার দিকে। প্রতিষ্ঠার এখন পথ অনেক। পড়াশুনা ততদিনই তারা করছে যতদিন পর্যন্ত তাদের সে ব্যবস্থা হচ্ছে না। পড়াশোনা করে বেকারত্ব কিংবা চাকরি পেলেও তা দিয়ে হাতখরচও হবে না, এ সত্য তাদের কাছে পরিষ্কার। আগ্রহী অনেকে, পারছে কিছু জন, বাকি জনের মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে সেইমুখী বানিয়ে রেখেছে।

টাকার সেই খোঁজ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে? যদি মধ্যপ্রাচ্যে চলে যাওয়া যায়, যদি জার্মানিতে চাকরি না হলেও আশ্রয় পাওয়া যায় কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মতো কোন দেশে যাওয়া যায়, যদি এখানেই কোন ইনডেন্টিং ইত্যাদি ব্যবসায় হাত পাকানো যায়, যদি কোন বিদেশি কোম্পানির চাকরি পাওয়া সম্ভব হয় ইত্যাদিই হচ্ছে এর সমাধান। এগুলোর কোনটার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অপরিহার্য নয়। অপরিহার্য হচ্ছে কিছু ভালো যোগাযোগ, ইংরেজি কিংবা আরবি শিক্ষা। 'বুদ্ধিমান' ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এই জেনারেশন এখন তাই এদিকেই মনোযোগী। এ লেভেল ও লেভেল পাস করা, টোয়েফল জিআরই-তে ভালো করা, আরবি শিখে নেওয়া ইত্যাদিতে আগ্রহ তাই এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে আগের যে কোন সময়ের চাইতে বেশি।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ এখন বহির্বিশ্বের অনেক নিকটতর। আয়ের অনেক সুযোগ এখন হাতের কাছে।

ওপরের প্রক্রিয়ায় যারা আয় করতে পারছে না অথচ সেই ক্ষুধা আছে, পরিবারও সেরকম বিত্তবান নয়; তারা হাতিয়ার হয়ে যাচ্ছে সামাজিক কর্তাদের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের। হাতিয়ার হচ্ছে বিত্তবানদের নানা অপকর্মের। হাত মকশো হচ্ছে তাদের। খুব অল্প বয়সেই হাত পাকিয়ে নিয়ে তারা আবার স্বাধীনভাবে নামছে পথে। একে পুরোপুরি নেতিবাচক বলে চিহ্নিত করা যাবে না– পরিবর্তন হতেই হবে এক্ষেত্রে। কিন্তু পরিবর্তনের রূপটি নির্ধারিত হয়নি।

ওপরে বর্ণিত প্রবণতাগুলো সবার ক্ষেত্রে সত্য নয়। কিন্তু শহরের মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ তরুণদের মধ্যেই এ ধরনের কাজকর্ম কিংবা এ ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছোঁয়া পাওয়া যাবে।

এখানে বাংলা ভাষার জন্যে যে জেনারেশন সংগ্রাম করেছিল এক সময়, কিংবা দেশের জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল একসময়, তারা এখন পুরনো জেনারেশন।

আমাদের দেখা দরকার, এই সময়ে, এখন, এই দুই জেনারেশনের মধ্যে সংঘাতের রূপ কী? এই দুই জেনারেশনের সংঘাত আমাদের চেতনায় কী রূপ নিয়ে আসছে?

সময়ের প্রভাব

শুধু বাংলাদেশের জন্যে নয়, সমগ্র বিশ্বের সব দেশের জন্যেই এ কথা সত্য যে, সময়ের বিবর্তনে উৎপাদন সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মিলে সর্বত্র এক এক ধরনের সামাজিক চাহিদা সৃষ্টি করে এবং তার সাথে সম্পর্কিতভাবেই বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নির্ধারিত হয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মন মানসিকতা।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে '৭১-এর যুদ্ধ একটি বড় ঘটনা। বাংলাদেশের মানুষ এর আগেও বহু সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। বহু মানুষ তাদের জীবন দিয়েছেন সমষ্টির

স্বার্থে। কিন্তু '৭১-এর যুদ্ধের মতো এরকম সর্বব্যাপী প্রভাব সৃষ্টির মতো কোনো সশস্ত্র যুদ্ধের সম্মুখীন এই দেশের মানুষ এর আগে হয়নি। এই যুদ্ধ সবার অজান্তেই, সামাজিক সংস্কার, সম্পর্ক, আশা-আকাঙ্ক্ষার এক অচলায়তনকে ধসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রথমে বাঙালিদের আয়ত্তাধীন হওয়ার পর জনগোষ্ঠীর মননে পুরো নতুন প্রেক্ষিত সৃষ্টি হওয়ার কথা। তা হয়েছে কিন্তু ইতিবাচক হয়নি। তার কারণ হিসেবে আগেই বলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে রাষ্ট্র বা সমাজ ধারণ করেনি-করছে ব্যক্তিগতভাবে যার জন্যে যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে মেরুকরণ হলো না- হলো একটি দলের ক্ষমতা আরোহণের প্রেক্ষিতে।

অংশীদারিত্বের সমস্যা এড়াবার জন্যে ক্ষমতা আরোহণকারীরা মুক্তিযুদ্ধকে তরুণ যোদ্ধাদের ব্যক্তিগত সাহসিকতা বা আত্মত্যাগ হিসেবে চিহ্নিত করলো এবং মুক্তিযোদ্ধা জেনারেশনে রূপান্তরিত করলো। মুক্তিযোদ্ধারা রাতারাতি হয়ে গেলেন 'বন্দুকধারী'। যে বন্দুকধারী রাষ্ট্র ও সমাজের বাইরের কাঠামোতেই রয়ে গেল। যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ থেকে সম্পদ-পাচারে নতুন সংযোজন ঘটে। দারিদ্র্য বাড়ে। বেকারত্ব, আয় ব্যয়ের অসংগতি, দ্রব্যমূল্য সবই বেড়ে যায়। আর্থিক সঙ্কটে মধ্যবিত্তও আক্রান্ত হয়। চোখ খুলে যায় মধ্যবিত্তেরও। রাষ্ট্র নতুন নতুন সুযোগ এনে দেয়। দুর্নীতি এবং টাকা বানানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। আগে সামাজিকভাবে যেমন কালো এবং ভালো টাকাকে চিহ্নিত করা হতো সে অভ্যাস ভেঙে যায়। টাকা হয়ে উঠে প্রধান নির্ণয়ক। টাকা উপার্জনে ক্ষমতাই সামাজিকভাবে দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃত হয়। সব কালো ভালোতে রূপান্তরিত হয়।

এই সংস্কার রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কয়েক বছর গেছে। এখন যে জেনারেশন বয়ঃসন্ধিকালে অবস্থান করছে, তারা এক্ষেত্রে অনেক পরিণত চিন্তা নিয়ে অংশ নিচ্ছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন এই জেনারেশন রাষ্ট্র নয় নিজের সম্পর্কে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ এখন সঙ্কটে আক্রান্ত। কিন্তু একই সাথে আক্রান্ত এর বিরুদ্ধ শক্তি। সমগ্র বিশ্ব জুড়েই এখন একটা ঝিমানো ভাব। পুঁজিবাদী মন্দা এখন পুঁজিবাদী বিরোধী মানবিক শক্তিসমূহকেও আক্রমণ করেছে। তরুণ জেনারেশনের বিদ্রোহের শক্তি পশ্চিমেও নেই।

পশ্চিমের একই দ্বিমুখী সংকটের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। তরুণ জেনারেশন সে সংকটেই ভুল ঘোড়ার আরোহী হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অন্যথা হতে পারতো। একটি দেশ স্বাধীন হয়েছে যুদ্ধ করে। অর্থনীতি ও রাজনীতির সংকটের একপর্যায়ে পার্লামেন্টে পাঁচ মিনিটের ভাষণে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হলো। যে জনগণ একটি স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশীদার তার ওপর চললো নির্যাতন। সে জনগণ যদি এখন নিয়তিবাদী হয়, আত্মকেন্দ্রিক হয় তার দায় কে নেবে?

সমাজ গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও '৮০ দশকে কোনো ইতিবাচক জেনারেশনের আগমন ঘটছে না।

৮০ দশকের জেনারেশন

'জেনারেশন গ্যাপ' আছে বললে শুধু এটুকুই বোঝা যায় না যে, ছেলে কিংবা মেয়ে গোপনে প্রেমপত্র লিখছে এবং বাবা-মা তা গ্রহণ করতে পারছেন না; কিংবা ছেলে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে; ছেলে কিংবা মেয়ে বাবার সাথে তর্ক করছে । জেনারেশন গ্যাপ সে অবস্থাতেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন দু'টি জেনারেশনের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন দর্শনে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়।

গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, বর্তমান সময়ে এই ধরনের কোন বৈপরীত্য প্রবীণ এবং নবীনদের মধ্যে প্রবল নয়। ছেলে যখন ভাবছে তার টাকা উপার্জনের জন্যে পড়া বাদ দিয়ে কোন সুযোগ খোঁজা দরকার তখন বাবাও তাই ভাবছেন; বাবা মেয়ের জন্যে প্রবাসী ছেলেকে পছন্দ করছেন। ছেলে যখন পরীক্ষার ঝামেলা নকল দিয়ে চুকিয়ে দিতে চাইছে বাবা তখন বাইরে অপেক্ষা করছেন। পুরনো জেনারেশন যখন বিত্তের জন্যে কাগজপত্র অন্যায় সই করছে তখন নতুন জেনারেশনের সদস্যরা তার অংশীদার হচ্ছে।

এককালে যিনি বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন, পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, সেই ব্যক্তিই এখন ছেলেকে এ লেভেল বা ও লেভেল করিয়ে বিদেশে পাঠানোর কথা ভাবছেন। বাংলা এখনও সৌখিন ভাষা, ১ বৈশাখ কিংবা ২১ শের মতো অনুষ্ঠানের ভাষা। বিত্ত অর্জন, প্রতিষ্ঠা লাভের সাথে বাংলার সম্পর্ক নেই বলে দুই জেনারেশন একই সাথে বাংলাকে পুরনো আলমারিতে তুলে রাখছে।

৮০ দশকের জেনারেশন কারা? এ প্রশ্ন করলে আমরা কোন বয়সগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করবো? ৮০ দশকে তরুণ সম্প্রদায়ের চেতনাকে কীভাবে চিহ্নিত করবো? নগরের একশটি তরুণের সাথে কথা বলে দেখা গেছে তার উচ্চাভিলাস হচ্ছে বিদেশে যাওয়া বা ব্রিফকেস ব্যবসা করা। সিদ্ধান্তগুলো একমাত্র বিত্তকে কেন্দ্র করে শ্রেণী উত্তরণের অভিলাসে। সৃষ্টিশীলতায় নয়। যে ছেলেকে দেখছেন কিছু করছে না কলেজ যাচ্ছে না, জিজ্ঞেস করুন উত্তর পাবেন– ও লেভেল করছি বা টোফেল দিয়েছি।

৮০ দশকের তরুণ সম্প্রদায়ের এই চেহারা গ্রামেও। সেখানে যার বেশি জমি তিনি জমি বেচে বিদেশ যাচ্ছেন, আরও জমি সংগ্রহ করছেন। ফসল ফলানো এখানে মুখ্য নয়, সামাজিক অবস্থান নির্ধারণই প্রধান। যার জন্যে তরুণ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত চরিত্র চিহ্নিত করা ঠিক নয়-যেহেতু সে রকম চরিত্র নেইও। ব্যক্তি চরিত্র আছে, শ্রেণীচরিত্র আছে। এই চরিত্রে তরুণ শুধু নয় তাদের পিতামাতাকেও ফেলা যাবে। ৮০ দশকে জেনারেশনের মৌলিক চিন্তা বা আদর্শগত বিরোধ বা সংঘাত উল্লেখযোগ্য নয়।

৮০ দশকে দুই জেনারেশনের সহাবস্থান লক্ষণীয়। কিন্তু একে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? প্রবীণরা তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারছেন না। তরুণেরা নতুনের বার্তা বহন করছেন না বলেই নেই কোনো রকমের সংঘাত।

বিরোধ : শ্রেণী উত্তরণের

গ্রামের যে ছেলে নতুন শহরে এসেছে কিংবা দরিদ্র বা সীমিত আয়ের পরিবারের যে ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল প্রকৌশল শিক্ষালয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন উপলব্ধি। যে উপলব্ধি থেকে সৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা পূরণে তার পরিবার সক্ষম হয়। পরিবারের এই অক্ষমতায় পরিবারের প্রতি নিজের বাবা-মার প্রতি এক অনাস্থা, ক্ষোভ নিয়ে বন্ধুর সাথে ঐ ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে নতুন কিছু করার চেষ্টায়। তার পাঁচশো টাকার জুতো দরকার, প্যান্ট বদলানো দরকার, নতুন নতুন ডিজাইনের শার্ট দরকার, ফিল্টার টিপড সিগারেট ছাড়া অসুবিধা, বান্ধবীর জন্যে টাকা খরচ না করাটা তার জন্যে অপমানজনক। সবকিছু মিলিয়ে তার সাথে পরিবারের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এটাও এক ধরনের গ্যাপ-পিতা-পুত্রের মধ্যে সংস্কৃতিগত তফাৎ-উচ্চাভিলাসের তফাৎ।

কিন্তু এতে সংঘাত নেই। নতুন এক ধারা সৃষ্টি করছে সেই ছেলে। নতুন শ্রেণীতে চলে যাচ্ছে। তার পরিবার ঘটনাটি অবলোকন করছে শুধু। এই ছেলেটি শহরবাসী হবে এখানে পূর্বে গ্রাম থেকে আসা আরেকটি পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে। তখন তার জীবনযাপনের পরিমণ্ডল হবে তাদের মতো। মেয়েদের মধ্যেও এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এসব কারণে পরিবারের সাথে দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। পিতা অক্ষম বা ছেলের চিন্তা এবং যুক্তির সাথে পাল্লা দিতে অক্ষম। ছেলে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে। মেয়ে অতটা না পারলেও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্যে তারও একটা গোপন চেষ্টা আছে।

'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে' উপনিবেশকালীন প্রবাদ অনেক আগেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল; ৮০ দশকে এসে বাংলাদেশে তা একেবারেই কথার কথায় পর্যবসিত হয়েছে। কোন কিছু নিয়েই খুব চিন্তা-ভাবনা করার কিংবা সিরিয়াসলি ভেবে দেখবার সময় এই জেনারেশনের নেই। এই জেনারেশন সময়ের বিপক্ষেও দাঁড়ায়নি, বিপরীতে চলেনি। চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে তারা সমাজের অবক্ষয়ের, অর্থনৈতিক লুটপাটের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠেছে। 'অবনত এবং অধৈর্য জেনারেশন' হিসেবে চিহ্নিত হওয়াতেই তাদের আগ্রহ বেশি। পরিবার এখানে হয় তাদের এই প্রবণতার সক্রিয় সমর্থক কিংবা নীরব। পুরনো সমাজ যে অনতিক্রম্য সংকটে পতিত হয়েছে ভাঙনের উইপোকা যেভাবে তার গোড়া খেয়ে ফেলেছে তাতে পুরনো প্রতিরোধ ক্ষমতা তার নেই। নতুন উচ্চতর গতিসৃষ্টি এই সমাজের কর্ম নয়। সমাজের এক একটি একক পরিবার এই ঘটনারই বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করছে।

কিছু ইতিবাচক দিক

বিত্তবান পরিবারের সন্তানরা ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো ঘটছে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি লাভের প্রত্যাশা থেকে। নিরাপত্তাহীনতার উৎস বুঝে তা দূর

করার জন্যে কোনো সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় নামবার কোন পথ তাদের সামনে নেই। সেজন্যেই তারা দেরি না করে ব্যক্তিক সমাধান খুঁজে নিতে আগ্রহী।

এই কারণেই এই জেনারেশনে যে পরিণত এবং আত্মবিশ্বাসী মনোভাব দেখা যায়, তাই হচ্ছে এদের বর্তমানের ইতিবাচক দিক। যুক্তিতর্ক করার সাহস তাদের মধ্যে আছে, আছে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মুরুব্বীদের ওপর ভরসা না করার দৃঢ়তা। মেয়েদের ক্ষেত্রে আগের যে কোন সময়ের চাইতে বেশি আত্মবিশ্বাস এখন দেখা যায়। ছেলেদের ওপর বিশ্বাস তাদের কমে গেছে অনেক, সে কারণে নির্ভরশীলতার চিন্তাও কমেছে। সে জন্যে লেখাপড়া করে জীবিকা অর্জনে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর মতো প্রস্তুতি নেওয়ায় তাদের মনোযোগ এখন অনেক বেশি। নিরাপত্তাহীনতার বাস্তব শর্তাবলি অনেক প্রকট হওয়ায় মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত মেয়েরা এখন সামাজিক ব্যাপারে আগের চাইতে বেশি সচেতন। ছেলেমেয়েদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগের জড়তা এখন অনেক ভেঙে গেছে। 'তোমার দু'হাত ধরে শপথ নিলাম থাকবো তোমারি আমি কথা দিলাম।' জাতীয় মিথ্যাবচনে ন্যাকাপ্রেম এখন ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে।

কিন্তু এই ইতিবাচক দিকগুলো তরুণদের অধিকাংশের নেতিবাচক ভূমিকাকেই সাহায্য করছে। আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা থেকে প্রতিবাদী তরুণ জন্ম নিচ্ছে না।

গন্তব্য কোথায়?

বার্ট্রান্ড রাসেল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের তরুণদের হতাশা ও ক্ষোভের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'একই সাথে সচ্ছলতা এবং ক্ষমতাহীনতাই পাশ্চাত্যের তরুণদের সিনিক করে তুলেছে। ক্ষমতাহীনতা তাদেরকে কিছুই করতে দিচ্ছে না, সচ্ছলতা এই অক্ষমতাকে আরও বেদনাদায়ক করে তুলেছে। প্রাচ্যের ছাত্ররা পাশ্চাত্যের চাইতে জনমতের ওপর অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে কিন্তু ন্যূনতম জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা তার নেই। এ কারণে সে সিনিক না হয়ে হয়ে ওঠে সংস্কারক কিংবা বিপ্লবী।'

৭০ দশকের প্রথম পর্যন্ত বাংলাদেশের তরুণদের ক্ষেত্রে রাসেলের কথাই অনেকখানি সঠিক ছিল। তাদের জন্যে সঠিক ছিল আয়ারল্যান্ডের দৃঢ়পুরুষ ববি স্যান্ডসের কথা 'ইট'স বেটার টু ডাই অন আওয়ার ফিট দ্যান টু লিভ অন আওয়ার নিজ।'

এই জেনারেশন ৬০ দশক থেকে ৭০ দশকের প্রথম পর্যন্ত বাংলার গৌরবজনক তরুণদের উত্তরসূরী নয়। এরা ৬০ দশকে মার্কিন কিংবা ইউরোপের প্রতিবাদী তরুণদের সাথেও তুলনীয় নয়।

আগেই বলা হয়েছে, সমাজের অধিপতি শ্রেণী আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে এদেশের অর্থনীতিকে অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় জুড়ে দিয়ে অর্থনীতিকে দশাহীন করছে। সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক জনগণের অর্থনৈতিক সংকট। জাতিগত পরিচয়ের সমস্যা এখনও শেষ হয়নি– শ্রেণী সমস্যার অধীন হয়ে গেছে সে সমস্যা। সামরিক শাসনের আশ্রয়ে লুচ্চা বিত্তের আধিপত্য অর্থনীতিতে সৃষ্টি করছে ব্যাপক নৈরাজ্য। সামাজিকভাবে সামন্ত মুল্যবোধ ভেঙে গেছে, টাকার রাজত্ব চূড়ান্ত হয়েছে। কিন্তু সে টাকা উৎপাদনের নয় বলে তার কোন পজিটিভ ভূমিকা নেই। একদিকে দারিদ্র্য বৃদ্ধি অন্যদিকে বিলাসিতার ঝলকানি। যে জেনারেশন বর্তমানে এ নিয়ে সামাজিক সংঘাতের প্রতিনিধিত্ব করবে সে এখন বিত্তের সন্ধানে অস্থির।

এখন বাংলাদেশে বয়সের সংঘাত নেই, নীতির সংঘাত নেই, নেই আত্ম অনুসন্ধানের স্পৃহা, স্বপ্ন নেই। নেই আগামীকাল, শুধু সে আজকেই জানে। ধর্মের প্রতাপ কম, কিন্তু বিবেকের জাগরণ ঘটেনি, সমাজতন্ত্রী হতে গিয়ে ব্যর্থতায় মানবতন্ত্রী হওয়ার অবসর না নিয়ে হাতে তুলে নিয়েছে সেই ব্রিফকেস। স্বপ্ন দেখে না, কিন্তু স্বপ্ন ক্রয় করতে চায়।

কিন্তু নতুন সৃষ্টি করবে কে? ৮০ দশকের সব জেনারেশন একই পাটাতনে দাঁড়িয়ে অথবা চলমান। কিন্তু যাচ্ছে কোথায়?

পুরনো শৃঙ্খল কিংবা জড়তাকে আঘাত করেই বিভিন্ন দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে-বাংলাদেশেও এক একটি তরুণ জেনারেশন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই দেশের বর্তমানের অচল পুরনো শৃঙ্খলকে ছুড়ে ফেলবে কে?

বিচিত্রা, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও উৎপাদিকা শক্তি বিকাশে সংকট

সামরিক শাসনের অধীনে বাংলাদেশের অর্থনীতি আর একটি বছর অতিক্রম করলো। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণ অতি আবশ্যিকভাবে রাজনৈতিক শাসক হিসেবে সামরিক সরকারের প্রবল উপস্থিতিকে সংযুক্ত করবে। কেননা তাদের এই উপস্থিতি অর্থনীতির বর্তমান গতিপ্রকৃতি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ধারণ করছে।

১৯৮৫-এর অর্থনীতির প্রধান দিকগুলো প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার :

১. ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'বিরাষ্ট্রীয়করণ আর করা হবে না', বলে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও সারা বছর জুড়েই বিরাষ্ট্রীয়করণ খুব জোরেসোরে বাস্তবায়ন করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোও আংশিক বিরাষ্ট্রীয়করণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
২. ব্যক্তি মালিকানায় বীমা, ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কাজ এই বছর আরও এগিয়েছে।
৩. বন্যা এবং অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে এই বছর কৃষিখাতে উৎপাদন কমেছে।
৪. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় দেওয়া হলেও, ব্যক্তিগত খাতে প্রচুর ভর্তুকি, ঋণ ইত্যাদি দেওয়া সত্ত্বেও, নতুন শিল্প কারখানা উল্লেখ করার মতো গড়ে ওঠেনি।
৫. এ বছর বাজেট বরাদ্দে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে, শিক্ষা খাতে ব্যয় কমানো হয়েছে।
৬. বিদেশি নির্ভরশীলতা হ্রাসের উপর্যুপরি ঘোষণা সত্ত্বেও এর অব্যাহত বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা এ বছরও ক্ষুণ্ন হয়নি।
৭. আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় হ্রাসসহ বিভিন্ন কারণে এ বছর বিদেশি মুদ্রার মজুদ হ্রাস পেয়েছে।
৮. দ্রব্যমূল্য এ বছর বেশ কয়েক দফায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯. এ বছরই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়েছে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল শুরু হয়েছে।

১০. সার্ক-এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের সূচনা ঘটানো হয়েছে।

উল্লেখ করা দরকার যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন ও তার গতিপ্রকৃতি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এই নিবন্ধে যেসব তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে নেওয়া।

শিল্প উৎপাদন এবং বিরাষ্ট্রীয়করণ

সমাপ্ত ১৯৮০-৮৫ সালের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারের লক্ষ্য ছিল শিল্পখাতে শতকরা ৮ দশমিক ৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন, কিন্তু বাস্তবত শতকরা ৪ দশমিক ৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এই পরিকল্পনাকালে বেসরকারি খাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতাও দান করা হয়। এই সময়কালে বর্তমান দামস্তর অনুযায়ী, বেসরকারি খাতের জন্যে বরাদ্দ করা হয় ২,৫৯৮ দশমিক ৭৮ কোটি টাকা এবং সরকারি খাতের জন্যে বরাদ্দ ধরা হয় ২,০৪২ কোটি টাকা। বেসরকারি খাতের বিকাশের জন্যে অনেক শিল্প কারখানা যথেষ্ট সহজ শর্তে, বাকিতে, ব্যক্তি মালিকানায় বিক্রি করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার শেষকাল পর্যন্ত বেসরকারি খাত অধিকতর দক্ষতা, অধিকতর উৎপাদনশীলতার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে এই খাতের কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ এই পরিকল্পনাকালে ঘটেনি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে দেখা যায়, ১৯৭৩-৭৪ এ শিল্প উৎপাদনসূচক ১০০ ধরলে ১৯৮০-৮১ সালে শিল্প উৎপাদন সূচক ছিল ১৪৩ দশমিক ২১, ১৯৮৪-৮৫ সালে এ সূচক দাঁড়ায় ১৪৪ দশমিক ৬২তে।

১৯৮৪-৮৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানায় উৎপাদন কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেড়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমেছে। এই সময়কালে যেসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলোর মধ্যে আছে, পাটজাত দ্রব্য : শতকরা দশমিক ৫৯ ভাগ, সুতা : ৫ দশমিক ৫০ ভাগ, কাপড় : ১১ দশমিক ৩৫ ভাগ, ম্যাচ : ২৫৪ দশমিক ০৮ ভাগ, কাগজ : ২৫ ভাগ, নিউজপ্রিন্ট : ৫ দশমিক ২৬ ভাগ, ডিজেল ইঞ্জিন : ৭৮ দশমিক ২৪ ভাগ, সাবান : ২৪ দশমিক ৮৭ ভাগ, স্টিল : ২৮ দশমিক ২০ ভাগ, টেলিভিশন : ১ দশমিক ৭৫ ভাগ। অন্যদিকে, যেগুলোর উৎপাদন কমেছে সেগুলো হচ্ছে—চিনি, সিমেন্ট, কস্টিক সোডা, বাস, ট্রাক, গাড়ি, মটরসাইকেল, টিএসপি, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া সালফেট এবং সাইকেল। চিনি উৎপাদন হ্রাসের ব্যাপারে সরকারের বক্তব্য হচ্ছে যে, মিল এলাকায় গুড় উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চিনিকলগুলোতে আখের সরবরাহ কমে যায়

এবং সে কারণে চিনি উৎপাদন কম হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের দলিলেও এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, গুড় উৎপাদনের জন্যে যদি আখের বর্ধিত চাহিদা হয় তবে তা অর্থনীতির জন্যে বরং ভালো, তাতে আখ উৎপাদন বৃদ্ধির একটি শর্ত পূরণ হয়। কিন্তু বাস্তবত আখ চাষীরা নিজেদের আখ উৎপাদন না বাড়িয়ে যতটুকু উৎপাদন হয় তা দিয়ে গুড় উৎপাদনেই বেশি আগ্রহী। চিনিকলে আখ সরবরাহের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কম বলে উদ্বৃত্তটুকুই তারা চিনিকলে আনেন। এর জন্যে তারা অতিরিক্ত উৎপাদন করেন না। তাদের এই অনাগ্রহের কারণ হলো, চিনিকলগুলো সরকারি নীতি অনুযায়ী আখের যথেষ্ট দাম দিতে রাজি নয়। আখের কম দাম দেওয়া নিরাপদ করার জন্যে এর আগে গুড় উৎপাদন নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল। আখচাষীরা এর বিরোধিতা করায় পুলিশের গুলিতে একজন আখচাষী প্রাণও হারিয়েছিলেন। এরপর সরকার আর এ নিয়ে জোর জবরদস্তি করেননি। কিন্তু উৎপাদন হ্রাসের পেছনে উৎপাদন বিরোধী মূল নীতিকে দায়ী না করে তারা দায়ী করছেন আখ উৎপাদকদের।

১৯৮২-র নভেম্বরে পাটকলগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণ শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৩টি পাটকল রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে ব্যক্তি মালিকানায় দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে এই ৩৩টি পাটকলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ দমমিক ৩০ লাখ টন, কিন্তু তাদের প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১ দশমিক ৭৫ লাখ টন। অথচ এর আগের বছরও এই মিলগুলোর উৎপাদন ছিল ২ দশমিক ০৪ লাখ টন।

একই সময়কালে এই মিলগুলোর পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ দশমিক ১০ লাখ টন, যার মধ্যে রপ্তানি আয় হওয়ার কথা ছিল ৩০০ কোটি টাকা। কিন্তু রপ্তানি করা হয়েছে মাত্র দেড় লাখ টন পাটজাত সামগ্রী। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে অবশ্য রপ্তানি আয় পূর্বের তুলনায়, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী না হলেও, রপ্তানির তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি খুব একটা ভিন্ন নয়। এই বছরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ২৪টি বস্ত্রকল বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে এই মিলগুলো সুতা এবং বস্ত্র উৎপাদনে, তার উৎপাদন ক্ষমতার যথাক্রমে শতকরা ৬৬ দশমিক ২১ ভাগ এবং ৫৯ দশমিক ৫১ ভাগ উৎপাদন করেছে। সুতার ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৭৩২ দশমিক ৯৮ লাখ পাউন্ড; ১৯৮২-৮৩ তে এর উৎপাদন হয়েছে ৫০১ দশমিক ৭৬ লাখ পাউন্ড, ১৯৮৩-৮৪ তে উৎপাদন হয়েছে ৪৮৫ লাখ পাউন্ড এবং ১৯৮৪-৮৫ তে উৎপাদন হয়েছে প্রায় ২৫০ লাখ পাউন্ড। বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতা আছে ৫৯২ দশমিক ৯৯ লাখ গজ; কিন্তু ৮২-৮৩ তে উৎপাদন হয়েছে ৩৬৪ দশমিক ৬৬ লাখ গজ , ৮৩-৮৪ তে উৎপাদন হয়েছে ৩৫২ দশমিক ৯২ লাখ গজ এবং ৮৪-৮৫ তে সর্বোচ্চ উৎপাদন দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২০০ লাখ গজ।

অর্থাৎ দু'ক্ষেত্রেই উৎপাদন নিম্নমুখী। অর্থাৎ বেসরকারি খাতের অধিকতর দক্ষতার কোন প্রমাণ প্রধান দু'টি শিল্পই দেখাতে পারেনি।

অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ হিসাব করলে সুতা উৎপাদন গত বছরের তুলনায় কমেনি, বরং সামান্য (০.৫৯%) বেড়েছে; বস্ত্র উৎপাদন বেড়েছে ৫ দশমিক ৫৯ ভাগ। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, বিরাষ্ট্রীয়করণ উৎপাদন হ্রাস ঘটিয়েছে। দেশীয় বাজার যতটা আছে ততটা পূরণ করা কিংবা যে শিল্প কারখানাগুলোর অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে, সেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহার করাও বর্তমানে এসবের নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, বা তারা করছে না। এ না করা বা না করতে পারার পেছনে উৎপাদন খাতের ওপর উৎপাদনবিরোধী শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণই মূল কারণ হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশে উৎপাদনী পুঁজিকে ব্যবসায় পরিচালনা করার কারণ সেখানে মুনাফা বেশি। মুনাফা নির্ভর অর্থনীতিতে এর অন্যথা হওয়ার কথা নয়।

১৯৭৩-৭৪ কে ১০০ ধরলে গত ১১ বছরে শিল্প উৎপাদনের গড় বৃদ্ধি শতকরা ৪২ ভাগ মাত্র। বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি ম্যাচের ক্ষেত্রে, শতকরা ২৫৪ ভাগ। অন্য যেগুলোতেই উৎপাদন বেড়েছে সেগুলোর হার খুবই কম। গার্মেন্টসের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অস্থায়ী শিল্পের কারণে সামগ্রিক উৎপাদনের কিছুটা বৃদ্ধি দেখা যায়।

বিরাষ্ট্রীয়করণ অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা, ব্যাংক বীমা কোন না কোন পদ্ধতিতে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার (প্রাক্তন মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া, সরাসরি বিক্রি করা অথবা উল্লেখযোগ্য অংশ শেয়ার বিক্রি করা) ব্যাপারে বর্তমান সামরিক সরকারের আগ্রহ খুবই প্রবল। আগ্রহের এই প্রাবল্যের সাথে সামাজিক বাস্তবতার একটা সম্পর্ক আছে। ষাট দশকে এই দেশে আয়ুবী নীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খুবই ক্ষুদ্র একটি পুঁজিপতি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রীয় অর্থে শিল্প কারখানা স্থাপন করে তা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার নিয়ম সে সময়ই প্রচলিত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তখন মোট শিল্প খাতের শতকরা ভাগ ছিল ৫০-এর কাছাকাছি। পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজিপতিদের অংশ ছিল প্রায় ৪০ এবং বাঙালি ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ছিল শতকরা ৮ ভাগের মতো। সে কারণে ৭২-এ যে জাতীয়করণ হয় তা বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে সংঘাতের মধ্য দিয়ে হয়নি। সে সময় গঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত খাত কিছুদিন পর থেকেই ব্যবহৃত হয়েছিল উঠতি পুঁজিপতিদের বড় পুঁজিপতি হওয়ার কাজে। আদিম সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায় যখনই উঠতি পুঁজিপতিরা বেশি সম্পদ ও পুঁজির মালিক হয়েছে তখন থেকেই (১৯৭৪ থেকে) বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে শুরু হয়। ১৯৭৬ থেকে এই প্রক্রিয়া জোরদার হয়। ১৯৮২ তে বর্তমান সামরিক জান্তা ক্ষমতায় আসার পর বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রবল রূপ ধারণ করে।

এই সময়কালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে ব্যক্তিমালিকদের কোটি কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়, প্রচুর টাকা অনাদায়ী থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো লুটপাটের পর ব্যাংকগুলোও '৮৫-তে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণ করার পক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয় তা হচ্ছে এতে দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে ইত্যাদি। এগুলো যে সবসময় ঠিক নয়, তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে এই বিরাষ্ট্রীয়করণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হয়নি, করা হয়েছে অবৈধ সম্পদের মালিকানাকে বৈধ করা ও এদেশে সরকারি সম্পদে ব্যক্তি পুঁজির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে।

১৯৮২ সালে এই উদ্দেশ্যেই নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়, যাতে এর বাস্তবায়নের জন্যে বিস্তৃত কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচিগুলোর মধ্যে আছে উদার বিনিয়োগ সিডিউল, বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থার ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজস্ব এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান, ভর্তুকি প্রদান, বিদেশি পুঁজির সাথে যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংকের মাধ্যমে সঞ্চিত জনগণের সম্পদ লুটপাটের প্রমাণ অর্থমন্ত্রণালয়ের সমীক্ষা থেকেই পাওয়া যায়। ৮৫-র নভেম্বর মাসে প্রকাশিত তাদের তথ্যে দেখা যায় রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও উন্নয়ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের পাওনা ২২০০ কোটি টাকার বেশি; অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ১০৭০ কোটি টাকা। এই বকেয়ার শতকরা ৭০ ভাগ ১০০টি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১৯৮৪-৮৫ সালে বিভিন্ন সংস্থার ঋণ আদায়ের হারও অনেক কম; শিল্প ব্যাংক : ১৪%, শিল্প ঋণ সংস্থা: ৭০%, কৃষি ব্যাংক : ৩৩%, গৃহ নির্মাণ ঋণদানকারী সংস্থা : ৩২%। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে যে কয়টি পরিবারের ২০০ কোটি টাকারও বেশি দেনা রয়েছে, তারা ইতোমধ্যে নিজেদের মালিকানায় বাণিজ্যিক ব্যাংক গড়ে তুলেছে। তাদের সবগুলো ব্যাংকের মোট পুঁজির পরিমাণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর কাছে তাদের দেনা থেকে অনেক কম, প্রায় ১২৫ কোটি টাকার মতো। বর্তমানে যে চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে আছে সেগুলো হচ্ছে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোনালী ব্যাংক ছাড়া বাকি সবগুলো ব্যাংক সম্পূর্ণ মালিকানায় (ক্রেতা তারাই যাদের অনেক কোটি টাকা বকেয়া আছে) দিয়ে দেবার চেষ্টা এ বছরই নেওয়া হয়। তা ব্যর্থ হওয়ার পর ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, সেগুলোর শতকরা ৪০ ভাগ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দেওয়া হবে। এটা করার আগে ব্যাংকগুলোর মূল্য নির্ধারণ নিয়ে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিচ্ছে।

বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের হিসেব অনুযায়ী এই চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বাজার দাম হচ্ছে ১১৬০ কোটি টাকা। এই দাম নির্ধারণে যে বিষয়গুলো বিবেচনা

করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ব্যাংক ভবন, আসবাবপত্র, নগদ মুনাফার হার, গুডউইল ভ্যালু, নগদ সঞ্চয়। এই ব্যাংকগুলোর শুধুমাত্র গুডউইল ভ্যালুই (তিন বছরের নীট মুনাফার গড়) হচ্ছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। অথচ সরকারি সমর্থিত মূল্যায়নে ব্যাংকগুলোর মোট মূল্যই নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭৩ কোটি টাকা। মূল্যায়নের এই পদ্ধতিতেই পূবালী ও উত্তরা ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পূবালী ব্যাংকের বাজার দাম ধরা হয়েছিল ৩৯ কোটি টাকা, এই টাকাও সময়মতো পরিশোধ করা হয়নি। লাভজনক অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে।

এই পর্যন্ত প্রায় ৫৩৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় ফেরত দেওয়া হয়েছে (শিল্পমন্ত্রী, ৫-৮-৮৫)। পুঁজি প্রত্যাহারের তালিকায় রয়েছে আরও ৪২টি প্রতিষ্ঠান। লাভজনক প্রতিষ্ঠান রসায়ন শিল্প সংস্থার ৮৮টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৬৮টি ব্যক্তিমালিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৮৫-তে ব্যাংক ঋণের ব্যাপারে বেসরকারি খাতকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে সরকারি খাতে ছিল ১৮০৮ দশমিক ৯১ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাতে ৬৫১৫ দশমিক ৩৮ কোটি টাকা।

কৃষি ও খাদ্য

১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫১ দশমিক ১৮ ভাগ এসেছে কৃষি থেকে। এর আগের বছর এর হার ছিল ৫১ দশমিক ৫২।

১৯৮৪-৮৫ সালে খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ কোটি ৬৭ লাখ টন। কিন্তু প্রধানত বন্যার কারণে এর উৎপাদন কমে ১ কোটি ৫৬ লাখ টনে গিয়ে দাঁড়ায়।

১৯৮৩-৮৪ সালে পাট উৎপাদন হয়েছিল ৫২ দশমিক ৫৬ লাখ বেল; ৮৪-৮৫ সালে এই উৎপাদন কমে দাঁড়ায় ৪৬ দশমিক ১৩ লাখ বেল। উৎপাদন কম হওয়ার ফলে এই সময়ে পাটের দাম বেড়ে যায় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় পরের অর্থাৎ ৮৫-৮৬ অর্থবছরে পাটের উৎপাদন আবার অনেক বৃদ্ধি পায়। পাটমন্ত্রী তখন ঘোষণা করেন যে, পাটের ন্যূনতম কোনো দাম থাকবে না। এর ফলে পাটের মণপ্রতি উৎপাদন খরচ ৩০০ টাকা পড়লেও প্রায় সব স্থানেই সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর চাপে কৃষককে উৎপাদন খরচের অনেক কম দামে পাট বিক্রি করতে হয়। কোন কোন স্থানে পাট ৭০-৭৫ টাকা মণ দরে বিক্রি করতেও কৃষকরা বাধ্য হয়েছেন। যে সময় বিরোধী জোটগুলো পাটের ন্যূনতম দাম ৩০০-৪০০-৫০০ টাকা নির্ধারণের দাবি তোলেন এবং যখন সরকার পাটের ন্যূনতম দাম ২০০ টাকা নির্ধারণ করেন সে সময় পাট আর গরিব কৃষকদের কাছে নেই; তা চলে গেছে পাইকার-ব্যবসায়ীদের কাছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে আখের উৎপাদন ছিল ৬৮ দশমিক ৫০ লাখ টন, ৮৪-৮৫ সালে এর উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৭০ লাখ টন। আলু উৎপাদনও বর্তমান অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে : ৮৩-৮৪ সালের ১১ দশমিক ৪৮ লাখ টন উৎপাদন বছর দাঁড়িয়েছে ১৩ লাখ টন। ডালের উৎপাদন ৮৩-৮৪ সালে ছিল ১ দশমিক ৯৬ লাখ টন, ৮৪-৮৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২ দশমিক ১৫ লাখ টন।

ধান ও গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি তেমনভাবে দেখা যায় না। এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৩-'৮৪ সালে আউশের উৎপাদন ছিল ৩১ দশমিক ৭১ লাখ টন, ১৯৮৪-৮৫ সালে এই উৎপাদন ২৭ দশমিক ৮৩ লাখ টনে গিয়ে পৌছে।

আমনের উৎপাদন অবশ্য ৮৩-৮৪-র তুলনায় গত বছর কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে আমন উৎপাদন ছিল ৭৮ দশমিক ১১ লাখ টন, ১৯৮৪-৮৫ সালে এর উৎপাদন দাঁড়ায় ৭৯ দশমিক ২৫ লাখ টন। বোরো ধানের উৎপাদন ৮৩-৮৪-র তুলনায় বেড়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে উৎপাদন ছিল ৩২ দশমিক ৯৭ লাখ টন, ৮৪-৮৫ তে তা গিয়ে পৌছায় ৩৬ লাখ টনে। গমের উৎপাদন বেড়েছে; ৮৩-৮৪ সালে এর উৎপাদন ছিল ১১ দশমিক ৯২ লাখ টন, গত বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ লাখ টন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধান এবং গমের মোট উৎপাদনের কিছুটা বৃদ্ধি ঘটলেও একর প্রতি উৎপাদন বা উৎপাদনশীলতা গড়পড়তাভাবে কমছে।

আউশের একর প্রতি উৎপাদন ৮০-৮৪ তে ছিল ১১ দশমিক ১৩ মণ, গত বছর হয়েছে ১০ দশমিক ২৭ মণ। আমনের ছিল ১৪ দশমিক ৩২ লাখ, হয়েছে ১৫ দশমিক ১২। ৮৩-৮৪ তে বোরোর একর প্রতি উৎপাদন ছিল ২৫ দশমিক ৯১, ৮৪-৮৫ তে হয়েছে ২৪ দশমিক ৩০ মণ। মোট ধানের একর প্রতি উৎপাদন আগের বছর ছিল ১৪ দশমিক ৭০ মণ, গত বছর হয়েছে ১৩ দশমিক ৭২ মণ। গমের একর প্রতি উৎপাদন ৮৪ তে ছিল ২৪ দশমিক ৯৭ মণ, গত বছর হয়েছে ২৩ দশমিক ১০ মণ।

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এখানে বিভিন্ন কৃষি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি মাঝে মাঝে মধ্যে ঘটলেও তা কৃষি উৎপাদনের সামগ্রিক বিকাশকে নির্দেশ করে না। সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের স্থবিরতার কাঠামোর মধ্যে কখনও এই ফসলের উৎপাদন কিছুটা বাড়ে, কখনও ঐ ফসলের উৎপাদন কিছুটা বাড়ে। সামগ্রিকভাবে স্থবিরতা দুষ্টচক্র ভাঙার মতো পরিস্থিতি দেখা যায় না।

স্থবিরতার আবর্তের মধ্যে এখানে কৃষি ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির যে ঘটনা দেখা যায় তা ঘটে বহিস্থ কিছু উপাদানের কারণে, যার যথেচ্ছ ব্যবহার

আবার অনেক সময় ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তাছাড়া এসব উপাদানের গ্রহণযোগ্যতাও আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় ঠিকভাবে বেড়ে উঠার অবস্থা নাই। এই বহিস্থ উপাদানগুলো হচ্ছে রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ, যান্ত্রিক সেচ ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহার যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার চাইতে কম হারে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে।

১৯৮৩-৮৪ সালের রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে ১১ দশমিক ২৯ লাখ টন, ৮৫-৮৬ তে তা বিতরণ করা হয়েছে ১৩ লাখ টন। ৮৫ তে অবশ্য রাসায়নিক সারের দামও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইউরিয়ার দাম মণ প্রতি ১৪৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৭৪ টাকা, টিএসপির দাম ১৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬৫ টাকা করা হয়েছে, ডিএসপির দাম ১৪৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৭৪ টাকা, এমপি'র দাম বাড়ানো হয়েছে ১০০ টাকা থেকে ১২৯ টাকায়।

১৯৮৩-৮৪ সালে লো লিফট পাম্প বসানো হয়েছিল ৪৩,৬১৫টি, ৮৪-৮৫ তে সেখানে বসানো হয়েছে ৪৯,৭৮৪ টি। সেচের অধীনে জমি গত বছর ছিল ১১ লাখ একর, এ বছর হয়েছে সাড়ে ১২ লাখ একর। গভীর নলকূপ ১৯৮৩-৮৪ সালে কাজ করতো ১৫,৫১৯টি, ৮৪-৮৫ তে সেখানে কাজ করছে ১৬,৬৮৪টি। কিন্তু এর সেচের অধীনে জমি ৮৪ তে ছিল ১০ দশমিক ২০ লাখ একর, ৮৫ তে সেখানে হয়েছে ৯ দশমিক ০৫ লাখ একর।

অগভীর নলকূপের হিসেবে দেখা যায়, এক্ষেত্রের অগ্রগতির হার অনেক বেশি। ১৯৮৩-৮৪ সালে সেখানে ৬৭,৮০৩ টি অগভীর নলকূপ কাজ করতো সেখানে গত বছর কাজ করেছে ১,৩৭,০০০টি। এর সেচের অধীনে জমি ৮৪-৮৫ তে ছিল সাড়ে ৭ লাখ একর, ৮৫-৮৬ তে আছে ২০ লাখ একর। অবশ্য এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করে নেওয়া উচিত যে, অগভীর নলকূপ জমি সেচের জন্যে ক্রীত হলেও গ্রামাঞ্চলে এখন প্রচুরসংখ্যক অগভীর নলকূপ ধান ভানা কল, যন্ত্রচালিত নৌকা ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। এই ব্যবহারের যেহেতু আলাদা কোন হিসেব নেই সেহেতু ধরে নেওয়া যায়, যে সেগুলোও ওপরের হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে।

যান্ত্রিক সেচের যন্ত্রপাতি এখন সম্পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানায় বিক্রি করা হচ্ছে। (গভীর নলকূপ আগে সমবায়ের মাধ্যমে বিক্রি হতো)। যারা এগুলো কিনতে পারছে তারা এখন গ্রামাঞ্চলে ভাড়া দেয়াটা বেশি লাভজনক মনে করছে। যার ফলে গ্রামাঞ্চলে এখন সৃষ্টি হয়েছে 'ওয়াটার লর্ডইজম'। গরিব কৃষকরা যান্ত্রিক সেচের সুবিধা নিতে চাইলে তাদের প্রচুর ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য	১৯৮৩-৮৪ আবাদী জমি (লাখ একর)	উৎপাদন (লাখ টন)	একর প্রতি উৎপাদন (মণ)	১৯৮৪-৮৫ আবাদী জমি (লাখ একর)	উৎপাদন (লাখ টন)	একর প্রতি উৎপাদন (মণ)
ক. আউশ	৭৭.৫৬	৩১.৭১	১১.১৩	৭২.৬০	২৭.৮৩	১০.২৭
খ. আমন	১৪৮.৪৫	৭৮.১১	১৪.৩২	১৪১.১২	৭১.২৫	১৫.১২
গ. বোরো	৩৪.৬৩	৩২.৯৭	২৫.৯১	৩৮.০০	৩৬.০০	২৪.৩০
মোট ধান	২৬০.৬৪	১৪২.৭৯	১৪.৭০	২৫১.৭২	১৪৩.০৮	১৩.৭২
ঘ. আটা	১৩.০০	১১.৯২	২৪.৯৭	২০.০০	১৩.০০	২৩.১০
মোট খাদ্যশস্য	২৭৩.৬৪	১৫৪.৭১	১৫.০৮	২৭১.৭২	১৫৬.০৮	১৬.০০

উৎস : অর্থনৈতিক জরিপ, অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯৮৪-৮৫।

'বিদেশি সাহায্য' ও বিদেশি বাণিজ্য

পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় গত বছরে বিদেশি সাহায্য বেড়েছে। পূর্ববর্তী বছর নীট বিদেশি সাহায্য এসেছিল ২,৮৪৫ কোটি টাকা; গত বছর তার পরিমাণ হচ্ছে ১৩৪ কোটি ডলার বা ৩,৩৩৯ কোটি টাকা। মোট দেশীয় উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা হার হিসেবে পূর্ববর্তী বছরে বিদেশি সাহায্য ছিল জিডিপির শতকরা ৯ ভাগ এখন তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯ দশমিক ২ ভাগে। অর্থাৎ জিডিপির প্রবৃদ্ধি হারের চাইতে বিদেশি সাহায্য বৃদ্ধির হার বেশি। 'বিদেশি সাহায্য' আনার পেছনে সাধারণভাবে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধিকে যুক্তি হিসেবে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু ৮৪-৮৫ তে জিডিপির শতকরা হার হিসেবে বিদেশি সাহায্যের অংশ বৃদ্ধি পেলেও বিনিয়োগ ও সঞ্চয় কমেছে। ৮৩-৮৪ তে বিনিয়োগ ছিল মোট জিডিপির শতকরা ১৬ দশমিক ৫, এখন তা হয়েছে ১৬ দশমিক ২; ৮৩-৮৪ তে জাতীয় সঞ্চয় ছিল শতকরা ৭ দশমিক ৫, এখন তা হয়েছে শতকরা ৭ ভাগ।

মোট বিদেশি সাহায্য যা গত বছর পাওয়া গেছে ১৩৪ কোটি ডলার, তার মধ্যে ২৬ দশমিক ৫ কোটি ডলার খাদ্য সাহায্য, ৪২ দশমিক ৫ কোটি ডলার পণ্য সাহায্য এবং প্রকল্প সাহায্য হচ্ছে ৬৫ কোটি ডলার। মোট তথাকথিত বিদেশি সাহায্যের মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের এই বর্ধিত অংশের অর্থই হচ্ছে কঠোর শর্তযুক্ত ঋণের বর্ধিত চাপ।

'বিদেশি সাহায্য' আনার পেছনে প্রধানত দু'টি যুক্তি দেওয়া হয়। প্রথমটিতে বলা হয় যে, বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে যেহেতু ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আয় সীমা অনেক নিচে এবং আয়ের প্রায় পুরোটা ভোগেই ব্যয় হয় সেহেতু সঞ্চয় খুব কম। সঞ্চয় খুব কম থাকার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয়

বিনিয়োগের সাথে সঞ্চয়ের একটি বড় ব্যবধান থাকে। এই ব্যবধান দূর করার জন্যে বিদেশি সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। বিনিয়োগের অভাব 'বিদেশি সাহায্য' দ্বারা পূরণ করলে তা জনগণের আয় সীমা বাড়াবে, প্রকারান্তরে তা সঞ্চয় বাড়াবে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের পরিধি বাড়বে; আর তার ফলে সঞ্চয় বিনিয়োগ ব্যবধানও কমবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে। এ তাত্ত্বিক মডেলটি এখনও অর্থনীতি তত্ত্বে যথেষ্ট আদৃত থাকলেও বাস্তবে কোন দেশেই এটি কাজ করেনি। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর কথিত সাহায্য যে প্রক্রিয়ায় আসে ও ব্যবহৃত হয়, তা যে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আয় সীমা বৃদ্ধি না করে বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি শক্ত করে এবং সেভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি বিপর্যস্ত করে তা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

বিদেশি সাহায্যের পক্ষে আরেকটি অর্থনৈতিক যুক্তি উপস্থিত করা হয়। অনুন্নত দেশে শিল্পভিত্তি খুব দুর্বল থাকায় তার রপ্তানি পণ্য হচ্ছে প্রধানত কৃষিপণ্য। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে অনুন্নত দেশগুলোর দরকষাকষির ক্ষমতা খুবই কম। পাশাপাশি এসব দেশকে আমদানি করতে হয় ভোগ্য শিল্পপণ্য বা মূলধনী শিল্পপণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে আমদানিকৃত পণ্যাদির দাম যেভাবে বাড়ে, রপ্তানিকৃত পণ্যের দাম সে হারে বাড়ে না। তাছাড়া অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি খুবই দুর্বল থাকার ফলে বিনিময় সবসময়ই অসম হয়ে থাকে। অনুন্নত দেশের শাসক-শোষকশ্রেণীর ভোগবিলাস, ইন্ডেন্টিং ইত্যাদি কারণে জাতীয় অর্থনীতির জন্যে অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি চাপ থাকার ফলে আমদানির আয়তন ক্রমাগতভাবে স্ফীত হয়। এর ফলে দিনে দিনে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ে।

বিদেশি সাহায্যের পক্ষে যুক্তিতে বলা হয়, বাণিজ্য ক্ষেত্রের এই ব্যবধান অনুন্নত দেশগুলোর পক্ষে আপনা-আপনি মিটিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। এই গ্যাপ পূরণের জন্যে প্রয়োজন হবে বিরাট পুঁজির যা অনুন্নত অর্থনীতির ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে। আমদানির প্রয়োজন কমাবে এবং রপ্তানির শক্তি বাড়াবে। বাস্তব বিশ্ব থেকে এ তাত্ত্বিক মডেলের সপক্ষে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া অসম্ভব। অন্যান্য প্রান্তস্থ দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর যেভাবে বিদেশি সাহায্য বাড়ে, সেভাবে বাণিজ্য ঘাটতিও বাড়ে। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে মোট বিদেশি ঋণ ছিল প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা, তখন বাণিজ্য ঘাটতি ছিল প্রায় সাড়ে চারশো কোটি টাকা। ১৯৮৪-'৮৫ সালে যখন বাংলাদেশের মোট বিদেশি সাহায্য ৩৫ হাজার টাকার ওপরে, তখন বাণিজ্য ঘাটতি উঠছে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি পর্যন্ত। অর্থাৎ দু'টিই ১০ গুণ বেড়েছে। তার অর্থ হচ্ছে বুর্জোয়া তাত্ত্বিক মডেলে যা বলা হচ্ছে তা বাস্তবতার ধারে কাছে তো নেই-ই, তার বিপরীতে অবস্থান করছে। যত 'সাহায্য' বাড়ছে তত বাণিজ্য ঘাটতিও বাড়ছে।

রপ্তানি বৃদ্ধির জন্যে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি পরিমাণ বাড়ে, যদিও বাণিজ্য ঘাটতিও একই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ এ যদি আমরা আমদানি দাম ও রপ্তানি দামের সূচক ১০০ ধরি তাহলে ১৯৮৪-৮৫ সালে আমদানি দাম সূচক দাঁড়ায় ৩৪০ এবং রপ্তানি দাম সূচক দাঁড়ায় ২২৫। ব্যয় বৃদ্ধির এই বৈষম্য বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির অন্যতম শর্ত হিসেবে কাজ করে।

বৈদেশিক সাহায্যের নামে ঋণের প্রয়োজন আসলে জনগণের নয়। এর প্রয়োজন হচ্ছে এদেশের দুর্বল সংকটগ্রস্থ লুটেরা শাসক শ্রেণীর। বিদেশি সাহায্য এদেশে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত, এদেশীয় পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজনে প্রবাহিত লগ্নী পুঁজি ছাড়া আর কিছু নয়। এই পুঁজি এদেশে ব্যবসায়ী পুঁজিকে শক্তিশালী করে, দ্রুত মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়। এই পুঁজি এদেশে কেন্দ্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর বাজার নিশ্চিত করে, একইসাথে এসব দেশের পণ্যাদি অসম বিনিময়ের মাধ্যমে পাচার করে। এই পুঁজি একইসাথে আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি করে। এই পুঁজি পুঁজিবাদী ভাবাদর্শ চিন্তা-চেতনাকে পুনরুৎপাদন করে এবং তার আমলাতন্ত্র শিল্পব্যবস্থা সামরিক বাহিনী পরিপূর্ণ করে। এভাবে বিদেশি সাহায্য এদেশের শাসক-শোষক শ্রেণীর জন্যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এই অপরিহার্যতাকে তারা 'জনগণের প্রয়োজন' বলে প্রচার করার জন্যে তৈরি করে বিভিন্ন তাত্ত্বিক যুক্তি।

আমদানি রপ্তানি ও বাণিজ্য : উদ্বৃত্ত ঘাটতি (কোটি টাকায়)

বছর	রপ্তানি	আমদানি	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি
১৯৭৩-৭৪	২৯৭.৪১	৭৩২.০০	- ৪৩৪.৫৯
১৯৭৪-৭৫	৩০৬.১৪	১,০৮৪.২৪	- ৭৭৮.০৯
১৯৭৯-৮০	১,১২৪.১৬	৩,০৫২.৪৯	- ১,৯২৮.৩৩
১৯৮১-৮২	১,২৫৫.৫৪	৪,৮৬৯.৭০	- ৩,৬৪৪.১৬
১৯৮৪-৮৫	২,৩৭৫.০০	৭,১৫৫.০০	- ৪,৭৮০.০০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৮৫।

বিদেশি 'সাহায্য' (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ধরন	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৫	১৯৭৯-৮০	১৯৮১-৮২	১৯৮৪-৮৫
খাদ্য সাহায্য	২৫৮.৮	৪৬১.১	২৭০.০	২৮৫.২	২৫৭.৭
অপ্রকল্প সাহায্য	৩০২.১	৪১৫.১	২৮৫.৩	৫২৮.২	২৫৫.৫
প্রকল্প সাহায্য	৩১৭.৫	৩৯০.৫	৫৯৭.৯	৮৮১.৭	১২৪২.৭
মোট	৮৭৮.৪	১২৬৬.৭	১১৫৩.২	১৬১৫.১	১৭৫৫.৯

উৎস : পূর্বোক্ত।

বাংলাদেশের বর্তমান মুদ্রানীতি অনুযায়ী মুদ্রা সরবরাহ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে শতকরা ১৬ ভাগ। ১৯৮৪-৮৫ সালে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রসার শতকরা ১৫ ভাগ হারে হবে বলে ধরা হয়েছে। মুদ্রা এবং ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে বর্তমান অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে :

১. মুদ্রা সরবরাহের ক্ষেত্রে ধীর প্রবৃদ্ধির হার,
২. বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের উল্লেখযোগ্য প্রসার,
৩. বিশেষত মেয়াদি আমানতের আকারে সঞ্চয়ের বৃদ্ধি,
৪. বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ঘাটতি এবং
৫. সরকারি রাজস্ব কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তের সংকোচন।

১৯৮৩-৮৪ সালে মুদ্রা সরবরাহ (ন্যারো মানি) পূর্ব বছরের তুলনায় শতকরা ২১ দশমিক ২০ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,২৪৩ কোটি ৬৫ লাখ টাকা যার থেকে শতকরা ৮ দশমিক ৮ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে মুদ্রা সরবরাহ দাঁড়ায় ৩,৯৫০ কোটি ৯৪ লাখ টাকায়। ব্রড মানির (মেয়াদি আমানতসহ) ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির শতকরা হার যথাক্রমে ২৫ দশমিক ৩৯ এবং ১৩ দশমিক ৬৩ ভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য থেকে দেখা যায়, (ন্যারো মানি) সরবরাহ ৮৫ তে দাঁড়িয়েছে ৪,২০৯ কোটি ২ লাখ এবং ব্রড মানি সরবরাহ দাঁড়িয়েছে ১০,১৮৫ কোটি ৪৯ লাখ টাকায়।

১৯৮৩-৮৪ সালে ব্যাংক ঋণের বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৩ দশমিক ৭৮ ভাগ, ৮৪-৮৫ সালে তার হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৪ দশমিক ৭৩ এ। এই বৃদ্ধির পর মোট ব্যাংক ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকায়। ব্যাংক ঋণের এই বৃদ্ধির প্রধান অংশই দেওয়া হয় বেসরকারি খাতে। আগের বছরের তুলনায় সরকারি খাতে ব্যাংক ঋণ বাড়ে প্রায় ২১৬ কোটি টাকা। সেখানে বেসরকারি খাতে বাড়ে প্রায় ১,৪৩৫ কোটি টাকা। বর্তমানে সরকারি খাতে মোট ব্যাংক ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১,৮০০ কোটি টাকার কিছু বেশি এবং বেসরকারি খাতে এর পরিমাণ হচ্ছে ৬,৫০০ কোটি টাকার বেশি।

বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের এই বৃদ্ধির ফলে মুদ্রা সরবরাহের ওপর যে চাপ পড়ে তা মুদ্রা সরবরাহের আরও বেশি বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু প্রধানত মেয়াদি আমানতের আকারে সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে এই সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং দু'এর মিথস্ক্রিয়ায় মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার কমে আসে। মোট আমানতের মধ্যে মেয়াদি আমানত ১৯৮৪ সালে ছিল শতকরা ৭১.১৫, ৮৫ সালে তা ৭২.২৬ এ পৌছায়।

এদিকে ৮৪-৮৫ সালের বাংলাদেশের ওপর বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে এ সময়ে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সাথে প্রবাসীদের পাঠানো বিদেশি মুদ্রার হারও কমেছে। এই উভয়ের সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে বিদেশি মুদ্রার মোট রিজার্ভ সংকুচিত হয়েছে।

বিদেশি মুদ্রা সম্পদ (নীট)

সময়	বাংলাদেশ ব্যাংক	সিডিউল ব্যাংক	মোট
১৯৭৩-৭৪	- ৩১.৭৪	১০২.২১	৬২.৪৭
১৯৭৫-৭৬	- ৮৯.০১	১৭৫.৩৯	৮৬.৩৮
১৯৭৭-৭৮	- ৪৫.৩৭	৪৭.৮৫	২.৪৮
১৯৭৯-৮০	- ২৬৯.৯৮	১০৬.৯৮	১৫৪.২০
১৯৮২-৮৩	- ৯০৮.৯৩	২০০.৯১	৭০৮.৮২
১৯৮৩-৮৪	- ৪৮৪.১৪	২৬৫.২৫	২১৮.৮৯
১৯৮৪-৮৫	- ৬৫২.৯২	২৯৭.৮৬	৩৫৫.০৬

মুদ্রাগত অবস্থা (কোটি টাকায়)
অভ্যন্তরীণ ঋণ
সরকারের কাছে পাওনা

বাংলাদেশ ব্যাংক	সিডিউল ব্যাংক	মোট
২১৮.২৫	১৯১.০৮	৪০১.৩৩
৫৩৭.৯৩	১৬৮.৫৮	৭০৬.৫১
৫৮০.৩৭	২৫৮.৯৬	৮৩৮.৫৩
৭৬৮.০২	৩০৫.৩৬	১০৭৩.৩৮
১২৩৪.৮৮	৫৮৫.০৫	১৮১৯.৯১
১৩৫১.৫৯	৫৭৬.৪৪	১৯২৮.০৩
১১১৩.৯৩	৬১৬.০৪	১৭২৯.১৭

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে পাওনা

বাংলাদেশ ব্যাংক	সিডিউল ব্যাংক	মোট
১১.৫০	৩৪৪.৮২	৩৫৬.৩২
১৭.৫৩	৬৩০.৫১	৬৪৮.০১
১৮.৯০	৮৫৫.৯৫	৮৭৩.২৫
১৫১.২৬	১৩১৩.৪৩	১৪৬৪.৬১
৩৩৩.৭৫	২১০৬.৮৮	২৪৪০.৬৩
৪৯৫.০১	২১২৬.২২	২৬২১.২৩
৬১২.৭০	২৫০৮.৯২	৩১২১.৬২

বেসরকারি খাতের কাছে পাওনা

বাংলাদেশ ব্যাংক	সিডিউল ব্যাংক	মোট
১৯.১৫	৩২১.৪০	৩৪০.৫৬
১৩.০৬	৩৬২.০৯	৩৭৫.০৭
১৭.৫৩	৭৭৯.২১	৭৮৮.৭৪
৩০.৩০	১৪০৫.৫৫	১৪৩৫.৮৫
৩২.০৭	৩২৩০.০৮	৩২৬২.১৫
৩৪.৫০	৪৮২১.৪৭	৪৮৫৫.৯৭
৩৪.৪২	৬১২৪.৪৭	৬১৬৭.৮৯

উৎস : ইকনমিক ট্রেন্ডস, আগস্ট ১৯৮৫।

বিদেশে কর্মসংস্থান : সংখ্যা এবং দেশে বিদেশি মুদ্রা প্রেরণ

বছর	বিদেশে কর্মরতদের সংখ্যা	বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার)
১৯৭৭-৭৮	১৬,৯০৮	১২
১৯৭৯-৮০	২৭,৬১০	২১০
১৯৮১-৮২	৬৬,৪৭২	৪২৪
১৯৮৩-৮৪	৫৯.২১৬	৫৫২
১৯৮৪-৮৫	৫৬,৭৫৬	৪৩০

উৎস : অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৮৪-৮৫। অর্থ মন্ত্রণালয়।

জীবনযাত্রার ব্যয় ও দ্রব্যমূল্য

বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলবে এবং খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ ছাড়া বাকি জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতাও কমতে থাকবে–এটা খুব 'স্বাভাবিক' রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এ ধরনের একটি সমাজে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা যখন কমে আসে তখন তাদের সংগঠিত অংশ বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করে; আন্দোলন জোরদার হলে টাকার অংকে তাদের বেতনও বাড়ে, কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আবার তাদের ক্রয়ক্ষমতাকে পূর্বের তুলনায় নামিয়ে দেয়।

সাধারণত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে, ছোট বড় ব্যবসায়ীদের ব্যক্তি হিসেবে পাইকারিভাবে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি যদি দ্রব্যমূল্যের এই বৃদ্ধির জন্যে দায়ী হতো তাহলে এর নিরসন 'অদুষ্ট' যে কোন ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব হতো। কিন্তু তা হয় না। কিছু দুষ্ট লোক ইচ্ছা করলেই একটি রাষ্ট্রে নিজেদের মুনাফার জন্যে ইচ্ছামতো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে পারে না। নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক এবং

সামাজিক শর্তাবলি যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুকূল হয় তখনই তা কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে বাস্তব হয়ে ওঠে।

এরকম সমাজে জনগোষ্ঠী পরস্পর বিরোধী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। সেখানে মালিক অংশের মুনাফা বৃদ্ধি তখনই সম্ভব হয়, যখন শ্রমিক অংশের শ্রমশক্তি শোষণ করা মালিকদের পক্ষে সহজ হয়। মুদ্রাস্ফীতি এক্ষেত্রে মালিকদের সহযোগিতা করে, যেখানে শ্রমিকদের পাওয়া অংশের প্রকৃতমূল্য কমে আসে। বিনিময় ক্ষেত্রেও এটি একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের অধিকতর মুনাফার সন্ধান দেয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ বাস্তবতা আরও প্রকট এ কারণে যে, বাংলাদেশে যে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক, রাষ্ট্রব্যবস্থা বহাল আছে তার ভিত্তি খুবই দুর্বল। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে এখানকার পুঁজিবাদের বিকাশ মানে আন্তর্জাতিক পুঁজির বিকাশ। বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীও এখানে স্বাধীন নয়, প্রকট নির্ভরশীলতা তাদেরকে পরজীবী এবং খুবই বিলাসবহুল জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা মানেই হচ্ছে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের শৃঙ্খল এদেশে শক্তিশালী করা। এদেশের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এর বিরুদ্ধ একটি দিক। সে কারণে এই দেশের শাসক শ্রেণী উৎপাদনশীল খাতের দিকে দৃষ্টি দিতে অপারগ। উৎপাদনশীল বিকাশ তাদের বর্তমান অস্তিত্বের পরিপন্থী। এই বাস্তব অবস্থার কারণে পুঁজির উৎপাদনশীল বিনিয়োগের চাইতে সহজ, শর্টকাট পথ হিসেবে ব্যবসা বা ফটকাবাজীরা অনেক বেশি লাভজনক। সে জন্যে এদেশে পুঁজিবাদী শোষণ বলতে যা কিছু চলছে তা পুঁজির যে বৃদ্ধি ঘটায় তা উৎপাদনশীল পুঁজির আধিপত্য সৃষ্টি করে না। বিনিয়োগ পুনর্বিনিয়োগ চক্রের মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে না। এখানে যা চলে তাকে লুটপাট বলাই অধিকতর সঙ্গত। এই লুটপাট অব্যাহত রাখার ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস, মুদ্রা সরবরাহ, বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি খুব প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণ দিনে দিনে আরও বেশি জটিল জালে আটকে পড়তে থাকেন।

গত কয়েক বছরের হিসাব দেখলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। ১৯৬৯-৭০ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় সূচক ১০০ ধরলে দেখা যায় ১৯৭২-৭৩ এ তা হয়েছে ১৮১ দশমিক ৫, ১৯৭৪-৭৫ এ হয়েছে ৪০৭ দশমিক ৬, ১৯৭৯-৮০ তে হয়েছে ৫৬১ দশমিক ১, ১৯৮২-৮৩ তে হয়েছে ৭৫৮, ১৯৮৩-৮৪ তে হয়েছে ৮৩২ দশমিক ৯। ১৯৮৫ তে এসে এটি ৯৬০ এর ওপরে চলে গেছে। অর্থাৎ ১৫ বছর আগে যে জিনিসের দাম ছিল ১ টাকা, এখন সে জিনিসের দাম হয়েছে ১০ টাকা। জিনিসপত্রের দাম ১০ গুণ বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিক-কর্মচারী মধ্যবিত্তের বেতন বেড়েছে বড়জোর ৪ গুণ। অর্থাৎ প্রকৃত আয় এই কয় বছরে নেমে গেছে অর্ধেকেরও বেশি।

কিন্তু এই ঘটনা সমাজের সকলের জন্যে সত্য নয়। একই সময়ের মধ্যে দেশে বিত্তবানদের বিত্ত বেড়েছে এবং তাদের সংখ্যাও পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে যেখানে এদেশে কোটিপতি ছিল ১ জন, এখন সেখানে হয়েছে ২০০-রও বেশি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সম্পদ লুট থেকে শুরু করে দুর্নীতির বিস্তার, ইন্ডেটিং, সাপ্লাইয়িং, সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার বিচরণ বৃদ্ধি, বিদেশিদের সাথে যৌথ মালিকানায় পুঁজি বিনিয়োগ, সরকারি ভর্তুকি ও সুযোগ-সুবিধা আদায়, সরকারি সম্পদ পানির দামে ক্রয়, কৃষিঋণের মাধ্যমে সম্পত্তিবানদের আরও সম্পত্তি সৃষ্টির সুযোগ ইত্যাদিই নতুন বিত্তবানদের উৎস।

১৯৮৪-র তুলনায় ৮৫ সালে (নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়া হিসেব অনুযায়ী) বিভিন্ন দ্রব্যের যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তার হার মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ : মোটা চাল (১১%), মাঝারি চাল (৬%), আটা (১২%), ডাল (৪৪%), আলু (৩৩%), পিঁয়াজ (৮৮%), মাছ (৪৩%), গরুর মাংস (৩৩%), খাসির মাংস (৪৩%), চিনি (২৫%), ডিম (২৫%), চা (১৫%), জ্বালানি কাঠ (১৫%), লংক্লথ (৬%), শাড়ি (১২%), লুঙ্গি (৩০%)।

টাকার মূল্যমান
১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮৪-৮৫

সময়	টাকা = ১ ডলার প্রতি
১৯৭৩-৭৪	৮.০০
১৯৭৪-৭৫	৮.০০
১৯৭৫-৭৬	১৪.৫০
১৯৭৯-৮০	১৫.৫০
১৯৮২-৮৩	২৩.৭৬
১৯৮৪-৮৫	২৬.৫০

নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

গত বছরের জুন মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল শেষ হয়েছে। কয়েক মাস বিলম্বে ডিসেম্বরে ঘোষিত হয়েছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল ছিল ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫। এর আগে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়াও তৈরি করা হয়েছে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মূলত প্রণয়ন করা হয়েছিল ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করার জন্য। কিন্তু যথারীতি এই লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হয়নি। অনেক অসমাপ্ত প্রকল্প নিয়েই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যাত্রা শুরু হয়েছিল। মাত্র সমাপ্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কোন মূল্যায়ন উপস্থিত করা

কঠিন এই কারণে যে, এই পরিকল্পনা যেভাবে ঘোষিত হয়েছিল, পরবর্তীতে তার বিপুল পরিবর্তন হয়। প্রধানত 'বিদেশি সাহায্য' নির্ভর এই মহাপরিকল্পনা দলিল লাভ করে খুবই খণ্ডিত এক রূপ।

১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশের সময় মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ২৫ হাজার ৫শ ৯৫ কোটি টাকা, এর মধ্যে বিদেশি সাহায্যের অনুপাত ছিল শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুমিত বিদেশি সাহায্য ঠিকভাবে না পাওয়া, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের সংকট ইত্যাদি কারণে বেশ কয়েকবার এই বরাদ্দ কমানো হয়। শেষ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ধরা হয় ১৬ হাজার ৫শ ৭৯ কোটি টাকা। কিন্তু তারপরও বিনিয়োগে ঘাটতি থেকে যায়।

এই পরিকল্পনাকালে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী ধরনের সাফল্য পাওয়া গেছে তা আমরা আগের আলোচনাতেই জানতে পেরেছি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ঘোষিত হয়েছে নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। মডেল, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঙ্গতিহীনতা পূর্বের দলিলগুলোর মতোই এই দলিলেও অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে ইতোমধ্যেই আলোচনা এসেছে। অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও বরাদ্দ নির্ধারণ ও প্রবৃদ্ধির উচ্চ হারের আশাবাদ এ পরিকল্পনা দলিলে যথারীতি পাওয়া যায়।

জীবনযাত্রার (১৯৬৯-৭০ = ১০০) ব্যয় সূচক

সময়	সামগ্রিক ব্যয় সূচক
১৯৭২-৭৩	১৮১.৫
১৯৭৪-৭৫	৪০৭.৬
১৯৭৯-৮০	৫৬১.১
১৯৮২-৮৩	৭৫৮.০
১৯৮৩-৮৪	৮৩২.৯
১৯৮৪-৮৫	৯৫৩.৫

উৎস : ইকনমিক ট্রেন্ডস, বাংলাদেশ ব্যাংক, আগস্ট ১৯৮৫।

সরকারি খাতে ২৫ হাজার কোটি ও বেসরকারি খাতে ১৩ হাজার ৬শ কোটি টাকা মিলিয়ে মোট ৩৮ হাজার ৬শ কোটি টাকার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। মোট বরাদ্দের মধ্যে ১৭ হাজার ৫শ ৭২ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং বাকি ২১ হাজার ২৮ কোটি টাকা বিদেশি সাহায্য থেকে পাওয়া যাবে।

তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাকালে গড়ে বার্ষিক শতকরা ৫ দশমিক ৪ ভাগ হারে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ধরা হয়েছে কৃষিখাতে শতকরা ৪ ভাগ, শিল্পখাতে ১০ দশমিক ১ ভাগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস

খাতে ৯ দশমিক ৬ ভাগ, নির্মাণ খাতে ৪ দশমিক ৯ ভাগ, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৬ দশমিক ৯ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে ৫ দশমিক ৮ ভাগ। বর্তমানে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকার জিডিপি ১৯৯০ সালের শেষে প্রায় ৪৩ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। আগের পরিকল্পনা দলিলগুলোর মতো বর্তমান পরিকল্পনা দলিলেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপজেলা পদ্ধতি এবং বেসরকারি খাতের ওপর গুরুত্ব আরোপ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রাম সরকার, খালকাটা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাজেটে যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে মোট ৭৬০টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মূল কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা হচ্ছে ৬৩৭টি প্রকল্প, যার মধ্যে ৫২২টি প্রকল্প দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাকাল থেকে চলতি অসমাপ্ত হিসেবে ৮৫-৮৬ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বাজেটে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে শতকরা ৫ দশমিক ৫ ভাগ। এর মধ্যে খাতওয়ারী ভাগ হচ্ছে– কৃষি : ৫ দশমিক ৫ শতাংশ, শিল্প : ৭ দশমিক ৫ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস : ১৬ শতাংশ, পরিবহন : ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য মোট উন্নয়ন কর্মসূচি ধরা হয়েছে ৩,৮২৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, যার অভ্যন্তরীণ সম্পদ হচ্ছে ৬১৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা এবং বিদেশি সাহায্য হচ্ছে ৩,২০৯ কোটি টাকা।

'বিদেশি সাহায্য' নির্ভর এই বাজেট ঘোষণাকালে অর্থ উপদেষ্টা এ কথাও বলেছেন যে, নমনীয় ও সহজ শর্তে সাহায্যের পরিমাণ ক্রমেই সীমিত হচ্ছে। রাজস্ব ব্যয় কর্মসূচির ক্ষেত্রে এ বছরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বরাবর উপেক্ষিত শিক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দ অধিকতর হ্রাস এবং সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি। শিক্ষাখাতে ১৯৮৪-৮৫ সালের সংশোধিত বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৪১৯ কোটি ৭২ লাখ টাকা, ১৯৮৫-৮৬ সালে তা কমিয়ে করা হয়েছে ৪৮৭ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। অন্যদিকে, ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৪৯২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা, ৮৫-৮৬ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৫০১ কোটি ১৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ ১৯৮৪-৮৫ সালে দু' খাতের বরাদ্দ প্রায় একই ছিল। এই বছরে প্রতিরক্ষা খাতে বেড়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকা এবং শিক্ষাখাতে কমেছে প্রায় ৫ কোটি টাকা।

উপসংহার

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে, শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, এই ব্যাপক দারিদ্র্যমোচনই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনার মেয়াদকাল শেষে আমরা দেখি, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত

জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। তাদের দারিদ্র্যের তীব্রতাও বেড়েছে। পরিকল্পনার 'সফল' বাস্তবায়নে বিত্তবানদের বিত্তের স্ফীতি ঘটেছে। 'জাতীয় উন্নয়ন' প্রক্রিয়ায় ঘটেছে শ্রেণী উন্নয়ন।

১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট কিংবা ১৯৮৫-৯০ সালের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একইভাবে দারিদ্র্যমোচনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং বাজেট ও পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত গতিই এই সময়কালে দারিদ্র্যের তীব্রতা এবং অর্থনীতির উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সংকটকে আরও গভীর করবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির পরনির্ভরশীলতা ও দারিদ্র্য বিষয়ে এখন বিস্তর গবেষণা ও আলোচনা হচ্ছে। এতে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাসমূহ এবং বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের উৎসাহও কম নয়। তাদের উৎসাহের মূল কারণ হচ্ছে বর্তমানে দারিদ্র্য ও পরনির্ভরশীলতা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে এদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিজস্ব চলৎশক্তি প্রান্তিক পর্যায়ে চলে এসেছে। সে কারণে একে সজীব রাখার জন্যে বিস্তর গবেষণা পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদী সংগঠগুলোরও উৎসাহ। বাংলাদেশের বর্তমান পরনির্ভরশীলতার প্রধান উৎসই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের সংকট। এ সংকট অভ্যন্তরীণ সম্পদের অভাবে সৃষ্টি হয়নি, যেভাবে বলা হয়ে থাকে। সৃষ্টি হয়েছে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশহীনতার ফলে এবং সম্পদের ব্যাপক লুটপাটের কারণে। কিন্তু এই 'পরনির্ভরশীলতা' প্রকৃতপক্ষে এদেশের শাসক-শোষক শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রাণসূত্র। দারিদ্র্য বৃদ্ধির কার্যকারণও এর সাথে সম্পর্কিত।

বর্তমানে এই দেশের শাসক শ্রেণীর পক্ষে কার্যকর ভূমি সংস্কার, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান হ্রাস, প্রকৃত আয় বৃদ্ধি, শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদির কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বিদ্যমান ব্যবস্থা বজায় রেখে, অসম্ভব ব্যাপার। যার অনিবার্য ফল হিসেবে রাজনীতিতে ক্ষমতা এককেন্দ্রীকরণের ধারা অব্যাহত রয়েছে, দমননীতি হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক ঘটনা।

যে ধারায় ও শর্তাবলির অধীনে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৮৫ সাল পেরিয়ে এসেছে তা অব্যাহত থাকলেও সংকট হ্রাসের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, বরং সামরিক শাসনের আশ্রয়ে সম্পদ ও ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ গোটা দেশের জন্যে বয়ে আনছে তমসাবৃত ভবিষ্যৎ, দেশের মানুষের জন্যে আরও কঠিন সময়।

জানুয়ারি, ১৯৮৬